বাঙ্গালায়
বৌদ্ধ ধর্ম

শ্রী নলিনী-নাথ দাশ গুপ্ত

বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম

শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত

এ, মুখার্জ্জী এণ্ড কোং : কলিকাতা

প্রকাশক : এ মুখার্জ্জী
২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

* *

মুদ্রাকর : পি, সি, চাটার্জ্জী
মডার্ণ আর্ট প্রেস
১২, দুর্গা পিতুরী লেন, কলিকাতা

মূল্য সাড়ে চার টাকা

পরমেশ্বরী মাতৃদেবীর

স্মৃতির উদ্দেশে

ভূমিকা

বহুদিন আগে ইংরাজীতে বাঙ্গালাদেশের বৌদ্ধধর্মের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনা করিয়াছিলাম, এবং সেই পাণ্ডুলিপি হইতে কোনও কোনও অংশ ইংরাজীতে এবং বাঙ্গালা অনুবাদে নানা সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশও করিয়াছি। সম্প্রতি আরও কিছু নূতন উপাদান সহযোগে সমগ্র রচনাটিকে বাঙ্গালা ভাষায় রূপান্তরিত করিয়া প্রকাশ করা গেল।

বোধ করি, বাঙ্গালাদেশের বৌদ্ধধর্মের কোনও ধারাবাহিক ও তুলনা-মূলক ইতিহাস প্রকাশের উদ্যম ইতিপূর্বে আর হয় নাই, এই প্রথম। বিষয়বস্তুও কঠিন এবং জটিল। সুতরাং এই রচনার মধ্যে স্বভাবতঃই অনেক কিছু ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকার আশঙ্কা রহিয়া গেল। কিন্তু যত ভুল ও ত্রুটিই থাকুক, তাহা ঐ দুই কারণে মার্জনা লাভের দাবী রাখে।

বৌদ্ধ-দর্শন সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার স্থান ইহা নয়, তাহা স্বতন্ত্রভাবে আলোচনীয়। ঐতিহাসিক সমাজে সুপরিচিত, এবং পূর্বে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিতে উল্লিখিত তথ্যগুলির মূল সন্ধান-স্থানের পুনরুল্লেখ করিয়া পাদটীকা অযথা ভারাক্রান্ত করি নাই।

কোনও কোনও স্থলে অন্য কারণবশতঃও পাদটীকায় মূল সন্ধানস্থান নির্দেশ করা হয় নাই।

এই গ্রন্থের চিত্রগুলি প্রকাশের অনুমতি প্রদানের জন্য ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের কর্তৃপক্ষকে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ চিত্রশালার কিউরেটার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়কে, এবং সুহৃদ্বর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সরসীকুমার সরস্বতী মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ইতি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
১লা বৈশাখ, ১৩৫৫

বিনীত
গ্রন্থকার

সূচী

উপক্রমণিকা

ইন্দো-আর্য সংস্কৃতি ও সভ্যতা, ধর্ম ও দার্শনিক চিন্তার যে যুগ-সন্ধিক্ষণে ভগবান বুদ্ধদেবের আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটে, উত্তর ভারতের ইতিহাসে সেই যুগের নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য আছে। সেই যুগে উত্তর ভারতে সত্য, জ্ঞান ও মুক্তিপথের সন্ধানকামী শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ উভয় সম্প্রদায়েরই বহু লোক উদ্দেশ্যসিদ্ধির তীব্র অনুপ্রেরণায় আকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। সত্য যে কী তাহা জানিতেই হইবে, কোন্ পথে মুক্তি তাহা আবিষ্কার করিতেই হইবে। এই অনুপ্রেরণার ফলে তাঁহারা গ্রাম হইতে গ্রামে, স্থান হইতে স্থানান্তরে, নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেন,—সত্যের সন্ধানে কোনও সম্পদই, কোনও প্রিয়বস্তুই, বিসর্জন দিতে তাঁহারা এতটুকু পরাঙ্মুখ ছিলেন না। এই সময় নানা সত্যসন্ধী চিন্তানায়কগণের ভিন্নমুখী চিন্তার ফলে যদি পরস্পর-বিরোধী অনেকগুলি মতবাদের জন্ম হইয়া থাকে, তবে তাহা অস্বাভাবিক বা বিস্ময়কর কিছুই নয়। এই মতবাদগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সর্বনাশা মত ছিল সংশয়বাদ[১]। ইহাকে সর্বতোভাবে নিরস্ত করিয়া আবার সত্যের স্থির ও দৃঢ় ভিত্তির উপর মানুষের শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠা করাই ছিল গৌতমবুদ্ধের জীবনের

---

(১) অর্থাৎ সকল দার্শনিক প্রশ্নের উত্তরে অনিশ্চয়তা। নিশ্চিত ভাবে 'হাঁ' কিংবা 'না' উত্তর না দেওয়া।

উদ্দেশ্য, একান্ত কাম্য। তাঁহার জীবনব্যাপী এই যুগটা ছিল খৃষ্টপূর্ব ৫৬৭ বা ৫৬৩ হইতে ৪৮৭ বা ৪৮৩ অব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত।

বুদ্ধদেব দীর্ঘায়ুঃ পুরুষ ছিলেন, পূর্ণ ৪৫ বৎসর কাল ধর্মপ্রচার করিবার পর আশী বৎসর বয়সে কুসিনারায়, অর্থাৎ গোরক্ষপুর জেলার পূর্বদিকে ছোট-গণ্ডকী নদীর তীরে কাশিয়া নামক স্থানের, এক শালবনে তাঁহার পার্থিব জীবনের অবসান ঘটে। সারনাথে প্রথম ধর্মোপদেশ প্রদান করিয়া 'ধর্মচক্রপ্রবর্তনে'র পর দীর্ঘ বৎসর ধরিয়া তিনি যে ধর্মপ্রচার করেন, তাহা তাঁহার জীবদ্দশায় মগধ (বিহারের মধ্যাংশ) এবং কোশলে (যুক্তপ্রদেশের কিয়দংশে) বস্তুতঃ সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু তাঁহার নির্বাণের দুই শতাধিক বৎসর পর পর্যন্তও তাঁহার প্রবর্তিত ধর্ম এই সীমারেখা অতিক্রম করিতে পারে নাই, এবং এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই কোনও রূপে আপন অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া চলিতেছিল, এই ধারণা অভ্রান্ত নয়। বৈশালীতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতিতে যে সকল দেশ হইতে প্রতিনিধিবর্গ যোগদান করিয়াছিলেন তাহা দেখিলেই এই ধারণার অলীকতা প্রমাণ হয়। তবে এই ধর্মের ভাগ্য মধ্যাহ্ন-গগনে উদয় হইল দেবানাং প্রিয় প্রিয়দর্শী মহারাজ অশোকের সময় (২৭০-৩৩ খৃষ্ট পূর্বাব্দ)। অশোক এবং তাঁহার সমসাময়িক ধর্মাচার্যগণের ক্লান্তিহীন প্রচেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম এমনই দিগ্বিজয়ে বাহির হইল যে শুধু আর্যাবর্তে নয়, শুধু এই সাগরমেখলা ভারতবর্ষে নয়, শুধু বৃহত্তর ভারতে নয়,—বিস্তীর্ণ এশিয়ার অধিকাংশ স্থানে সংখ্যাতীত মানব-

সন্তানের হৃদয়ে ইহা আপন জয়কেতন প্রোথিত করিল, এবং এশিয়ার বাহিরেও ইউরোপ ও আফ্রিকার কোনও কোনও দেশে ইহার খ্যাতির ছটা ছড়াইয়া পড়িল। তাহারই ফলে আজিকার দিনে সারা বিশ্বের প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোকই বৌদ্ধধর্মাঙ্কিত। বলা বাহুল্য, আর কোন ধর্মেরই দিগ্বিজয় এত সার্থক হয় নাই। বলা বাহুল্য, দিগ্বিজয়ে বৌদ্ধধর্ম কূটনীতির কৈতব প্রয়োগও করে নাই, তরবারির সাহায্যও গ্রহণ করে নাই, রক্তপাতে দেশের মাটি ও ইতিহাসকে কলঙ্কিত করিয়া, মানুষের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও মনুষ্যত্বকে প্রতিনিয়ত অপরিসীম লজ্জাও দেয় নাই। কেবল মৈত্রী ও করুণার বর্ম ধারণ করিয়া আর অহিংসার মহামন্ত্রের ভেরী বাজাইয়া এই ধর্ম শুধু শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলিয়াছে, আমাকে বরণ কর, নির্বাণের পথ আমিই দেখাইয়া দিব,—শুনিয়া দলে দলে শত-সহস্র-অযুত মুক্তি-লোলুপ নর ও নারী মায়াবিষ্টের মতই তাহাকে বরণ করিয়া নিয়াছে, এবং প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া উদাত্তকণ্ঠে ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি করিয়াছে, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি। এই ভাবে এই ধর্ম তাহার দিগ্বিজয় সাধন করিয়াছে, এই পথেই সে তাহার পথ চলিয়াছে। সে পথ ছিল বহুতর বাধা ও বিঘ্নে পিচ্ছিল, কিন্তু বাধায় প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিবে, এত দুর্বল ছিল না সম্যক্‌সম্বুদ্ধের ধর্ম।

সদ্ধর্মের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে বুদ্ধের নিজেরই বেশ কিছু আশঙ্কা ছিল, তিনি স্বয়ং কতগুলি 'অনাগত ভয়' দেখিতে পাইয়াছিলেন।

'দীপবংসে'র মতে মগধের প্রাচীন রাজধানী গিরিব্রজের অন্তঃপাতী সপ্তপর্ণী বা সপ্তপর্ণ গুহাদ্বারে, মহাকাশ্যপের মন্ত্রণায় বুদ্ধশাসনের স্থায়িত্ব বিধানের উদ্দেশ্যে প্রথম বৌদ্ধ মহাসভার বা সঙ্গীতির অধিবেশন হইল। এই অধিবেশনে ভিক্ষু উপালির বিনয়সংক্রান্ত এবং ভিক্ষু আনন্দের ধর্মবিষয়ক উত্তরগুলি লইয়া, সমবেত সদস্যগণের অনুমোদনক্রমে, যে ধর্ম ও বিনয়সংগ্রহ প্রস্তুত হইল তাহা স্থবিরবাদ নামে পরিচিত হইল। বৌদ্ধ সাহিত্যের ইহাই হইল মূল প্রামাণ্য গ্রন্থ। বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর চতুর্থ মাসের প্রারম্ভে প্রথম বা কাশ্যপসঙ্গীতির কার্য আরম্ভ হয়, এবং উহা শেষ হইতে সাত মাস সময় লাগে। ইহার একশত অথবা একশত দশ বৎসর পরে দ্বিতীয় সঙ্গীতি আহুত হইয়াছিল। বৈশালীর (মজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত আধুনিক বশারহ্) বালুকারামে কাকণ্ডকপুত্র স্থবির যশ প্রভৃতির উদ্যোগে, এবং স্থবির রৈবত অথবা স্থবির সম্ভোগের সভাপতিত্বে এই সভার অধিবেশন হয়, এবং সাত শত সদস্য ইহাতে যোগদান করেন। এই সঙ্গীতির কার্য শেষ হইতে আট মাস সময় লাগে। ধর্ম ও বিনয় সংক্রান্ত শ্রেষ্ঠ বুদ্ধবচনগুলি আবৃত্তি ও সংগ্রহ করাই যেমন প্রথম সঙ্গীতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিক্ষাপদগুলির পালন ও লঙ্ঘনের কর্তব্যতা ও অকর্তব্যতা বিচারের জন্যই তেমনই দ্বিতীয় সঙ্গীতি আহুত হইয়াছিল। প্রথম সঙ্গীতিতে কতগুলি জটিল বিনয়-বিষয়ক প্রশ্নের আলোচনা ও মীমাংসা হইলেও উহা আগে ধর্ম-

সঙ্গীতি, পরে বিনয়-সঙ্গীতি ; পক্ষান্তরে দ্বিতীয় সঙ্গীতি আগে বিনয়-সঙ্গীতি, পরে ধর্ম-সঙ্গীতি[২]।

ধর্ম ও বিনয় দ্বিতীয় সঙ্গীতিতে আবৃত্তি করা হইয়াছিল কিনা তাহা সন্দেহের বিষয় হইয়া রহিয়াছে। সিংহলের ঐতিহ্য অনুসারে, প্রথম ও দ্বিতীয় সঙ্গীতির অধিবেশন হয় যথাক্রমে মগধরাজ অজাতশত্রু ও কালাশোকের (পূর্ববর্তী অশোকের) সময়। এই কালাশোক সুসুনাগের পুত্রই হোন্, পুরাণের কাকবর্ণই হোন্, জৈন কিম্বদন্তীর উদায়িন্ অথবা পালিসাহিত্যের উদায়িভদ্দই হোন্, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায়না, কারণ 'বিনয় পিটকে'র চুল্লবগ্‌গে (১১-১২) প্রথম ও দ্বিতীয় মহাসভার প্রাচীনতম বিবরণীতে অজাতশত্রুর নামও নাই, কালাশোকের গন্ধও নাই, কাজেই ঐ দুই অধিবেশনে রাজানুগ্রহলাভের কথা পরবর্তী কল্পনার বিলাস মাত্র। বৈশালীর সঙ্গীতিও ভিক্ষুদিগের মতভেদ হইতে উৎপন্ন। বিনয়বিরুদ্ধ, অর্থাৎ ধর্মাচারের কতগুলি বিধি-নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া, বৈশালীর বৃজিবংশীয় ভিক্ষুগণের (বেসালিকা বজ্জিপুত্তকা ভিক্খ) অশন, বসন, রজত-কাঞ্চন মুদ্রাগ্রহণ, তালীসুরাসেবন প্রভৃতি কতগুলি নিয়ম পরিহার, বৈশালীর অধিবেশনে দশ-বিচার্যবস্তুতে (দশবথুনি) পরিণত হয়। বিচারের ফলে বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ নিন্দিত ও অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াছিলেন,

(২) বৌদ্ধ গ্রন্থ কোষ, ১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা, শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া কর্তৃক সঙ্কলিত, পৃঃ ১৬

'দীপবংসে'র মতে মগধের প্রাচীন রাজধানী গিরিব্রজের অন্তঃপাতী সপ্তপর্ণী বা সপ্তপর্ণ গুহাদ্বারে, মহাকাশ্যপের মন্ত্রণায় বুদ্ধশাসনের স্থিতি বিধানের উদ্দেশ্যে প্রথম বৌদ্ধ মহাসভার বা সঙ্গীতির অধিবেশন হইল। এই অধিবেশনে ভিক্ষু উপালির বিনয়সংক্রান্ত এবং ভিক্ষু আনন্দের ধর্মবিষয়ক উত্তরগুলি লইয়া, সমবেত সদস্যগণের অনুমোদনক্রমে, যে ধর্ম ও বিনয়সংগ্রহ প্রস্তুত হইল তাহা স্থবিরবাদ নামে পরিচিত হইল। বৌদ্ধ সাহিত্যের ইহাই হইল মূল প্রামাণ্য গ্রন্থ। বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর চতুর্থ মাসের প্রারম্ভে প্রথম বা কাশ্যপসঙ্গীতির কার্য আরম্ভ হয়, এবং উহা শেষ হইতে সাত মাস সময় লাগে। ইহার একশত অথবা একশত দশ বৎসর পরে দ্বিতীয় সঙ্গীতি আহুত হইয়াছিল। বৈশালীর (মজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত আধুনিক বশারহ্) বালুকারামে কাকণ্ডকপুত্র স্থবির যশ প্রভৃতির উদ্যোগে, এবং স্থবির রৈবত অথবা স্থবির সম্ভোগের সভাপতিত্বে এই সভার অধিবেশন হয়, এবং সাত শত সদস্য ইহাতে যোগদান করেন। এই সঙ্গীতির কার্য শেষ হইতে আট মাস সময় লাগে। ধর্ম ও বিনয় সংক্রান্ত শ্রেষ্ঠ বুদ্ধবচনগুলি আবৃত্তি ও সংগ্রহ করাই যেমন প্রথম সঙ্গীতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিক্ষাপদগুলির পালন ও লঙ্ঘনের কর্তব্যতা ও অকর্তব্যতা বিচারের জন্যই তেমনই দ্বিতীয় সঙ্গীতি আহুত হইয়াছিল। প্রথম সঙ্গীতিতে কতগুলি জটিল বিনয়-বিষয়ক প্রশ্নের আলোচনা ও মীমাংসা হইলেও উহা আগে ধর্ম-

সঙ্গীতি, পরে বিনয়-সঙ্গীতি ; পক্ষান্তরে দ্বিতীয় সঙ্গীতি আগে বিনয়-সঙ্গীতি, পরে ধর্ম-সঙ্গীতি[২]।

ধর্ম ও বিনয় দ্বিতীয় সঙ্গীতিতে আবৃত্তি করা হইয়াছিল কিনা তাহা সন্দেহের বিষয় হইয়া রহিয়াছে। সিংহলের ঐতিহ্য অনুসারে, প্রথম ও দ্বিতীয় সঙ্গীতির অধিবেশন হয় যথাক্রমে মগধরাজ অজাতশত্রু ও কালাশোকের (পূর্ববর্তী অশোকের) সময়। এই কালাশোক সুসুনাগের পুত্রই হোন্, পুরাণের কাকবর্ণই হোন্, জৈন কিম্বদন্তীর উদায়িন্ অথবা পালিসাহিত্যের উদায়িভদ্দই হোন্, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায়না, কারণ 'বিনয় পিটকে'র চুল্লবগ্‌গে (১১-১২) প্রথম ও দ্বিতীয় মহাসভার প্রাচীনতম বিবরণীতে অজাতশত্রুর নামও নাই, কালাশোকের গন্ধও নাই, কাজেই ঐ দুই অধিবেশনে রাজানুগ্রহলাভের কথা পরবর্তী কল্পনার বিলাস মাত্র। বৈশালীর সঙ্গীতিও ভিক্ষুদিগের মতভেদ হইতে উৎপন্ন। বিনয়বিরুদ্ধ, অর্থাৎ ধর্মাচারের কতগুলি বিধি-নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া, বৈশালীর বৃজিবংশীয় ভিক্ষুগণের (বেসালিকা বজ্জিপুত্তকা ভিক্‌খ) অশন, বসন, রজত-কাঞ্চন মুদ্রাগ্রহণ, তালীসুরাসেবন প্রভৃতি কতগুলি নিয়ম পরিহার, বৈশালীর অধিবেশনে দশ-বিচার্যবস্তুতে (দশবথ্‌থুনি) পরিণত হয়। বিচারের ফলে বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণ নিন্দিত ও অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াছিলেন,

---

(২) বৌদ্ধ গ্রন্থ কোষ, ১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা, শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া কর্তৃক সঙ্কলিত, পৃঃ ১৬

এবং বিচারের রায় যে কি হইবে না হইবে বৃজিপুত্রগণের তাহা অজানা ছিল না। কিন্তু ছাড়িয়া দিবার পাত্র তাঁহারা মোটেই ছিলেন না, কারণ তাঁহারা হইতেছেন বৈশালীর বৃজি-বংশীয় সন্তান, আর কেউ নয়। এই অসহনীয় অপমানে তাহারা রোষে সভাস্থান বর্জন করিয়া বাহিরে, সম্ভবতঃ বৈশালীর মহাবনের কূটাগারশালায় নূতন এক সভা করিলেন, এবং স্বাভিহিত অর্হৎ-স্থবিরগণের এই অতিরিক্ত মোড়লগিরির প্রকাশ্য প্রতিবাদ করিলেন। এই সভায় সমাগত হইয়াছিলেন দশ হাজার সদস্য। ইতিহাসে বৃজিপুত্র ভিক্ষুগণের এই সভাই 'মহাসঙ্গীতি' নামে অভিহিত, এবং বোধ করি সংখ্যাধিক্যের জন্যই তাঁহারা পরিচিত হইলেন 'মহাসাঙ্ঘিক' নামে। বৌদ্ধশাসনে তাঁহারা আনিলেন এক বিপ্লব। মূল ধর্ম ও বিনয় সংগ্রহ অগ্রাহ্য করিয়া, সূত্র ও বিনয়ের কতকাংশ পরিত্যাগ করিয়া নূতন আকারে সূত্র ও বিনয়সংগ্রহ প্রস্তুত করেন, একস্থানের সূত্র অন্য স্থানে সন্নিবেশিত করেন, এক অর্থে কথিত বাক্যে অন্য অর্থ আরোপ করেন, এইরূপে বৌদ্ধশাসনে তাঁহারা আনিলেন এক বিপ্লব। তাঁহাদের মতবাদের নামকরণ হইল 'অচরিয়বাদ' (আচার্যবাদ), আর প্রাচীনপন্থিগণের মতবাদকে বলা হইল 'থেরবাদ' (স্থবিরবাদ)। ধর্ম ও বিনয়সংগ্রহেরও দুই সংস্করণের উৎপত্তি হয়, স্থবিরবাদ ও ভিন্নবাদ।

বৌদ্ধ সঙ্ঘে সৃষ্টি হইল এই প্রথম বিভেদের। বৈশালী মহাসভার বিবরণী পাঠে দেখা যায়, কৌশাম্বী, অবন্তী এবং প্রতীচীন

অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিগণ ছিলেন প্রাচীন পন্থার অনুগামী, এবং বৈশালী, পাটলিপুত্র এবং অন্যান্য প্রাচ্যদেশীয় ভিক্ষুগণ নবীনমতের পরিপোষক। প্রাচীনপন্থী বহু ভিক্ষু প্রগতিবাদিদের সহিত কিছুকাল পাটলিপুত্রে এবং তাহার প্রতিবেশে একত্র রহিলেন সত্য, কিন্তু নৈষ্ঠিকতা বজায় রাখিয়া কতগুলি আচার-অনুষ্ঠান পালনে অসুবিধা বোধ করিয়া তাঁহাদের অধিকাংশই প্রস্থান করিলেন কৌশাম্বী, অবন্তী প্রভৃতি স্থানে, সেগুলি অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন বিবেচনায়। পূর্বদিকে পাটলিপুত্র ও বৈশালী প্রভৃতি স্থানের প্রায় একচ্ছত্র অধিকার পাইয়া নবীন মতবাদিগণ সে অঞ্চলে যথাসাধ্য প্রভাব ত বিস্তার করিতেই লাগিলেন, উপরন্তু উত্তরে শ্রাবস্তী, মথুরা প্রভৃতি স্থানে এবং দক্ষিণে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গুণ্টূর জেলার নাগার্জুনীকোণ্ডা, অমরাবতী প্রভৃতি স্থানে প্রচারক-ভিক্ষু পাঠাইতে লাগিলেন দলে দলে। আচার ও শীল হইতে প্রথমে যে অনৈক্যের উদ্ভব হইল, তাহা ক্রমশঃ ধর্মনীতিকেও আক্রমণ করিল, এবং নীতিগত পার্থক্যের জন্য দেখিতে দেখিতে বৌদ্ধদের মধ্যে একের পর একটি করিয়া আঠারটি সম্প্রদায় বা শাখার আবির্ভাব হইল। আ ঠা র টি। নিরাপত্তার সন্ধানে যে প্রাচীন-পন্থিগণ পশ্চিমে প্রয়াণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও অব্যাহতি পাইলেন না, তাঁহাদের দলগত দার্ঢ্যও ক্ষুভিত হইল, একত্ব নষ্ট হইয়া গেল, এবং তাঁহাদের মধ্যে, সম্ভবতঃ নিম্নোক্ত ক্রমে,[৩] এগারটি শাখার সৃষ্টি

(৩) N. Dutt, *B. C. Law Volume*, I. p. 283 f.

হইল,—(১) থেরবাদ (বা আর্য স্থবির নিকায়), (২) সর্বাস্তিবাদ, (৩) মহীশাসক, (৪) সম্মিতীয় (বাৎসীপুত্রীয় বা অবন্তক), (৫) ধর্মোত্তরীয়, (৬) ছন্নগরিক, (৭) ধর্মগুপ্ত, (৮) কাশ্যপীয়, (৯) সৌত্রান্তিক (সঙ্কন্তিক), (১০) ভদ্রযানীয়, ও (১১) সুত্তবাদ। এতন্মধ্যে স্থবিরবাদ, সর্বাস্তিবাদ, মূলসর্বাস্তিবাদ, সম্মিতীয়, মহীশাসক ও ধর্মগুপ্ত এই কয়টি শাখাই আবার অধিকতর প্রভাবশালী হইয়া উঠিয়াছিল। নবীন পন্থাশ্রিত সাতটি শাখার মধ্যে মহাসাঙ্ঘিক ও লোকোত্তরবাদ, এই দুইটি শাখাই বেশী প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, বাকী পাঁচটি,—গোকুলিক, একব্যবহারিক, প্রজ্ঞপ্তিবাদ, বহুশ্রুতীয় ও চৈত্যবাদ, ইহারা তেমন লোকপ্রিয়তা অর্জন করিতে পারে নাই। পালি জনশ্রুতি (মহাবংস, ৫, ১০-১৩) অনুসারে এই আঠারটি শাখার উদ্ভব হইয়াছিল অশোকের পূর্বেই; বসুমিত্র প্রভৃতি আচার্যের মতে, ইহাদের মধ্যে কতগুলির উৎপত্তি হইয়াছিল বুদ্ধাব্দের দ্বিতীয়, কতগুলির তৃতীয়, এবং বাকীগুলির চতুর্থ শতকে, অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ, তৃতীয়, ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে। আঠারটিই শেষ নয়, পরববর্তীকালে আরও কয়েকটি শাখা সময় ও সুযোগ বুঝিয়া উদ্ভূত হইয়াছিল,—তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মহাসাঙ্ঘিকগণের পূর্বশৈল, অপরশৈল, উত্তরশৈল এবং চৈত্যক নামক অমরাবতী ও নাগার্জুনীকোণ্ডার শাখা চতুষ্টয়। তবে একটা কথা, বুদ্ধের পরিনির্বাণের দুই শতাব্দীর মধ্যে এক মহাসাঙ্ঘিক ভেদ ছাড়া অপর কোনও ভেদ প্রকট হইয়াছিল কিনা, তাহা সন্দেহের বিষয়।

বৈশালী মহাসভার আবার এক শতাব্দী পরে তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতি আহূত হইয়াছিল পাটলিপুত্র নগরে, অশোকের রাজত্বের সপ্তদশ বা অষ্টাদশ বর্ষে। এই সভার অধিবেশনেরও হেতু প্রবাহে দেখা যায় বৌদ্ধদের সেই দলাদলি, অনাচার, উদ্ধত ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণ, ইত্যাদি। বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত এবং বিভিন্ন আচার-সম্পন্ন কতকগুলি অনধিকারীর এবং বিধর্মীর অর্থ ও যশের প্রলোভনে কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া সঙ্ঘে,—বিশেষতঃ পাটলিপুত্রের অশোকারামে, প্রবেশ লাভ করাই হেতু বিশেষে পর্য্যবসতি হইয়া মহারাজ অশোককে বা ধর্মাশোককে এত উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিল যে প্রতিকারক হইয়া তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ, স্থবিরাগ্র্য, মোগ্‌গলী-পুত্ত তিস্‌সকে অবিলম্বে উপরিগঙ্গার অহোগঙ্গ-পর্বত হইতে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। তিস্‌সের পৌরহিত্যে অনুষ্ঠিত মহতী সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঐ অবাঞ্ছিত লোকগুলিকে শ্বেতবস্ত্র দান করিয়া (সেতকানি বথানি দত্বা), অর্থাৎ তাহাদিগকে গৃহস্থ অথবা অবৌদ্ধ তীর্থিকের বেশ পরাইয়া বৌদ্ধসঙ্ঘ হইতে বিতাড়িত করিয়া দেওয়া হইল, এবং স্থবিরবাদ শোধনের জন্য এই সভায় যে পাঁচশত মতবাদ খণ্ডন করা হয়, সেই মত-বিচারগুলি 'কথাবথু' নামক অভিধর্ম-প্রকরণ গ্রন্থে সঙ্কলিত হইল। এইভাবে সঙ্ঘকে পুনর্মিলিত, একত্রীভূত বা 'সমগ্র' করার (সঙ্ঘে সমগে কটে) একটা চেষ্টা হইল এবং সঙ্ঘভেদের কোনরূপ অপচেষ্টার বিরুদ্ধে দণ্ডপারুষ্যের অনুশাসন প্রচার করা হইল। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে এরূপ অনুশাসন

প্রচার অপূর্ব[৪]। অশোক-সঙ্গীতির কার্য শেষ হইতে নয়মাস সময় লাগে। এই সঙ্গীতিতে 'বিনয়-পিটকে'র গ্রন্থসমূহ ও সপ্তপ্রকরণ 'অভিধর্ম' গ্রন্থ আবৃত্তি করা হয়।

প্রথম ও দ্বিতীয় সঙ্গীতিতে বুদ্ধের উপদেশাবলী ও কথোপকথন সঙ্কলিত হইয়া বৌদ্ধ শাস্ত্র রচিত, ও পাটলিপুত্র-সভায় সেই শাস্ত্র পুনরায় সমালোচিত ও স্থিরীকৃত হয়। বৌদ্ধ শাস্ত্র সম্ভবতঃ প্রথমে রচিত হয় অর্ধ-মাগধী অথবা মাগধী প্রাকৃত ভাষায়। উপদেশ ও আদেশ অনুসারে ধর্ম ও বিনয় নামে সংগৃহীত দ্বিবিধ বুদ্ধবচন কালক্রমে পিটক অনুসারে সুত্ত (সূত্র), বিনয় ও অভিধম্ম (অভিধর্ম), এই তিন ভাগে বিভক্ত হইল, অর্থাৎ কিনা মূল বৌদ্ধ প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহের একটি বিশেষ সংস্করণ মাত্র এই ত্রিপিটক। কখনও কখনও সুত্ত, বিনয় ও অভিধম্ম এই ক্রমের পরিবর্তে, সুত্তের আগে বিনয়ের নাম উল্লিখিত দেখা যায়। 'দীপবংসে'র মতে, প্রথম সঙ্গীতির ধর্ম সংগ্রহের অপর নাম সূত্র কিংবা 'আগম-পিটক'। শ্রুতি বা আগমাকারে রক্ষিত ধর্ম ও বিনয় ক্রমে যখন ত্রিপিটকে পরিণত হইল, তখন ধর্মের স্থান অধিকার করিল সূত্র ও অভিধর্ম্ম। 'পিটক' শব্দের সাধারণ অর্থ মাটি ফেলিবার ঝুড়ি অথবা ভাণ্ড। কিন্তু বৌদ্ধ পারিভাষিক অর্থে 'পিটক' গ্রন্থের আধার ও আধেয় দুই-ই। 'সুত্তপিটকে' বুদ্ধদেব কথাচ্ছলে যে সকল ধর্মোপদেশ দিয়াছিলেন তাহাই সন্নিবেশিত আছে। এই পিটকে ব্যবহারোপযোগী

(৪) *Inscriptions of Asoka*, B. M. Barua, Part II, pp. 378—381.

উপদেশের আধিক্য এবং ইহাতে 'অধিচিত্ত' বা সমাধি সম্পর্কিত শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে, এবং কলুষ, বাসনা ও অন্যান্য কুপ্রবৃত্তি সমূহ পরিহারের উপায় বর্ণিত আছে। 'বিনয় পিটকে' বুদ্ধের শিষ্যদের বিনয় বা শীলাচার পালনের বিধিনিষেধ, অপরাধ অনুযায়ী শাস্তির ব্যবস্থা, দুর্নীতি পরিহারের উপায় এবং সঙ্ঘের যাবতীয় নিয়ম-কানুন (আইন) বর্ণিত আছে। 'অভিধম্ম পিটকে' সাধারণতঃ মনে করা হয় বৌদ্ধদর্শনের কথা আছে, কিন্তু ঠিক তাহা নয়। কোনও ধারাবাহিক বা শৃঙ্খলাবদ্ধ দার্শনিক আলোচনা উহাতে নাই, আছে 'সুত্ত পিটকে' নিবদ্ধ ধর্মের বিবৃতি ও ব্যাখ্যান'[৫]। আছে পারমার্থিক উপদেশের আধিক্য, এবং আছে যথার্থভাবে সত্যপ্রদর্শনের ও মিথ্যাদর্শন-পরিহারের ব্যবস্থা, প্রজ্ঞা-বিষয়ক শিক্ষা ও অন্তর্নিহিত কুপ্রবৃত্তি বিনাশের বিধান। ত্রিপিটকের বাহিরেও কালক্রমে বহু গ্রন্থ (অর্থ-কথা) রচিত হইয়া বৌদ্ধশাস্ত্রের মর্যাদা লাভ করিয়াছে, কিন্তু সেগুলি অধিকাংশই মৌলিক গ্রন্থ নয়, টীকা-টিপ্পনী মাত্র। এই ত্রিপিটক হইল স্থবিরবাদী সম্প্রদায়ের প্রধান শাস্ত্র, এবং রচিত হইয়াছিল পালি ভাষায়, অর্থাৎ খুব সম্ভবতঃ পশ্চিম ভারতের বা অবন্তী-উজ্জয়িনীর ভাষায়। সর্বাস্তিবাদ বা বৈভাষিক সম্প্রদায়েরও ত্রিপিটক ছিল, সর্বাস্তিবাদের ত্রিপিটকের ভাষা ছিল সংস্কৃত। কেহ কেহ অনুমান করেন, প্রাচীনপন্থী সম্প্রদায়গুলির যে কয়টি শাখা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল তাহাদের প্রত্যেকেরই স্ব স্ব

(৫) *Dictionary of Pali Proper Names*, Malalasekhara, sub voce.

ত্রিপিটক ছিল, তাহাদের কোনওটি লেখা হইয়াছিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের এক প্রাচীন প্রাকৃত ভাষায়, কোনওটি লেখা হইয়াছিল মিশ্র সংস্কৃতে, ইত্যাদি। আবার কাহারও কাহারও মতে, মহাসাঙ্ঘিক, মহীশাসক প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের মূলগ্রন্থগুলি তিনটি পিটকে বিভক্ত ছিল, অর্থাৎ অপর কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে পালি ত্রিপিটকের অনুরূপ ত্রিপিটক গ্রন্থ ছিল,—এরূপ মনে করার হেতু নাই; অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রামাণ্য গ্রন্থগুলি সম্ভবতঃ সুত্ত ও বিনয় এই দুই পিটকে বিভক্ত ছিল।

পালি ত্রিপিটকের স্বরূপটা দেখি। 'সূত্রপিটকে' পাঁচটি নিকায় বা ভাগ আছে,—(১) দীর্ঘ নিকায় (মহাপরিনির্বাণসূত্র প্রভৃতি ৩৪টি দীর্ঘ সূত্র সংগ্রহ), (২) মধ্যম নিকায় (১৫২টি মধ্যম সূত্র সংগ্রহ), (৩) সংযুক্ত নিকায়, (৪) অঙ্গুত্তর নিকায় (বিবিধ সূত্র সংগ্রহ), ও (৫) ক্ষুদ্রক নিকায় (ক্ষুদ্র সূত্র সংগ্রহ)। ক্ষুদ্রক নিকায়ের মধ্যে ১৫ খানি গ্রন্থ সন্নিবেশিত আছে,—(১) ক্ষুদ্রক পাঠ, (২) ধর্মপদ (ধর্ম ও নীতি বিষয়ক পদাবলী), (৩) উদান (স্তুতি), (৪) ইতি-বুত্তক (বুদ্ধ-কথাবলী), (৫) সুত্ত নিপাত (৭০ টি সূত্র), (৬) বিমান বত্থু (স্বর্গ কথা), (৭) পেতবত্থু (প্রেতকথা), (৮) থের বা থেরা গাথা (স্থবির গাথা), (৯) থেরী গাথা (স্থবিরা গাথা), (১০) জাতক (বুদ্ধের পূর্বজন্মকাহিনী), (১১) নিদ্দেস, (১২) পতিসম্ভিধামগ্গ (প্রতিসম্বিৎ মার্গ), (১৩) অপদান (অর্হৎ চরিত), (১৪) বুদ্ধবংশ (গৌতম ও পূর্ববর্তী ২৪ জন বুদ্ধের জীবন বৃত্তান্ত) ও

(১৫) চরিয়া পিটক (বুদ্ধ চরিত)। 'বিনয়পিটকে'র তিনটি ভাগ, --(১) সুত্ত বিভঙ্গ (পারাজিকা ও প্রায়শ্চিত্ত বিধান), (২) খন্দক (মহাবগ্‌গ ও চুল্লবগ্‌গ বা ক্ষুদ্রবর্গ) ও (৩) পরিবার পাঠ (পরবর্তী কালে সঙ্কলিত পরিশিষ্ট)। 'অভিধর্ম পিটক'ও সাত ভাগে বিভক্ত,—(১) ধর্মসঙ্গণি, (২) বিভঙ্গ, (৩) কথাবত্থুপকরণ, (৪) পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তি, (৫) ধাতুকথা, (৬) যমক (পরস্পরবিরোধী যুগল-কথা সংগ্রহ), ও (৭) পিট্‌ঠানপকরণ (কার্য-কারণ নির্ণয়)।

কেহ কেহ বলেন, অশোকের পূর্বে ত্রিপিটক ত দূরস্থান, একটি পিটকও রচিত হয় নাই, কারণ অশোকের অনুশাসনে 'ত্রিপিটক' শব্দটির উল্লেখ নাই, বরঞ্চ তিনি তাঁহার অনুশাসনে সাতটি সূত্র অধ্যয়ন করিতে বলিয়াছেন। এই তর্কের মীমাংসা দুঃসাধ্য, তবে একটা কথা প্রণিধান করা আবশ্যক, অশোক তাঁহার অনুশাসনে ভিক্ষুসঙ্ঘকে সাতটি সূত্রই অধ্যয়ন করিতে বলেন নাই, ভিক্ষু, ভিক্ষুণী ও গৃহী উপাসকদিগকে ঐ সাতটি সূত্র-বিশেষ নিরন্তর অভ্যাস বা নিপাঠ এবং তাহাদের মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য প্রযত্নবান হইতে কহিয়াছেন। তাহা হইলে, অশোকের অনুশাসনে 'ত্রিপিটক' শব্দের উল্লেখ নাই এই নেতিমূলক প্রমাণের বলে অশোকের পূর্বে রচিত বৌদ্ধ শাস্ত্রের পরিমাণ আন্দাজ করা যায় না। পক্ষান্তরে, যে বিপুলকায় 'ত্রিপিটক' উত্তরকালে পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছিল তাহার সমগ্র কলেবরটা বুদ্ধের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই, অথবা দুই এক শতাব্দীর মধ্যেই, রচিত হইয়াছিল এরূপ সহজ বিশ্বাস পণ্ডিত-

মহলে কাহারও না থাকাই বাঞ্ছনীয়, যদিও 'দীপবংস', 'মহাবংস' প্রভৃতি গ্রন্থে এই জাতীয় বিবরণই আছে।

পাটলিপুত্র মহাসভার সময় পর্যন্ত বৌদ্ধদের তথাকথিত মজ্ঝিমদেশ বা মধ্য দেশের বাহিরে বৌদ্ধধর্ম প্রসারতা লাভ করে নাই, বুদ্ধশাসন প্রবর্তিত হয় নাই। ঐ সভার পরেই প্রত্যন্তদেশ সমূহে বৌদ্ধসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মৌদ্গলীপুত্র তিষ্য কাশ্মীর ও গান্ধারে স্থবির মাধ্যান্তিককে, মহিষমণ্ডলে স্থবির মহাদেবকে, বনবাসীতে স্থবির রক্ষিতকে, অপরান্তে যবন ধর্মরক্ষিতকে, যবন-বিষয়ে মহারক্ষিতকে, হিমালয় প্রদেশে স্থবির মধ্যম'কে, সুবর্ণদ্বীপে শোণ ও উত্তর নামা স্থবিরদ্বয়কে, এবং তাম্রপর্ণী বা লঙ্কাদ্বীপে মহেন্দ্রকে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের আশংসায় প্রেরণ করেন। শুধু মৌদ্গলীপুত্র তিষ্যই দিশি দিশি প্রচারক পাঠান নাই, অশোকের ত্রয়োদশ গিরি-লিপিতে দেখা যায় যে, কলিঙ্গবিজয়ের পর যখন ধর্মবিজয়ই প্রকৃত বিজয় বলিয়া প্রতীত হইল তখন হইতেই অশোক মধ্যদেশ বহির্ভূত ভারতের সকল স্থানে এবং ভারতের সন্নিহিত দেশসমূহেও তাঁহার ধর্মানুশাসন প্রচারের উদ্দেশ্যে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। এইরূপে উত্তর-পশ্চিমে 'আন্তিয়োক' নামক যবন রাজার রাজ্যে ও উহার বহির্ভাগে সংলগ্ন 'তুরময়,' 'অন্তিকিনি,' 'মগ' ও 'অলিকসুন্দর' নামক অপর চারিজন যবন রাজার রাজ্যে, দাক্ষিণাত্যে অন্ধ্র, পারিন্দ, চোল, পাণ্ড্য, এমন কি সিংহল প্রভৃতি দেশে, উত্তরদিকে যবন, কাম্বোজ, নাভাগ প্রভৃতি স্থানে, পূর্বদিকে কলিঙ্গাদি রাজ্যে তাঁহারই

উদ্যমের ফলে সদ্ধর্মের বিস্তৃতিলাভ ঘটে। ইহা ছাড়া, বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর তাঁহার দেহাবশেষ মধ্যদেশের রামগ্রামাদি যে আটটি স্থানে প্রোথিত করা হইয়াছিল, রামগ্রাম ব্যতীত অপর সাতটি স্থান হইতে অশোক সেই দেহধাতু সংগ্রহ করিয়া ভারতের ('জম্বুদ্বীপের') নানাস্থানে বণ্টন করিয়া পুনঃ প্রোথিত করিয়াছিলেন। কিম্বদন্তী অনুসারে, অশোক নাকি সারা ভারতে চুরাশী হাজার বিহার ও ধর্মরাজিকা নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। গণচিত্তকে ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করার ইহা এক অভিনব পন্থা। অশোকের সময় হইতেই বৌদ্ধধর্মের প্রধান কেন্দ্র হইল কাশ্মীর, মথুরা ও উজ্জয়িনী। তাঁহার মৃত্যুর পর যখন রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতার অভাব ঘটিল, বিরাট ব্যক্তিত্বশালী কোনও সঙ্ঘনায়কেরও সন্ধান মিলিল না, উপরন্তু, অপরদিকে, ব্রহ্মণ্য ধর্মের মধ্যে সুরু হইল পুনরভ্যুত্থানের এক প্রবল আলোড়ন, তখন স্বভাবতঃই বৌদ্ধধর্ম অনেকটা ম্রিয়মাণ হইয়া রহিল দীর্ঘ দুই-তিন শতাব্দী ধরিয়া। তারপর আসিল ভারতীয় ও অ-ভারতীয় নানা ভাবধারার সংমিশ্রণে ও সংঘাতে সঞ্জাত আর একটা যুগ নূতন প্রভাতের অরুণ আলোর দীপ্তি সঙ্গে লইয়া খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে। এই নূতন আলোকে জন্মগ্রহণ করিল মহাযান।

মাধ্যমিকের প্রতিষ্ঠাতা নাগার্জুনের বাড়ী কাঞ্চী অথবা বিদর্ভেই হোক্, অমরাবতীর কিংবা উহার অদূরে ধনকটকের এবং নাগার্জুনীকোণ্ডার সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের যত

ঘনিষ্ঠ সংশ্রবই থাকুক, 'সুহৃল্লেখ' নামক তাঁহার উপদেশমূলক গ্রন্থখানি হাল, বাশিষ্ঠীপুত্র-পুলমায়ী অথবা অন্ধ্রের যে কোনও সাতবাহন রাজার উদ্দেশ্যেই লিখিত হোক্—মহাযানের প্রকৃতিগত কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কৃষ্ণা-গোদাবরী উপকূলে মহাযানের প্রথম সূত্রপাত হয়,—এই মতবাদ দুর্বল, যেন ভারী দুর্বল, মনে হয়। কোনও ব্যক্তিবিশেষের একদিনের আকস্মিক কল্পনার বিহ্বলতায় মহাযানের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, ইহা মনে করা বিষম ভুল হইবে। মহাসাঙ্ঘিক ও লোকোত্তরবাদ ইহার আগমনের পথ দীর্ঘদিন ধরিয়া প্রশস্ত করিতেছিল, নাগার্জুন উপলক্ষ মাত্র। এই নাগার্জুন ঠিক ঐ সময়টিতে 'প্রজ্ঞাপারমিতা-সূত্র' না লিখিলে, কিছুদিনের মধ্যেই অপর এক নাগার্জুনকে যুগের নূতন আলোকধারায় বসিয়া মহাযানের উদার দৃষ্টিভঙ্গীকে সূত্রে প্রকাশ করিতেই হইত, যুগধর্মের গতিবেগকে কিছুতেই রোধ করিয়া রাখা যাইত না। ভারতীয় এবং অ-ভারতীয় প্রবল জনশ্রুতিতে নাগার্জুন কুষাণ-রাজ কণিষ্কের (৭৮ খৃঃ ?) সমসাময়িক, যাঁহার রাজধানী ছিল গান্ধারের পুরুষপুরে বা পেশোয়ারে। এই জনশ্রুতি ও ভারতের সহিত বহির্জগতের সংযোগক্ষেত্র, নানা সভ্যতা ও ভাবধারার মিলনভূমি এবং গ্রীক-বৌদ্ধ-শিল্পের উদ্ভবস্থান গান্ধারের ভৌগলিক সংস্থান স্মরণ করিলে, গান্ধারকেই মহাযানের জন্মভূমি বলিয়া যেন বেশী মনে হয়। কুষাণ-যুগে গান্ধারের ওপারেও মহাসাঙ্ঘিকদের প্রবল এক কেন্দ্র ছিল, কাবুলের

মাইল ত্রিশেক পশ্চিমে ওয়ার্ডাকে বা খবদে আবিষ্কৃত ৫১ সম্বৎসরের খরোষ্ঠী অক্ষরে উৎকীর্ণ একটি লেখ তাহা প্রমাণ করে, এবং পরেও যে তাঁহাদের প্রভাব সেই অঞ্চলে অব্যাহত ছিল, অন্দরবের (আফগানিস্থান) স্তূপ তাহা সমর্থন করে। কণিষ্কের রাজত্বকালে হয় জালন্ধরে, না হয় কাশ্মীরের কুন্দলবনে বা পিঙ্গলবনে, আচার্য বসুমিত্রের সভাপতিত্বে চতুর্থ ও শেষ মহাসভার অধিবেশন হইয়াছিল, অষ্টাদশ সম্প্রদায়ের মত-সমূহের মধ্যে সঙ্গতি বিধানের উদ্দেশ্যে। এই সভার যে বিবরণ চৈনিক ও তিব্বতীয় ঐতিহ্যে পাওয়া যায় তাহা সত্য হইলে, এই সভায় যে পাঁচশত ত্রিপিটক-বিশারদ, অর্হত্বপ্রাপ্ত স্থবির সদস্য নির্বাচিত হইয়া যোগদান করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে থেরবাদিদের প্রতিনিধি অতি অল্পই ছিলেন, অধিকাংশই ছিলেন মহা-সাঙ্ঘিক, এবং তাঁহারাই তিন পিটকের প্রত্যেকটির এক লক্ষ শ্লোকে যে বিভাষা-শাস্ত্র বা টীকাগ্রন্থ রচনা করিলেন, সেগুলি অশ্বঘোষ কর্তৃক সংশোধনের পর ত্রিপটক সহ তাম্রপত্রে উৎকীর্ণ হইয়া শৈলপেটকে আবদ্ধ হইয়া ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়াছিল,—যাহার উপরে কণিষ্ক এক স্তূপ নির্মাণ করিয়া উহাকে প্রক্ষিপ্তকরণের বা অপর কোনও সম্প্রদায় কর্তৃক হস্তগত করার পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। এই সভাতেই সম্ভবতঃ আসন্ন মহাযানের পদধ্বনি শোনা গিয়াছিল। এবং অল্পকাল মধ্যেই নাগার্জুন মাধ্যমিক শাস্ত্র রচনা করেন। যদি 'প্রজ্ঞাপারমিতা-সূত্র' এবং অন্যান্য গ্রন্থ তিনি ধনকটকের বা কৃষ্ণা-গোদাবরী অঞ্চলের অপর কোনও বিহারে বসিয়াই লিখিয়াছিলেন

বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তবুও স্বীকার করিতে হইবে নবজাত মহাযান অচিরেই উত্তর-পশ্চিম ভারতে কণিষ্কের আশ্রয়ে লালিত, পালিত ও বর্ধিত হইয়াছিল। নচেৎ ঐ অঞ্চলে শৈশব অতিবাহিত হইলে, পরবর্তী কালে উদ্ভূত পূর্বশৈল, অপরশৈল, উত্তরশৈল, চৈত্যক প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলির মতই বহির্জগতের দৃষ্টিপথের অগোচরে থাকিয়া মহাযানও শীর্ণকায় পাণ্ডুর শিশুর মতই একটি স্থানীয় সম্প্রদায়রূপে কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিয়া ভবলীলা সাঙ্গ করিত।

যাঁহারা মহাযান অবলম্বন করিলেন তাঁহাদের মতের আদর্শ হইল উদার ও উন্নত। তাঁহারা বলিলেন, ঐ যে প্রাচীনপন্থীরা, উঁহারা বুদ্ধদেবের ধর্মমতের ও নীতির গূঢ় ও যথার্থ তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া অলস ও গতানুগতিকভাবে কেবল কতকগুলি বাহিরের আচার ও অনুষ্ঠান পালন করিয়া আসিতেছেন মাত্র উঁহাদের ঐ পথ,—ঐ যান,—হীনযান, উঁহাদের দৃষ্টি যেমন সঙ্কীর্ণ, দৃষ্টিপরিসর তেমনই সীমাবদ্ধ। প্রাচীনপন্থিগণের মধ্যে দুইটি দল ছিল, তন্মধ্যে একদল বুদ্ধ-নিরূপিত আচার-ব্যবহার পালন করিয়া আত্মপ্রভাব দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহ জয় করিয়া ও অন্তঃকরণকে পরিশুদ্ধ করিয়া জপ-তপের সাহায্যে সংসারের সমুদয় বন্ধন ছিন্ন করিয়া জীবন্মুক্ত অর্হৎ হইতে চেষ্টিত ছিলেন। তাঁহাদের ধারণা, এইরূপ জীবন্মুক্ত হইলেই নির্বাণ লাভ করা যায়, তাঁহার আর কোনও অশুদ্ধতা থাকে না, তিনি তখন সমস্ত প্রলোভনের অতীত, সদাসদ্ সকল কর্মের ঊর্ধ্বে, কাজেই তাঁহার পুণ্যাপুণ্যের কোনও প্রশ্নই উঠে না,

কায়িক, বাচনিক বা মানসিক কোনও প্রকার পাপ প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্নভাবে তাঁহার মধ্যে থাকেনা, দেহ মন সমস্তই তাঁহার স্ববশে আনীত হয়, তিনি সাধনার পথে অগ্রসর হইয়া স্বচক্ষে সত্য প্রদর্শন করেন। ইঁহাদের মতে নির্বাণে উপনীত হওয়ার চারিটি সোপান। প্রথম সোপান প্রাপ্ত হইয়া 'স্রোতাপন্ন' হইলে মনুষ্যেতর পশুযোনিতে আর জন্ম হয় না; দ্বিতীয় সোপানে উন্নীত হইলে তিনি 'সকৃদাগামী', আরও একবার তাঁহাকে সংসারে ফিরিতে হইবে, কারণ সংসার-বন্ধন হইতে তিনি সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই; তৃতীয় সোপানে আরোহণ করিয়া 'অনাগামী' হইলে আর মর্ত্যলোকে ফিরিয়া আসিতে হয় না; আর চতুর্থ সোপানে আরূঢ় হইতে পারিলেই তিনি তখন পূর্ণ মানব,—জীবন্মুক্ত অর্হৎ,—তাঁহার সকল বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। ইঁহাদের পথকে 'শ্রাবকযান' বলা হয়, এবং অর্হতত্ব লাভই শ্রাবকযানের সাধনার শেষ সীমা,—বুদ্ধত্বলাভের উচ্চাশা ইঁহাদের মোটেই ছিলনা। অন্য দলটি অর্হৎ হইয়া বুদ্ধত্ব লাভের আশা করিতেন সত্য কিন্তু তাহা কেবল তাঁহাদের প্রত্যেকের নিজের জন্য,—সকলের জন্য নয়, জীবজগতের কল্যাণের জন্য নয়। এইজন্য ইঁহাদের পথ 'প্রত্যেকবুদ্ধযান' নামে অভিহিত। 'প্রত্যেকবুদ্ধগণ' নিজ নিজ সাধনা ও পুণ্যগুণে যে দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া বুদ্ধ হন, লোক-মধ্যে সেই জ্ঞান বিতরণ করিতে তাঁহারা অক্ষম,—তাঁহারা প্রত্যেকে নিজের মহিমাতেই নিজে বিরাজ করেন, কিন্তু সেই মহিমায় অপরকে অভিসিঞ্চিত করিতে পারেন না। আদর্শের এই দৈন্য

হইতে মহাযানপন্থী মুক্ত। কেবলমাত্র নিজের জন্যই বুদ্ধত্বলাভের তুচ্ছ আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করার লালসা তাঁহার ছিল না। বুদ্ধ যেমন বুদ্ধত্বলাভের পূর্বে সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ সাধনার্থ জন্মজন্মান্তর ধরিয়া পরোপকারে, পরের হিতৈষণায়, আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, মহাযান-যায়ীর সাধনার লক্ষ্য হইল তাহাই। বুদ্ধের জন্মজন্মান্তরের ঐ অবস্থাকে 'বোধিসত্ত্ব' অবস্থা বলা হয়। বোধিসত্ত্ব অব্যক্ত বুদ্ধ। বোধিসত্ত্বের মধ্যে বুদ্ধত্বের যে বীজ নিহিত থাকে, কালক্রমে সেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বুদ্ধত্বে পরিণত হয়। অর্থাৎ, একবার বোধিমার্গে উন্নীত হইতে পারিলে বোধিসত্ত্ব তখন ধীরে ধীরে, শনৈঃ শনৈঃ, বুদ্ধত্ব লাভের পথে অগ্রসর হইতে থাকেন। কিন্তু সেই বুদ্ধত্বলাভে অপরাপর যাবতীয় সকলের সহায়তা করাই সর্বোত্তম, সর্বাপেক্ষা মহান্ আদর্শ, আর সেই সাহায্য বিতরণে যদি নিজের বুদ্ধত্বলাভে বিঘ্ন ও বিলম্ব ঘটে, ঘটুক,—তত্রাচ মহাযানী নিজের আদর্শ হইতে চ্যুত হইতে পারেন না। যে অবস্থা লাভ করিয়া সকলের কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করিতে পারা যায়, সেই বোধিসত্ত্ব অবস্থাটার জন্যই তাঁহারা সব চেয়ে লালায়িত হইলেন, এবং তাঁহাদের মতে করুণা, মৈত্রী প্রভৃতি কতকগুলি 'পারমিতা' বা গুণ-বিশেষের চর্যা করিলেই এই বোধিসত্ত্ব অবস্থাকে দৃঢ়ীভূত ও স্থায়ী করা যায়। আবার সকল চর্যার মধ্যে মৈত্রীই হইল সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ চর্যা, কাজেই মহাযান-পন্থীর নিকট মৈত্রীর দেবতারূপে 'মৈত্রেয়' নামক এক ভাবী-বুদ্ধ কল্পিত হইয়া পূজালাভ করিতে লাগিলেন। বুদ্ধ পরিনির্বাণের পূর্বে

নাকি এই মৈত্রেয়কেই স্বীয় উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিয়া যান। এই জন্য মৈত্রেয় গৌতমবুদ্ধের স্থান অধিকার করিয়া বসিলেন। ভবিষ্যতে যে বুদ্ধ সদ্ধর্ম পুনঃ স্থাপন করিতে আবির্ভূত হইবেন, সেই মৈত্রেয় এক্ষণে বোধিসত্ত্ব-রূপে তুষিত স্বর্গে বাস করিতেছেন।

হীনযানীরা বলিলেন,—তা আর নয়, শ্রাবকযানের আর বুদ্ধযানের মুক্তি সে একই, কেবল মার্গটা যা ভিন্ন। এজন্য তাঁহারা বোধিসত্ত্ব হওয়াটাকে অধিকতর মূল্য দিলেন না, মহত্তর গুণোপেত বলিয়াও স্বীকার করিলেন না। তাঁহারা বলিলেন, বোধিসত্ত্ব-ত্ব মানে গৌতমবুদ্ধের পূর্বেকার জীবন, তাহা অপরে আবার কি করিয়া লাভ করিতে পারে? থেরবাদী এবং তাঁহাদের শাখা-গুলির মতানুসারে, গৌতমবুদ্ধ মানুষ, তিনি কেবল নিজের চেষ্টায় ও সাধনায় বোধিজ্ঞান ও সর্বজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, সত্য দর্শন করিয়াছিলেন। যোগবলে তিনি মনুষ্যজীবনের দৈনন্দিন ঘটনাস্রোতকে আয়ত্ত বা পরাভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু মানবজীবনের ভঙ্গুরতার তিনিও ছিলেন অধীন। এইখানে মহাসাঙ্ঘিক ও লোকোত্তরবাদী, এই দুই সম্প্রদায় তুলিলেন ঘোর আপত্তি। তাঁহারা কহিলেন, বুদ্ধ ত লোকোত্তর, তাঁহার সত্ত্ব অনাস্রব বা বিশুদ্ধ ধর্মসমূহে গঠিত। তাঁহার দেহ, তাঁহার জীবন, তাঁহার শক্তিনিচয়, সকলই অনন্ত। তাঁহার সমস্তই, এমন কি, তাঁহার এই সংসারে আগমন পর্যন্তও, অলৌকিক। বুদ্ধ-কল্পনা

যাঁহাদের এরূপ, তাঁহাদের বোধিসত্ত্ব-ত্বকেও অর্ধ-অলৌকিক বলিয়া জ্ঞান করিতে বাধা রহিল না তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, বোধিসত্ত্বগণ স্বয়ম্ভূ, অর্থাৎ মাতাপিতা হইতে উৎপন্ন নন। গর্ভ-যাতনা তাঁহাদের ভোগ করিতে হয় না। তাঁহারা স্বেচ্ছায় যে কোনও রূপে ও আকারে জন্মগ্রহণ করেন।

অনুমান হয়, মহাসাঙ্ঘিক ও লোকোত্তরবাদী সম্প্রদায়ের বুদ্ধ সম্বন্ধে এই ধারণাই বুদ্ধ-মূর্তি উৎপত্তির হেতু হইয়াছিল। এবং ইহা মানিয়া লইলে, কণিষ্ক-যুগে মহাযানের আবির্ভাবের পূর্বেও গান্ধারে কি প্রেরণায় বুদ্ধ-মূর্তি রচিত হইয়াছিল সেই রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হইতে পারে। এই দুই সম্প্রদায়ের দার্শনিক দৃষ্টিই মহাযানের শূন্যবাদের দার্শনিক দৃষ্টির আদর্শ হইয়াছিল, ইহাতে সংশয় নাই। মহাযান বৌদ্ধদর্শনের ক্রমবিবর্তনের বা প্রপঞ্চনের একটা নূতন স্তরমাত্র, এবং হীনযানের সহিত উহার অন্তর্নিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া যায় নাই। অনেকে যান পরিবর্তন করিতেন, অনেকে আবার উভয় যানই অবলম্বন করিতেন, এমন দৃষ্টান্ত বহু।

মহাযানের প্রাচীন সাহিত্য রচিত হইল কতকগুলি সূত্র লইয়া, তন্মধ্যে সংস্কৃতে রচিত 'প্রজ্ঞাপারমিতা-সূত্র' হইল সর্বাপেক্ষা প্রধান। 'প্রজ্ঞাপারমিতা' বুদ্ধের মুখ দিয়া বলান হইয়াছে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া উহা আর সত্য সত্যই বুদ্ধবচন নয়, পরন্তু নাগার্জুন প্রমুখ আচার্যদের রচনা। প্রাচীনপন্থিদের 'অভিধম্মপিটক'কে মহা-সাঙ্ঘিকেরাই বুদ্ধবচন নয় বলিয়া নিজেদের পিটকের অন্তর্ভুক্ত

করেন নাই ('দীপবংস', ৫, ৩২-৩৮), মহাযানীগণ ত 'অভিধম্ম পিটকে'র ধারই ধারিতেন না। তবে 'প্রজ্ঞাপারমিতা' প্রভৃতি শাস্ত্রগুলিই হইল মহাযানের অভিধর্ম। মৈত্রী, করুণা প্রভৃতির মত, প্রজ্ঞাও একটি পারমিতা বা বিশেষ গুণ, এবং বোধিমার্গে আরূঢ় হইতে হইলে প্রজ্ঞার চর্চা বাদ দিলে চলে না, কারণ প্রজ্ঞা ব্যতীত বোধিজ্ঞান লাভ হয় কিরূপে? প্রাচীনপন্থিগণের 'বিনয় পিটক' প্রথমটা মানিয়া লইলেও কালক্রমে মহাযান-শাস্ত্রেও এক নূতন 'বিনয়' রচিত হইল। পালি ত্রিপিটকের বহির্ভূত মহাযান-মতের মূলগ্রন্থগুলি 'বোধিসত্ত্ব পিটক' নামে অভিহিত। দার্শনিক তত্ত্বের দিক দিয়া মহাযান আবার কালক্রমে মাধ্যমিক ও যোগাচার নামে দুই প্রশাখায় বিভক্ত হইল। মাধ্যমিক-দর্শনের উদ্ভাবয়িতাই নাগার্জুন। যোগাচার সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়ত হইয়াছিল সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের পূর্বেই, কিন্তু উহা সমৃদ্ধ হইল চতুর্থ-পঞ্চম শতকে অসঙ্গ ও বসুবন্ধুর প্রচারণে। তাঁহারাও গান্ধারেরই অধিবাসী। এই সম্প্রদায়ের সাধন-মার্গকেই যোগাচার বলে, উহার দার্শনিক মতবাদের নাম বিজ্ঞানবাদ। ইঁহারা বলেন, প্রত্যেক জ্ঞানক্রিয়া অর্থাৎ প্রকৃতি-বিজ্ঞান, এবং জ্ঞান-সমষ্টি অর্থাৎ আলয়-বিজ্ঞান, এই দুই প্রকার বিজ্ঞানই এক মাত্র সত্য পদার্থ, আর সব মিথ্যা।

গৌতমবুদ্ধ কখনও নিজের উপর ঐশী-শক্তি আরোপ করেন নাই, কিন্তু মহাযানের কল্যাণে তিনি হইয়া গেলেন দেবতা।

দেবতা হইলে পূজাও গ্রহণ করিতে হয়, কাজেই বহু বুদ্ধ-মূর্তি গঠিত হইতে লাগিল, এবং বুদ্ধ যে দেবতা তাহা বুঝাইবার জন্য তাঁহার মস্তকসংলগ্ন প্রভামণ্ডলী রচনার নিয়ম প্রবর্তিত হইল। ক্রমশঃ ভাবী-বুদ্ধ মৈত্রেয়ের পূজাও আরম্ভ হইল। মৈত্রেয় ব্যতীত, গুণাত্মক, ধ্যানাত্মক তিন কাল্পনিক বোধিসত্ত্বের আবির্ভাব হইল,—(১) মঞ্জুশ্রী বা বাগীশ্বর, (২) পদ্মপাণি অবলোকিতেশ্বর ও (৩) বজ্রপাণি। এই ত্রিদেব ব্যতীত, জ্ঞান, শক্তি ও মঙ্গলের আধার বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ এই ত্রিরত্নও কল্পিত হইল, এবং ত্রিরত্নের পূজা প্রবর্তিত হইল। কালক্রমে আবার পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের সৃষ্টি হইল। এই পঞ্চ-ধ্যানীবুদ্ধ পঞ্চ-মনুষ্যবুদ্ধের অশরীরী প্রকৃতি, তাঁহাদের বাসস্থান পঞ্চ অরূপলোকে। তাঁহারা প্রত্যেকে ধ্যানপ্রভাবে আত্মস্বরূপ হইতে একটি করিয়া পাঁচটি বোধিসত্ত্ব উৎসৃজন করেন, আবার প্রত্যেক বোধিসত্ত্ব একটি করিয়া রূপলোক সৃষ্টি করিয়া থাকেন। অধুনা চতুর্থ বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের অধিকার যাইতেছে, বর্তমান জগতের তিনিই সৃষ্টিকর্তা, তিনিই এই জগতের সকলের বরেণ্য। পঞ্চ-ধ্যানীবুদ্ধ, পঞ্চ-বোধিসত্ত্ব ও পঞ্চ-মানুষীবুদ্ধের সম্বন্ধটা এইরূপ দাঁড়ায়,—

ধ্যানীবুদ্ধ	বোধিসত্ত্ব	মানুষীবুদ্ধ
(১) বিরোচন	(১) সমন্তভদ্র	(১) ক্রকুচ্ছন্দ
(২) অক্ষোভ্য	(২) বজ্রপাণি	(২) কনকমুনি
(৩) রত্নসম্ভব	(৩) রত্নপাণি	(৩) কাশ্যপ
(৪) অমিতাভ	(৪) অবলোকিতেশ্বর	(৪) গৌতম
(৫) অমোঘসিদ্ধি	(৫) বিশ্বপাণি	(৫) মৈত্রেয়

বাঙ্গালা দেশেও এই ধর্ম একদা প্রবেশ লাভ করিয়াছিল এবং ধীরে ধীরে প্রভূত প্রসার লাভ করিয়াছিল। সেই ইতিহাস একদিকে যেমন বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের, অপর দিকে তেমনই বাঙ্গালাদেশের ইতিহাসের, এক সমুজ্জ্বল অধ্যায়। এই ইতিহাস অনুধাবন করিলে দেখা যায়, যে ধর্ম খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে পূর্ব-ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, আঠার শত বৎসর পরে পূর্ব-ভারত হইতেই বিদেশী বিজেতৃর নৃশংস অসির প্রচণ্ড বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া জন্মভূমি হইতে অসহ বেদনায় বিদায় লইয়া গেল। এই করুণ ঘটনার ব্যাখ্যায় কোনও কোনও ঐতিহাসিক অন্যান্য কারণ অনুসন্ধানের প্রয়োজন বোধ করিয়াছেন, এবং হয়ত অন্য দুই একটি কারণের নির্দেশ অযৌক্তিকও নয়, কিন্তু মূল কারণকে অনাদর করিয়া যাঁহারা আনুষঙ্গিক কারণের প্রাধান্য দিতে ব্যগ্র, তাঁহাদের সহিত একমত হওয়া যায় না।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের দ্বিতীয় পাদে যখন পাটলিপুত্রের গুপ্ত-সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের বিজয়-অভিযানের ফলে আর্যাবর্তের এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড তাঁহার পদানত হইল, তখন উত্তর-বঙ্গ ও তৎসহ পশ্চিম-বঙ্গের কিয়দংশ লইয়া পুণ্ড্রবর্ধন নামে এক ভুক্তি বা প্রদেশ গঠিত হইয়া তাহা গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। এবং ঐ সাম্রাজ্যের পতন পর্যন্ত ন্যূনাধিক দুই শত বৎসর ধরিয়া পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তি মগধের প্রতাপান্বিত গুপ্ত-গণের অধীনস্থ হইয়া রহিল। বাস্তবপক্ষে বাঙ্গালা দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, শাসনতান্ত্রিক

ও ধর্মসম্বন্ধীয় যে প্রাচীন ইতিহাস ধারাবাহিকরূপে অনুবহমান, তাহার সূচনা এই সময় হইতেই। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের পূর্বে বাঙ্গালাদেশের ইতিহাস বলিয়া যাহা চলে, তাহা সাহিত্যে ও দুই-একখানি প্রাচীন লেখে ধৃত কতকগুলি কথার, উপকথার ও নামের বিচ্ছিন্ন উল্লেখ মাত্র,—এত বিচ্ছিন্ন এবং কালের ব্যবধান অনেক ক্ষেত্রে এত বেশী যে তাহাদের মধ্যে পারম্পর্য ও যোগসূত্র সংস্থাপন করিতে গিয়া, কল্পনা অনেকস্থলে কষ্টকল্পনা বা দুষ্টকল্পনারই সমার্থক হইয়া পড়িয়াছে। গুপ্ত-সাম্রাজ্যের ধ্বংসের আবার ন্যূনাধিক দুই শত বৎসর পরে, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে, বাঙ্গালায় পাল-রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হইল, এবং সুদীর্ঘ চারি শতাব্দী কাল পর্যন্ত পাল-রাজগণ অধিকাংশ সময় পূর্ব-বঙ্গ ব্যতীত বাঙ্গালার অন্যান্য অংশে প্রভুত্ব করিয়াছিলেন। গুপ্ত-বংশের পতনের অব্যবহিত পর হইতেই বাঙ্গালী 'জাতীয়তা'র এক তীব্র চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠার যে প্রবল চেষ্টা করিতেছিল, তাহার পরিণতি দেখা দিল পালদের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে। পাল-বংশের প্রতিষ্ঠার সহিত বাঙ্গালীজাতিও আত্মপ্রতিষ্ঠ হইল। রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে, যুদ্ধবিগ্রহে, শাসনপদ্ধতির উৎকর্ষতায়, ধর্মে, দর্শনে, সাহিত্যে, ভাস্কর্যে, চিত্রাঙ্কণে, সঙ্গীতে,—এক কথায় জীবনের সকল আবশ্যক ক্ষেত্রে বাঙ্গালী এত দ্রুত উন্নতির পরিচয় দিতে লাগিল যে শুনিতে বিস্ময় লাগে। স্বাধীনতার পাগলা হাওয়ার ছোঁয়া লাগিয়া যেদিন জড়তার ক্ষয় হইল, সৃষ্টিতে ব্রতী হইয়া বাঙ্গালী সেদিন সুন্দরের মন্দিরে শান্ত

যোগাসনে বসিয়া যে দেবতাকে আবাহন করিল, সেই সুন্দর আসিয়া ধীরে ধীরে ধরা দিলেন তাহার কোমলকান্ত রচনায়, তাহার শক্তি-তত্ত্বে ও প্রেম-ধর্মে, আর তাহার মন্দিরে মন্দিরে স্থাপিত সুঠাম ও নয়নাভিরাম দেববিগ্রহের অঙ্গে অঙ্গে সর্বাঙ্গে।

এই পাল-রাজগণ ছিলেন মগধেরও অধীশ্বর। আবার তাঁহারা ছিলেন ধর্মে বৌদ্ধ। পূর্ব-বঙ্গ পাল-রাজগণের অধিকারচ্যুত হইবার পরে তাঁহাদের সমসাময়িক একাধিক রাজবংশও ছিল বৌদ্ধ। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে চৈনেয় পরিব্রাজক হুয়েন সাং যখন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন তখনই বৌদ্ধধর্মের অবনতি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অষ্টম শতাব্দীর মধ্য ভাগ হইতে বৌদ্ধ পাল-নরপতিগণের পৃষ্ঠপোষকতায় ও আনুকূল্যে সঞ্জীবিত হইয়া বৌদ্ধধর্ম আবার যেন যৌবনশক্তি ফিরিয়া পাইল, জমকিয়া উঠিল। উঠিল বটে, কিন্তু বাঙ্গালায় ও মগধেই উহার আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপিত হইল। কিন্তু ইহার অর্থ নয় যে, ভারতের অন্যান্য স্থানে এই দীর্ঘকালে এই ধর্ম একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল। উহা ছিল,—নেপালে ছিল, কাশ্মীরে ছিল, রাজপুতনায় ও পশ্চিম-ভারতে এবং দাক্ষিণাত্যের দুই উপকূলেই ছিল, উড়িষ্যায় ছিল, মধ্য-ভারতে ছিল,—এক কথায় ভারতের প্রায় সর্বত্রই অল্প-বিস্তর রূপে ছিল, কিন্তু অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রধান লীলাক্ষেত্র ছিল বাঙ্গালা ও তাহার গায়ে সংলগ্ন মগধ, এবং কতকটা কাশ্মীর। কাজেই বাঙ্গালাদেশে এই চারি পাঁচ শতাব্দীর

বৌদ্ধধর্মের এক বিস্তৃত ও ব্যাপক ইতিহাস থাকার কথা। খৃষ্টীয় চতুর্থ হইতে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্তও বাঙ্গলাদেশে বৌদ্ধধর্মের এক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রহিয়াছে। সংক্ষিপ্ত হইলেও তাহা ইতিহাস। কিন্তু তাহার পূর্বে যাহা পাওয়া যায়, তাহার কতখানি ইতিহাস আর কতখানি কাহিনী, তাহা নির্ধারণ করা অসম্ভবপ্রায়।

আদি যুগ

বাঙ্গালাদেশে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস বিবৃত করিতে গেলেই সর্বপ্রথম প্রশ্ন ওঠে, এই দেশের ভূমিতে এই ধর্ম কবে, কখন, প্রথম পদার্পণ করিয়াছিল। কুসিনারায় বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার দেহাবশেষ বা চিতাভস্মের অংশ লাভের জন্য দাবী জানাইয়াছিলেন মগধরাজ অজাতশত্রু, বৈশালীর লিচ্ছবিগণ, কপিলবাস্তুর শাক্যগণ, অল্লকপ্পের (আর্দ্রকল্পের) বুলিগণ, রামগ্রামের কোলিয়গণ,—বেঠদ্বীপের (বেষ্টদ্বীপের) জনৈক ব্রাহ্মণ, পাবার মল্লগণ এবং কুসিনারার মল্লগণ। অংশ লাভ করিয়া ইঁহারা নিজ নিজ দেশে উহা নিহিত করিয়া তদুপরি আটটি স্তূপ নির্মাণ করিলেন। যে পাত্রে ঐ ভস্ম সংগৃহীত হইয়াছিল তাহার উপরে দ্রোণ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ একটি স্তূপ, এবং চিতার অঙ্গারের উপর পিপ্পলিবনের মোরিয়গণ আর একটি স্তূপ নির্মাণ করিলেন[১]—দ্রষ্টব্য, এই তালিকায় বাঙ্গালাদেশের কোনও অংশেরই নামগন্ধ পর্যন্ত নাই। অর্থাৎ, বাঙ্গালার পক্ষ হইতে কেহ কোনও দাবীও জানায় নাই, কেহ কোনও অংশ লাভও করে নাই। পরবর্তীকালে এই তালিকার সহিত যখন উত্তর-পশ্চিম

---

(১) *Buddhavaṁsa*, ed. Richard Morris, Pali Text Society, 1882, Part I, Ch. XXVIII, pp. 68—69; Mahā-Parinibbāna Suttanta, XVI, *Dialogues of the Buddha*, Part II, Rhys Davids and Rhys Davids, pp. 189—91.

সীমান্তের গান্ধার ও উড়িষ্যার দক্ষিণস্থ কলিঙ্গের নাম যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল,—তত্রত্য অধিবাসিগণ বুদ্ধদেবের একটি করিয়া দন্ত লাভ করিয়া তাহার পূজা করিতে লাগিলেন,—তখনও, এই পরবর্তী কালের সংযোজনায়ও,বাঙ্গালার কোনও অংশের নাম স্থান লাভ করে নাই। প্রাচীন পালি সাহিত্যে বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ভারতে যে ষোলটি মহাজনপদের নামের তালিকা পাওয়া যায়, তাহাতেও বাঙ্গালার কোনও অংশের নাম নাই[২]। তাহা হইলে অনুমান করিতে হয়, বুদ্ধের জীবদ্দশায় তাঁহার ধর্ম বাঙ্গালা দেশে বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। একটি 'জাতকে' অবশ্য 'লাল্হ' বা রাঢ়দেশের (পশ্চিম-বঙ্গের) উল্লেখ আছে,—লাল্হ হইতে এক যুবক বিদ্যা-শিক্ষার্থ তক্ষশিলায় গমন করিয়াছিলেন[৩], কিন্তু এই উল্লেখ দ্বারাও বুদ্ধের সময় রাঢ়দেশে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার প্রমাণিত হয় না।

তবে বুদ্ধের অনেক পরে রচিত 'দিব্যাবদান' 'অশোকাবদান' প্রভৃতি বৌদ্ধ অবদানগুলিতে এক কাহিনী নিবদ্ধ আছে, তাহাতে দেখি, কোশলের রাজধানী শ্রাবস্তীর ধনকুবের, বুদ্ধশিষ্য সুদত্ত-

---

(২) কেবল 'অঙ্গুত্তর নিকায়ে'র একটি সংস্করণে এই গ্রন্থের অন্তর্গত 'মহা-বগ্‌গে'র একস্থলে মহাজনপদগুলির তালিকায় 'বংগ' এই পাঠ রহিয়াছে,—ed. Richard L. Morris, Pali Text Society, Part 1, 1885, *Mahāvagga*, III, 70, 17, p. 213; কিন্তু স্পষ্টই বুঝা যায় লিপিকর প্রমাদে পুঁথিতে 'বংশ' বা 'বৎসে'র পরিবর্ত্তে 'বংগ' লিখিত হইয়াছে।

(৩) *Jātakas*, Vol. I, p. 447.

অনাথপিণ্ডদ সুমাগধা[৪] নাম্নী তাঁহার এক কন্যাকে বিবাহ দিয়াছিলেন পুণ্ড্রবর্ধনের এক যুবকের সহিত। বৌদ্ধ ইতিহাসে এই অনাথপিণ্ডদের একটা বিশিষ্ট পরিচয় আছে,—যতগুলি সোনার মোহর ছড়াইয়া শ্রাবস্তীর উপকণ্ঠে জেতবন নামক একটি বৃহৎ উদ্যানকে ঢাকিয়া দেওয়া যায় ততগুলি মোহর দিয়া সেই উদ্যান তিনি ক্রয় করিয়া তন্মধ্যে বুদ্ধদেবের বাসের জন্য একটি বিরাট বিহার নির্মাণ করাইয়া বুদ্ধদেবকে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। পুণ্ড্রবর্ধনে তখন কোনও বৌদ্ধ ছিলনা, ছিল অনেকগুলি উলঙ্গ নির্গ্রন্থ (জৈন)। তাহাদের রুচি-বিগর্হিত ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া, এবং তাঁহার স্বামী ও স্বামীর আত্মীয়-বর্গকে বৌদ্ধধর্মের আচার-ব্যবহারের সহিত পরিচয় করাইবার উদ্দেশ্যে সুমাগধা ধ্যানে বুদ্ধদেবকে স্মরণ করিলেন, এবং পরের দিনই বুদ্ধও নাকি শত পাঁচেক শিষ্য সহ 'গগন-পথে' পুণ্ড্রবর্ধনে উপস্থিত হইয়া সুমাগধাকে অনুগৃহীত করিলেন। বুদ্ধদেবের আগমনবার্তা শুনিয়া সেখানকার অধিবাসিগণ আসিয়া তাঁহার চতুর্দিকে ভীড় করিয়া দাঁড়াইলেন, এবং তাঁহাকে সাতিশয় ভক্তি নিবেদন করিলেন। একাদশ শতাব্দীতে কাশ্মীরের ক্ষেমেন্দ্র-বিরচিত 'বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা'য় 'সুমাগধা-অবদান' নামক যে কাহিনী আছে তদনুসারে সুমাগধার স্বামীর নাম বৃষভদত্ত, এবং ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে রচিত তিব্বতীয়

---

(৪) সুমাগধার জন্য *Nepalese Buddhist Literature,* R. L. Mitra, 1882, p. 237, এবং *Analysis of the Sher-Chin,* Alexander Csoma Korösi, p. 482 দ্রষ্টব্য।

'পগ্ সাম্ জোন্ জ্যঙ্গ' নামক গ্রন্থে যে নারী বুদ্ধদেবকে ইক্ষুবর্ধনে (পুণ্ড্রবর্ধনে) আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন তাঁহার নাম পাই মগধভদ্রা। হুয়েন সাংয়ের বিবরণীতে সুমাগধার উল্লেখ নাই, কিন্তু তিনিও বলিয়াছেন বুদ্ধ পুণ্ড্রবর্ধনে আসিয়াছিলেন এবং দেবধার্মিকগণের (হিন্দুদের) উদ্ধারের জন্য মাসত্রয় ধরিয়া তাঁহার ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন। শুধু পুণ্ড্রবর্ধনে নয়, হুয়েন সাং বলেন, বুদ্ধদেব ঐ একই উদ্দেশ্যে সমতটে (দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গে) সাতদিন, এবং কর্ণসুবর্ণেও (বহরমপুরের নিকট রাঙ্গামাটিতে) সাতদিন ধরিয়া ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন, এবং এই তিন স্থানের যেখানে যেখানে তিনি ধর্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন সেখানেই পরে অশোক একটি করিয়া স্তূপ নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। পুণ্ড্রবর্ধনের স্তূপটি 'পো চি পো' (ভাসু) নামক সঙ্ঘারামের পার্শ্বে, সমতটের স্তূপটি রাজধানীর সন্নিকটেই এবং কর্ণসুবর্ণের স্তূপটি 'রক্তভিত্তি' সঙ্ঘারামের সন্নিধানে নির্মিত হইয়াছিল। কিন্তু এ সকলই হইল বহুকাল পরে প্রচলিত উপাখ্যান বা জনশ্রুতির কথা। একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে লোক-পরম্পরায় প্রচলিত কিম্বদন্তীর মধ্যে কখনও কখনও সমগ্র অথবা আংশিকভাবে ইতিহাস লুক্কায়িত থাকে, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত না হয়, ততক্ষণ জনশ্রুতি জনশ্রুতিই, উহা ইতিহাসের মর্যাদা লাভ করিতে পারে না। বুদ্ধদেব তাঁহার অমূল্য জীবনের সার্ধ তিন মাস বাঙ্গালাদেশে ধর্মপ্রচারে অতিবাহিত করিলেন, অথচ প্রাচীন বৌদ্ধসাহিত্যে ইহার কোনও উল্লেখ নাই, প্রাচীন সঙ্ঘপিতামহগণ ইহার

কোনও সংবাদই রাখেন নাই, এরূপ কথা সহসা বিশ্বাস করা কঠিন। বুদ্ধের সাক্ষাৎ শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে বাঙ্গালী কাহাকেও দেখিনা, ইহাও এরূপ বিশ্বাসের পরিপন্থী। তাঁহার পরিনির্বাণের পর বাঙ্গালা দেশের কোনও জাতি বা ব্যক্তি তাঁহার পবিত্র শরীর-ধাতুর অংশ প্রাপ্তির জন্ম আবেদন করিলনা, ক্ষীণ দাবীটুকুও জানাইলনা, অথচ নাকি বাঙ্গালাদেশে তৎপূর্বেই তাঁহার অনুশাসন প্রচারিত হইয়াছিল, ইহাই বা কেমনতর কথা? মগধ ও বাঙ্গালা এই দুই দেশের ভৌগলিক অবস্থান এইরূপ যে, বুদ্ধের জীবিতকালেই মগধ হইতে বৌদ্ধধর্মের ঢেউ আসিয়া বাঙ্গালাকে প্লাবিত করিয়া দেওয়াটা অসম্ভব বা বিচিত্র কিছুই নয়, কিন্তু তাহার বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ কই?

রাজগৃহ অথবা বৈশালী মহাসভায়ও কোনও বাঙ্গালীর উপস্থিতি দেখিনা। কেবল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত তিব্বতীয় 'পগ্ সাম্ জোন্ জ্যঙ্গ' গ্রন্থে একটা কিম্বদন্তী উল্লিখিত আছে যে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ অর্হৎ যশ ছিলেন বাঙ্গালা দেশের করণ্ডাবারাম নামক এক বিহারের অধিবাসী[৫]। সিংহলী 'মহাবংস' (চতুর্থ অধ্যায়) অনুসারে যশ ছিলেন বৈশালী-মহাসভার নায়ক ও 'কালাশোকে'র সমসাময়িক। অন্য এক উপাখ্যানে এই যশ-ই আবার ধর্মাশোকের দীক্ষাগুরু[৬]। পুনশ্চ, তৃতীয় একটা কাহিনীতে পাই, যশ অশোকের ভ্রাতা বীতাশোককে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। কিন্তু যশ বাঙ্গালী

(৫) Ed. S. C. Das, 1908, Index, pp. xxi and lxxv.
(৬) V. A. Smith, *Asoka*, Second ed., p. 229.

ছিলেন, ইহাও উপাখ্যান-রাজ্যেরই কথা, কোনও প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থে ইহার সমর্থন পাওয়া যায় না।

বাঙ্গালায় অশোকের কোনও অনুশাসন-লিপি আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহার কারণ সম্বন্ধে যিনি যাহাই অনুমান করুন,[৭] পাওয়া যায় নাই ইহাই ঘটনা। পাটলিপুত্র-মহাসভার পর উত্তরে, পশ্চিমে ও দক্ষিণের বিভিন্ন স্থানে প্রচারক প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্তু পূর্বদিকে বাঙ্গালাদেশে কোনও প্রচারক আগমন করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ নাই। তবে 'অশোকাবদানে'[৮] একটি কাহিনী আছে। কাহিনীটায় আছে যে, পুণ্ড্রবর্ধন নগরে বৌদ্ধধর্ম-বিদ্বেষী এক নির্গ্রন্থ উপাসক তাঁহার পদতলে বুদ্ধ নিপতিত আছেন এরূপ এক চিত্র অঙ্কিত করাইলেন। কথাটা সহরময় রাষ্ট্র হইয়া গেল। অবশেষে কথাটা অশোকের কানেও গেল: এ সকল খবর রাজাদের কানে যাইতে কখনই দেরী হয় না। শুনিয়া অশোক এত রুষ্ট হইলেন যে ঐ ব্যক্তিকে যথোপযুক্ত শাস্তি দিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। এই কাহিনীটি 'দিব্যাবদানে'ও[৯] প্রায় এই ভাবেই আছে, কেবল নূতনের মধ্যে এই পাওয়া যায় যে, ঐ নির্গ্রন্থের অপরাধে অশোক পুণ্ড্রবর্ধনের সমস্ত আজীবিকগণের প্রাণসংহার করিতে রাজাজ্ঞা

---

(৭) *Early History of Bengal,* F. J. Monahan, p. 26.

(৮) N. B. L., p. 11; *La Légende de L' Empereur Asoke,* J. Przluski, 1923, p. 84.

(৯) *Divyāvadāna,* Cowell and Neil, 1886, Ch. XXIII, p. 427.

দিলেন, এবং একই দিনে নাকি অষ্টাদশ সহস্র আজীবিক প্রঘাতিত হইল। দোষ করিল এক নিগ্রন্থ বা জৈন, প্রাণ গেল আজীবিকদের, ইহার কারণ বোধ হয় আজীবিক সম্প্রদায়ের ধর্মনীতির সহিত নিগ্রন্থদিগের ধর্মনীতির অনেকটা সৌসাদৃশ্য, যাহার জন্য 'দিব্যাবদানে' এই দুইয়ের পার্থক্য সূচিত হয় নাই। কিন্তু আজীবিকদের এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের বিবরণ সত্যই হোক্, অথবা সদ্ধর্ম গ্রহণের পরে এই হৃদয়হীন রাজারই অন্তরের কিরূপ শুভদ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল তাহা চিত্রিত করিবার জন্যই বৌদ্ধগণ কর্তৃক এই অলীক কাহিনী উদ্ভাবিত হোক্, এই কাহিনীর দ্বারা অশোক-যুগে পুণ্ড্রবর্ধনে বৌদ্ধধর্মের প্রচার অল্পই প্রমাণিত হয়। তবে হুয়েন সাংয়ের ভ্রমণবৃত্তান্তে অশোক কর্তৃক বাঙ্গালার নানাস্থানে স্তূপ নির্মাণের যে সকল উক্তি আছে, তাহা সত্য হইলে বুঝিতে হইবে, অশোকের যুগেই পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট, কর্ণসুবর্ণ এবং তাম্রলিপ্তি, বাঙ্গালাদেশের তৎকালীন এই চারিভাগেই বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। বগুড়া জেলার অন্তর্গত মহাস্থানে মৌর্যযুগের ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত যে প্রাচীন লেখ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে 'পুদনগল' বা পুণ্ড্রনগরের নাম আছে, এবং আচার্য বেণীমাধব বড়ুয়া মহাশয়ের উদ্ধৃত পাঠানুসারে উহাতে 'ছবগৃগিয়' (ষড়বর্গীয়) নামে এক বিদ্রোহী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। এই পাঠ সর্ববাদীসম্মত না হইতে পারে, কিন্তু ঠিক অশোকোত্তর যুগে পুণ্ড্রবর্ধনে বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাবের শিলালিপিগত অকাট্য প্রমাণ বিদ্যমান আছে।

মধ্যভারতে প্রথম-সংখ্যক সাঞ্চী-স্তূপের প্রতোলী বা তোরণ নির্মাণের ব্যয়ভার যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে পুণ্ড্রবর্ধনের একজন মহিলার নামোল্লেখ আছে। লিপিটি এই,—"ধমতায় দানং পুঞ্রবদনিয়ায়"[১০], অর্থাৎ পুণ্ড্রবর্ধনের ধমতা বা ধর্মদত্তার দান। এই ধর্মশীলা রমণী ধর্মদত্তাকে ভিক্ষুণী বলা হয় নাই, সম্ভবতঃ তিনি গৃহী উপাসিকা ছিলেন। পণ্ডিতপ্রবর বূলারের মতে, এই শিলালিপিগুলির তারিখ হয় খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের শেষ, না হয় খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধ। সাঞ্চী-স্তূপের অপর একটি তোরণের ব্যয়-নির্বাহকদের মধ্যে পুণ্ড্রবর্ধনের আর একজনের নাম আছে, তিনি পুরুষ, তাঁহার নাম 'ইসিনদন' (ঋষিনন্দন)।[১১]

অশোকোত্তর-যুগে পুণ্ড্রবর্ধনে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রচার হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ আছে। পালি 'বিনয়পিটকে'র অন্তর্গত মহাবগ্‌গ রচনার সময় বৌদ্ধদের কল্পিত মজ্ঝিম-দেশের বা মধ্যদেশের পূর্ব সীমা ছিল কজঙ্গল বা রাজমহলের নিকট কাঁকজোল। কিন্তু খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় অথবা প্রথম শতকে যখন 'দিব্যাবদান' রচিত হইল তখন, যাহার পূর্বে পুণ্ডকাখ্য (পুণ্ড্রকাখ্য) পর্বত আছে সেই পুণ্ড্রবর্ধন নগর মজ্ঝিম দেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার পর হইতে প্রত্যন্ত দেশ আরম্ভ[১২]। পুণ্ড্রবর্ধন কখনই বৌদ্ধদের

(১০) *Ep. Ind.*, II, p. 108, No. 102.
(১১) *Ibid*, p. 380, No. 217.
(১২) *Divyāvadāna*, I, p. 21.

দৃষ্টিতে মজ্ঝিম বা মধ্যদেশীয় পবিত্রতা লাভ করিতে পারিত না, যদি না 'দিব্যাবদান' রচনার পূর্বেই সেস্থান বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হ ়ত।

তিব্বতীয় এক জনশ্রুতি অনুসারে, নাগার্জুন বঙ্গালদেশে এবং ইক্ষুবর্ধন (পুণ্ড্রবর্ধন) দেশে অনেকগুলি বিহার তৈয়ার করিয়াছিলেন[১৩]। ইহা কতদূর সত্য বা মিথ্যা তাহা বলা যায়না, কিন্তু জনশ্রুতির কথা যাক্, প্রাক্-গুপ্তযুগে বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্মের আর এক ঐতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া যায়, খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকে উৎকীর্ণ নাগার্জুনীকোণ্ডার একটি শিলালেখে[১৪]। উহার আলোচ্য অংশের অর্থ খুব পরিষ্কার না হইলেও ইহা স্থির যে, ঐ সময়ে শিলালিপিতে উল্লিখিত অপরাপর দেশের সহিত 'বঙ্গ'ও স্থবিরবাদী ভিক্ষুসঙ্ঘের অন্যতম কেন্দ্র ছিল। কিন্তু এই 'বঙ্গ' শব্দ এই সময়ে বাঙ্গালাদেশের কোন্ অংশবিশেষকে সূচিত করিতেছে, তাহা নির্ধারণ করা দুরূহ।

সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় প্রথম শতকে রচিত 'মিলিন্দপঞ্হ' নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে এক স্থানে 'বঙ্গে'র উল্লেখ আছে[১৫], কিন্তু তাহা বৌদ্ধ ধর্মের কেন্দ্র হিসাবে নয়, সামুদ্রিক বাণিজ্যের একটি বন্দর হিসাবে। সেইরূপ খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে রচিত মহাযান সম্প্রদায়ের

১৩) *J. A. S. B.*, 1882, Part I, p. 119.

(১৪) *Ep. Ind.* XX, p. 22; also cf. *Ind. Hist. Quart.*, VII, p. 652; *Ind. Cult.*, I. pp. 109—11.

(১৫) S. B. E., XXXVI, II, p. 269.

'ললিতবিস্তরে',[১৬] এবং ৩০০ খৃষ্টাব্দ বা তাহার পরে রচিত লোকোত্তরবাদীদের বিনয় 'মহাবস্তু'তে[১৭] নানা দেশের লিপির মধ্যে 'বঙ্গলিপি'র উল্লেখ আছে। এই সকল উল্লেখ দ্বারা শুধু এইটুকুই প্রমাণ হয় যে, এই সকল পুস্তক রচনার সময়ে বাঙ্গালাদেশ বৌদ্ধদের স্মরণপথের বহির্ভূত থাকিত না।

বৌদ্ধদের প্রাচীন ষোড়শ মহাস্থবিরের মধ্যে একজন বাঙ্গালীও ছিলেন। তাঁহার নাম কালিক, তিনি তাম্রলিপ্তির অধিবাসী[১৮]। "যদিও সহস্র সহস্র স্থবির প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন তথাপি বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে অপর কোনও স্থবিরই উল্লিখিত ষোড়শ স্থবিরের ন্যায় প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। ভারতীয় বৌদ্ধ বিহারে প্রতিদিন উক্ত ষোড়শ স্থবিরের পূজা হইত। মহাযান সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে স্থবির পূজার প্রথম সূত্রপাত হয়। তদনন্তর ভারতীয় শ্রমণগণ খোটান-দেশে এই প্রথার প্রবর্তন করেন। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে খোটান-দেশ হইতে এই প্রথা চীনদেশে নীত হয়। চীন হইতে ইহা ঐ সময়ে তিব্বতে প্রবর্তিত হয়" [১৯]। এই ষোলজন স্থবির বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের

(১৬) Ed. R. L. Mitra, Ch. X, p. 143.

(... E. Senart, 1882, p. 137.

(১৮) *Mem. As. Soc. of Bengal.*, Vol. I, No. I, p. 2.

(১৯) সাহিত্য, ১৩১২, পৃঃ ২৯, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

চরিত্রের উৎকর্ষতা ও পরোপকারিতায় মুগ্ধ হইয়া পরবর্তী বৌদ্ধগণ এই ষোলটি নাম এক সূত্রে গ্রথিত করিয়াছিলেন। কিন্তু কালিকের তারিখ কত তাহা জানা যায় না, এমন কি খৃষ্টীয় অব্দের পূর্বে কি পরে তাহারও স্থির নাই।

গুপ্ত এবং গুপ্তোত্তর যুগ

গুপ্তযুগকে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের স্বর্ণযুগ আখ্যা দিলে ভুলও হয়না, অতিরঞ্জিতও কিছু করা হয় না। প্রাচীন ভারতীয় মনীষার এই চরমোৎকর্ষতার ও ব্যাপক অভিব্যক্তির যুগে ব্যবহারিক, সাংস্কৃতিক ও পারমার্থিক জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে যে সোনার শতদল ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহার বর্ণচ্ছটা ও সুষমা যুগান্তেই নিঃশেষে মুছিয়া যায় নাই, উত্তরকালের ভারতীয়ের চিন্তা, কর্ম ও বাক্যকে উহা কত উজ্জ্বল ও অভিসিঞ্চিত করিয়াছে, ইতিহাস তাহার সাক্ষী। মৌর্য সাম্রাজ্য অপেক্ষা গুপ্ত-সাম্রাজ্য আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও, গুপ্ত-সম্রাট-গণের দোর্দণ্ড প্রতাপের অভাব ছিল না। রাজা হিসাবে তাঁহারা যেমন প্রতাপশালী ছিলেন, মানুষ হিসাবে তাঁহারা তেমনই প্রতিভা-সম্পন্ন ছিলেন। অধিকন্তু, তাঁহারা প্রতিভার সমাদর করিতে জানিতেন এবং করিতে উন্মুখও ছিলেন। রাজার ব্যবহারকে যথা-সাধ্য অনুকরণ ও অনুসরণ করিতে সামন্তবর্গের, পার্ষদগণের, কুলপুত্র-গণের এবং অধস্তনস্তরের বিত্তশালী জনগণের লিপ্সু হওয়াটা সেকালের ছিল যুগধর্ম বা ফ্যাসান্। কাজেই রাজা যখন প্রতিভান্বিত জ্ঞানীকে ও গুণীকে সমাদর করিতে লাগিলেন এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উৎসাহ ও আনুকূল্য দানে পোষণ করিতে লাগিলেন, রাজার একভক্ত অনুজীবিগণ ও উচ্চসমাজবিহারিগণও তাহাই

করিতে শিখিলেন। ফলে, গুপ্ত-যুগে ভারতবর্ষে এক বিপুল সাহিত্য এবং অনুপম শিল্পের সৃষ্টি হইল। কিন্তু একমুখী সে সাহিত্যও নয়, সেই শিল্পও নয়। ধর্ম, দর্শন, স্মৃতি, পুরাণ, কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, গণিত প্রভৃতি বিভিন্ন ধারায় প্রবহমান সেই সাহিত্য, তেমনই স্থাপত্য, রূপক, চিত্র প্রভৃতি নানা দিকে গতি সেই শিল্পের। কিন্তু দেশে একটা বিরাট সাহিত্য বা প্রচুর দেব-দেউল অথবা বহু-সংখ্যক মূর্তির রচনা বা প্রতিষ্ঠা বড় কথা নয়, বড় কথা সাহিত্যের বিষয়ীভূত সম্পদ ও মৌলিকতা এবং শিল্পের বাহ্য সৌষ্ঠব ও অন্তর্নিহিত শ্রী। এই দিক দিয়া গুপ্ত সাহিত্য ও শিল্প অপরাজেয় ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আবার, পরমভট্টারক গুপ্ত-সম্রাটগণ ছিলেন ধর্মে বৈষ্ণব, পরমভাগবত। সুতরাং রাজার ধর্ম দেখিয়া প্রজারাও অনেকে সেই ধর্মের প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠিলেন, দেশে বৈষ্ণব ধর্মের যেন জয় জয়কার পড়িয়া গেল। ধর্মে গুপ্ত-নরপতিগণের প্রবল নিষ্ঠাও ছিল, ধর্মবিশ্বাসও তাঁহাদের গভীরই ছিল। কিন্তু ছিলনা তাঁহাদের মোটেই ধর্মান্ধতা। এবং তাহা ছিলনা বলিয়াই গুপ্তদের সমসময়ে বৈষ্ণব ধর্মের পাশাপাশি শৈব, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্মমতগুলি নিরাপদে ও অকুতোভয়ে গতিশীল ও ক্রিয়াশীল থাকিতে সমর্থ হইয়াছিল। অবশ্য ধর্মে উদারতা প্রাচীন ভারতে গুপ্তগণেরই সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত ছিল, এমন কথা নয়, —প্রাক্-মুসলমান যুগে ভারতীয় প্রায় সমস্ত প্রদেশের ইতিহাসেই ইহার ন্যূনাধিক পরিচয় পাওয়া যায়। এমন কি, অশোক বৌদ্ধ হইবার পরেও 'দেবানাং

প্রিয়' বলিয়াই পরিচয় দিতেন ; আজীবিকদিগের জন্য গুহা নির্মাণ করিতেও তাঁহার বিবেকে বাধে নাই। গুপ্ত-যুগে প্রাচীন ভাগবতধর্ম্ম যেমন নব নব বৈশিষ্ট্যাঙ্কিত হইয়া বৈষ্ণব ধর্মে পরিণত হইল, সম্ভবতঃ তেমনই গুপ্তযুগের মুক্ত, উদার ও স্বচ্ছন্দ আবহাওয়ার মধ্যেই ব্রহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধনের বা সন্ধির চেষ্টা হইয়াছিল, যাহার ফলে হিন্দুগণ বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। একটু ধীর চিত্তে প্রণিধান করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, এই সন্ধি গুপ্ত-পরযুগের প্রতিকূল বাত্যায় সম্ভব্য নয়।

এই গুপ্তযুগেই দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে চৈনিক পর্যটক ফা-হিয়েন (৩৯৯-৪১৪ খৃঃ) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এবং আর্যাবর্তের বহু বৌদ্ধ তীর্থ পরিভ্রমণ এবং বহু বৌদ্ধ বিহার পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালাদেশেও আসিয়াছিলেন এবং তাম্রলিপ্তি বন্দরে দুই বৎসর অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় তাম্রলিপ্তিতে দ্বাবিংশটি বৌদ্ধ সজ্ঘারাম ছিল, এবং ইহাদের প্রত্যেকটিই ভিক্ষুগণ কর্তৃক অধ্যুষিত ছিল। তাহা হইলে, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙ্গালার একটি নগরেই শ্রমণ-সংখ্যা বড় কম ছিল না। তিনি বাঙ্গালার অন্যান্য স্থানে কেন যান নাই, জানিনা,—তবে তিনি প্রয়াগেও যান নাই, সারনাথেও যান নাই, এরূপ অনেক বৌদ্ধ তীর্থেই যান নাই। গঙ্গা পার হইয়া বাঙ্গালার অন্যান্য অঞ্চলে এই ধীমান পরিব্রাজকটি

গেলে, বাঙ্গালাদেশে তৎকালীন বৌদ্ধধর্মের বিস্তারের একটা প্রামাণিক বিবরণ পাওয়া যাইত।

ফা-হিয়েনের পূর্বেও সম্ভবতঃ বাঙ্গালাদেশে চীনা শ্রমণগণের গতিবিধি ছিল। তাঁহাদের নিমিত্ত শ্রীগুপ্ত নামে জনৈক মহারাজ 'মৃগস্থাপন স্তূপে'র নিকট 'চীন মন্দির' নামে একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া তাহার সংরক্ষণের জন্য চব্বিশটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন, এ তথ্য ই-ৎসিংয়ের বিবরণী হইতে জানা যায়। এই 'মৃগস্থাপন স্তূপ' ছিল বরেন্দ্রের বা উত্তরবঙ্গের কোনও স্থানে (বা তাহার সন্নিকটে কোথাও)[১]। আর এই মহারাজ শ্রীগুপ্ত যদি গুপ্ত-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীগুপ্ত বা গুপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ফা-হিয়েনের শতবর্ষ পূর্বেও চীনের ধর্ম-পিপাসু শ্রমণগণ উত্তরবঙ্গে আসিয়া অবস্থান ও ধর্মচর্চা করিতেন। বাঙ্গালার বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে এ তথ্যটি মূল্যবান।

বাঙ্গালার গুপ্ত-যুগের বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসের উপকরণ পাওয়া যায় আবার দুই তিনটি বৌদ্ধ বা মহাযানীয় মূর্তিতে। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম মূর্তি পাওয়া গিয়াছে রাজসাহী জেলার বিহারৈল গ্রামে[২]। এক্ষণে উহা রাজসাহীর বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির চিত্রশালায় রক্ষিত। পঞ্চম শতাব্দীতে নির্মিত এই মূর্তিটি দণ্ডায়মান বুদ্ধের, কিন্তু দুঃখের কথা, মূর্তিটি অক্ষত অবস্থায়

(১) *History of Bengal*, Vol. I, published by the Dacca University, (এখন হইতে *H B D U*), pp. 69—70.

(২) *Early Sculpture of Bengal*, S. K. Saraswati, p. 20, fig. 4.

প্রাপ্ত নয়। দুই পদের নিম্নভাগ, দক্ষিণ হস্তের পুরোভাগ ও বামহস্তের তালু, এবং প্রভামণ্ডলীর অনেকাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে,—নাক এবং ঠোঁটেরও কিয়দংশ ভগ্ন। তথাপি মূর্তিটি অতি মনোহর। নাসিকাগ্রে অর্ধ-নিমীলিত নয়নের নিবদ্ধ দৃষ্টি, সমগ্র মুখমণ্ডলে নিহিত স্থির, শান্ত ও সমাহিত ধ্যানযোগীর অলৌকিক সত্ত্বভাব, উহার অঙ্গসৌষ্ঠবতা এবং প্রতনু কোমলতার প্রাচুর্যে স্নাত অবয়বসমূহ,—এ সমস্তই শিল্পীর শিল্পসাধনার চূড়ান্ত সার্থকতার পরিচয় দেয়। মূর্তিটি চুনারের বালুপ্রস্তরে নির্মিত, এবং সমসাময়িক সারনাথ শিল্পরীতির বুদ্ধমূর্তির সহিত ইহার সাদৃশ্য এত নিবিড় যে, মূর্তিটি সারনাথ অঞ্চল হইতেই আনীত বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে।

বগুড়া-মহাস্থানে 'বলাইধাপ' স্তূপের নিকট বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রীর ব্রঞ্জধাতু নির্মিত একটি মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মূর্তিটি উচ্চতায় দুই ফিট নয় ইঞ্চি, ও প্রস্থে নয় ইঞ্চি। এ মূর্তিটিও অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায় নাই, উহার ডান হাতের নীচের অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মূর্তিটির সর্বাঙ্গ পাতলা সোনার পাতে মোড়া, এবং বহু প্রাচীন বলিয়া স্থানে স্থানে পাত উঠিয়া গিয়াছে। গঠনরীতি ও বস্ত্রাদি পরাইবার ভঙ্গী দেখিয়া মূর্তিটি গুপ্ত-যুগের মূর্তি বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। গঠনসৌষ্ঠব দেখিয়া মনে হয় মূর্তিটি নূতন অবস্থায় যথেষ্ট শ্রীমণ্ডিত ছিল। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে শ্যামদেশেই নাকি শিল্পীরা সর্ব্বপ্রথম সোনার পাতে মোড়া মূর্তি প্রস্তুত করেন বলিয়া পূর্বে সকলের ধারণা ছিল। মহাস্থানে গুপ্ত-যুগের স্বর্ণমণ্ডিত



রাজসাহী বিহারৈলের বুদ্ধ
শ্রীযুক্ত সরসীকুমার সরস্বতীর সৌজন্যে

ব্রঞ্জমূর্তি আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রমাণিত হইতেছে যে, এ বিষয়ে খমের শিল্পীরা ভারতীয় শিল্পীর নিকট ঋণী।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগে, ৫০৬-৭ খৃষ্টাব্দে, উৎকীর্ণ-মহারাজ বৈন্যগুপ্তের ভূমিদান-বিষয়ক একখানি তাম্রশাসন ত্রিপুরা জেলার গুণাইঘর গ্রামে পাওয়া গিয়াছে। 'দ্বাদশাদিত্য' ছিল তাঁহার বিরুদ, এবং এই বৈন্যগুপ্ত যে মগধের গুপ্ত সম্রাটগণের বংশোদ্ভব তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই[৩]। তাম্রশাসনীকৃত ভূমিখণ্ড যে স্থানে অবস্থিত ছিল তাহার নাম উত্তরমণ্ডল এবং উহা প্রদত্ত হইয়াছিল—মহারাজ রুদ্রদত্ত নামক বৈন্যগুপ্তেরই এক সামন্তের উপরোধে—তিনটি উদ্দেশ্যে,—(১) মহাযান-পন্থী ভিক্ষু শান্তিদেবের জন্য রুদ্রদত্ত আর্য-অবলোকিতেশ্বরের নামে উৎসর্গীকৃত যে 'আশ্রম বিহার' নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন তাহার সংরক্ষণের জন্য, (২) শান্তিদেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'বৈবর্তিক' (অথবা 'অবৈবর্তিক'[৪]) নামে মহাযানী ভিক্ষুসঙ্ঘ কর্তৃক ঐ বিহারে স্থাপিত বুদ্ধমূর্তির দৈনন্দিন বারত্রয় গন্ধ, পুষ্প, ধূপাদি সহ পূজার জন্য, ও (৩) ঐ বিহারের অধিবাসী উক্ত ভিক্ষুসঙ্ঘের অশন, বসন, শয্যাসন ও ভেষজের জন্য। এই তাম্রলিপিতে নিকটবর্তী কোনও স্থানে 'রাজ-বিহার' নামে অপর একটি বিহারের উল্লেখ আছে, উহা রুদ্রদত্ত কর্তৃক নির্মিত 'আশ্রম-বিহারে'র পূর্বেই তথায় প্রতিষ্ঠিত

---

(৩) *Ind. Cult.*, VI, pp. 40 ff.

(৪) *Ind. Hist. Quart*, VI, p. 572.

হইয়াছিল। 'রাজ-বিহার' অবশ্যই ঐ অঞ্চলের কোনও রাজা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু রাজাটি কে তাহা অনুমান করা যায় না। অন্যান্য পূর্ববর্তী গুপ্ত-সম্রাটগণ ছিলেন বৈষ্ণব, কিন্তু দ্বাদশাদিত্য মহারাজ বৈন্যগুপ্ত ছিলেন 'মহাদেবপাদানুধ্যাত', অর্থাৎ তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন শৈবধর্ম। আবার এই শৈব রাজা দান করিলেন ভূমি বৌদ্ধ বিহারের জন্য। এই ধর্ম বিশ্বাসের স্বাধীনতা ও পরমতসহিষ্ণুতার দৃষ্টান্ত বাঙ্গালাদেশের ইতিহাসে ভূরি ভূরি মিলে। বৈন্যগুপ্ত নিজেই 'রাজ-বিহার'টি নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন কিনা কে জানে? এই তাম্রশাসনে উল্লিখিত শান্তিদেব কিন্তু সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত 'বোধিচর্যাবতার' ও 'শিক্ষাসমুচ্চয়' প্রণেতা শান্তিদেব নহেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ সঙ্ঘের উল্লেখ আর কোথাও পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ ঐ সম্প্রদায় দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের একটি স্থানীয় সম্প্রদায় ছিল, এবং উহার মতবাদ ও প্রভাব বেশী দূর প্রসারলাভ করিতে এবং বেশীকাল স্থায়ী হইতে পারে নাই। হুয়েন সাং ৬৩৯খৃষ্টাব্দে সমতটে আসিয়া এই সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব দেখিতে পান নাই। কিন্তু ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভেই দক্ষিণ-পূর্ব বাঙ্গালায় যে মহাযান-মত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, তাহা গুণাইঘর তাম্রশাসন নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিতেছে।

গুপ্তযুগে বাঙ্গালার বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের আর বিশেষ কিছু উপাদান পাওয়া যায় না। এই যুগে বাঙ্গালাদেশে বৈষ্ণব, শৈব, বৌদ্ধ ও জৈন, এই চারি মতেরই প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। ষষ্ঠ

শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্তও গুপ্তসাম্রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল, এবং তখন পর্যন্তও পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তি গুপ্তসাম্রাজ্যেরই অঙ্গীভূত। গুপ্তসাম্রাজ্য ধ্বংসের কিছুকাল পর খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে আর্যাবর্তে এক প্রখ্যাত অধীশ্বরের আবির্ভাব হইল, তিনি পুষ্পভূতি-বংশীয় হর্ষবর্ধন। হর্ষ সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিদ্যমান থাকিলেও, অন্ততঃ বৌদ্ধধর্মের দিক দিয়া গোটা সপ্তম শতাব্দীকে 'হর্ষযুগ' আখ্যা দিলে ভুল হয় না। যতদিন হর্ষের অজেয় প্রতিদ্বন্দী গৌড়াধিপ শশাঙ্ক জীবিত ছিলেন, ততদিন ত নয়ই, শশাঙ্কের মৃত্যুর পরেও হর্ষ বাঙ্গালার কোনও অংশের প্রভুত্ব লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন কিনা, ঘোর সন্দেহ। তবু সপ্তম শতাব্দীতে বাঙ্গালার বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস বিবৃত করিতে গেলে 'হর্ষযুগ' শব্দ ব্যবহারই বিধেয়। এই যুগে হুয়েন সাং, তাও লিন্, সেঙ্ চি, ই-ৎসিং প্রভৃতি চীনা পরিব্রাজকগণ বা পর্যটকগণ বাঙ্গালার বৌদ্ধধর্মের প্রামাণিক বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। এই যুগেই শীলভদ্র, চন্দ্রগোমী প্রভৃতি স্বনামখ্যাত বাঙ্গালী বৌদ্ধাচার্যগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই যুগে অথবা তাহার অবসানে মহাযান তাহার যাত্রাপথের প্রায় উপান্তে আসিয়া বাঙ্গালাদেশে ত্রিধারায় বিভক্ত হইয়া প্রবাহিত হইল।

হুয়েন সাং মগধ হইতে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন ৬৩৮ খৃষ্টাব্দের পর, সম্ভবতঃ ৬৩৯ খৃষ্টাব্দে। সেই সময় পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট, কর্ণসুবর্ণ ও তাম্রলিপ্তি, বাঙ্গালার এই চারিভাগে তিনি সর্বসমেত ৭০টিরও

অধিক বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম দেখিয়াছিলেন। এই সকল সঙ্ঘারামে তখন হাজার আষ্টেক ভিক্ষু অবস্থান করিতেন; এতন্মধ্যে সমতটে ২,০০০ স্থবিরবাদী, এবং কর্ণসুবর্ণে ২,০০০ সম্মিতীয় ভিক্ষু ছিলেন। অপর সকল বৌদ্ধ সম্প্রদায়ই আত্মবাদ পরিহার করিয়াছিলেন, কিন্তু এই সম্মিতীয় শাখা পুদ্গলবাদ স্বীকার করিতেন। তাম্রলিপ্তিতে ১,০০০ শ্রমণ থাকিতেন, কিন্তু তাঁহারা কোন্ শাখাভুক্ত হুয়েন সাং তাহা বলেন নাই। তবে ইহার কিছু পরে ই-ৎসিংয়ের সময় তাম্রলিপ্তিতে সর্বাস্তিবাদ প্রবল ছিল দেখিয়া অনুমিত হয়, হুয়েন সাংয়ের সময়েও এই এক সহস্র শ্রমণ, বা তাঁহাদের অধিকাংশই, সর্বাস্তিবাদী ছিলেন। আর পুণ্ড্রবর্ধনে যে বাকী ৩,০০০ ভিক্ষু ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে 'পো চি পো' বিহারে ৭০০ মহাযানী শ্রমণ ছিলেন, এবং অবশিষ্টগণ হীনযান ও মহাযান এই উভয় মতাবলম্বী ছিলেন। তাহা হইলে মোটামুটি হিসাবে বলা যায়, হুয়েন সাংয়ের সময় বাঙ্গালাদেশের বিহারগুলিতে যত শ্রমণ বাস করিতেন, তাহার মধ্যে তিন-চতুর্থাংশই হীনযান-পন্থী এবং এক-চতুর্থাংশ মহাযান-মতাবলম্বী। তাঁহার সময় সারা ভারতবর্ষে ন্যূনাধিক দুই লক্ষ বার হাজার ভিক্ষু বিভিন্ন বিহারে বাস করিতেন, তন্মধ্যে প্রায় এক লক্ষ আট হাজারই হীনযান সম্প্রদায়ভুক্ত, পঞ্চাশ হাজারের কাছাকাছি মহাযান সম্প্রদায়ের, ছিচল্লিশ হাজারের কিছু বেশী হীনযান ও মহাযান উভয় মতাবলম্বী, এবং নয় হাজার তিন শত ভিক্ষুর কোনও শাখার উল্লেখ নাই। মহাযান-পন্থীদের মধ্যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের

উদ্যান প্রদেশেই ১৮,০০০ এবং তৎসন্নিহিত কপিশায় ৬,০০০, মগধে ১০,০০০ এবং দক্ষিণ-কোশলেও (মধ্যপ্রদেশের রায়পুর, সম্বলপুর, বিলাসপুর প্রভৃতি অঞ্চলে) ১০,০০০ ভিক্ষু ছিলেন। দক্ষিণ-কোশলের পূর্বদিকে উড়িষ্যায়ও 'অসংখ্য' মহাযান-পন্থী ছিলেন। গান্ধার ও কপিশা বাদ দিলে, সারা ভারতের বিহার গুলিতে হুয়েন সাং মোটে হাজার পঁচিশেক মহাযান-পন্থী ভিক্ষু দেখিয়াছিলেন। কনৌজে যে ১০,০০০ ভিক্ষু ছিলেন, তাঁহারা উভয় যানাবলম্বী।

হুয়েন সাং কর্ণসুবর্ণে এমন তিনটি সঙ্ঘারাম দেখিয়াছিলেন যেখানে দেবদত্তের সম্প্রদায়ভুক্ত ভিক্ষুগণ বাস করিতেন। দেবদত্ত ছিলেন গৌতম বুদ্ধের মাতুল-পুত্র অথবা অন্য কোনও নিকট আত্মীয়, বৌদ্ধধর্মে তিনি দীক্ষিতও হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার কিছুকাল পর হইতেই তিনি বুদ্ধের সহিত প্রতিদ্বন্দিতা আরম্ভ করেন, এবং পাঁচশত শিষ্য সংগ্রহ করিয়া এক স্বতন্ত্র সঙ্ঘ স্থাপন করিয়া বুদ্ধের পদারূঢ় হইবার চেষ্টা করেন। মগধ-রাজ অজাতশত্রুকে নিজের পক্ষ-সমর্থক পাইয়া তিনি বুদ্ধের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন, কিন্তু বুদ্ধকে হত্যা করিবার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যায়। পরে দেবদত্ত বৌদ্ধ সঙ্ঘে ভেদ ঘটাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহাতেও কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। দেবদত্ত-সম্প্রদায়ভুক্ত ভিক্ষুরা গৌতম বুদ্ধের পূর্ববর্তী তিন জন বুদ্ধের পূজা করিতেন, কিন্তু শাক্যমুনি বুদ্ধের বিরোধী ছিলেন। সেইজন্য বৌদ্ধসমাজে ইঁহারা ধিক্কৃত। দেবদত্ত

তাঁহার শিষ্যদিগকে লোকালয়ের বহু দূরে অবস্থান করিয়া ভিক্ষান্নে প্রাণধারণ করিতে, জীর্ণ চীবরকে অনাদর না করিতে, এবং নিজেকে কৃচ্ছ সাধনে নিগ্রহ করিতে ও অপরকে ক্লেশ না দিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। এই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ দুগ্ধজাত সামগ্রী আহার্যরূপে গ্রহণ করিতেন না, এবং এইরূপ আরও কঠোর কতকগুলি নিয়ম-পালন অভ্যাস করিতেন। ৪০৫ খৃষ্টাব্দে ফা-হিয়েন শ্রাবস্তীতে দেবদত্ত-সম্প্রদায়ের ভিক্ষুগণ দেখিতে পাইয়াছিলেন। কর্ণসুবর্ণে তিনি আসেন নাই, কিন্তু হুয়েন সাং সেখানে গিয়া উঁহাদের তিনটি মঠ দেখিয়াছিলেন। তবে তখন ইঁহারা কার্যতঃ বুদ্ধযানী-ই হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং কথিত হইয়াছে যে, এই সকল ভিক্ষুগণ মহাযান-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।

হুয়েন সাং বাঙ্গালায় পদার্পণ করিবার কয়েক বৎসর পূর্বেই মহারাজাধিরাজ গৌড়েশ্বর শশাঙ্কের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার বিবরণীতে শশাঙ্ক কেবল নিদারুণ বৌদ্ধ-বিদ্বেষী নয়, বৌদ্ধ-হন্তা বলিয়াও কলঙ্কী। বৌদ্ধতীর্থ কুসিনারার এক বিহার হইতে শশাঙ্ক সমস্ত ভিক্ষুদিগকে বিতাড়িত করিয়া বৌদ্ধধর্ম উচ্ছেদের চেষ্টা করিয়াছেন, গয়ার বোধিদ্রুমটি কর্তিত করিয়া তাহার মূলোচ্ছেদ পর্যন্ত করিবার জন্য চেষ্টিত ছিলেন এবং বুদ্ধের বিগ্রহ অপসারিত করিয়া সেখানে শিবমূর্তি স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহার জন্যই নাকি সদ্ধর্ম একেবারে প্রধ্বস্ত হইতে বসিয়াছিল, এইরূপ কত কথা, কত অত্যাচারের কাহিনী, হুয়েন সাং লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। হর্ষবর্ধন শশাঙ্কের তত অনিষ্ট সাধন করিতে পারেন নাই, যত করিয়াছেন

হুয়েন সাং। এ সকল অধিক্ষেপ যে সর্বথা বিশ্বসনীয় নয়, পরলোকগত আচার্য রিস্ ডেভিড্স্-ই বোধ করি তাহা সর্বপ্রথম প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন[৫], তারপর আরও কেহ কেহ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, শশাঙ্ক যে বৌদ্ধধর্মের একটি দুরন্ত রাহু ছিলেন, তাহাতে জাপানী পণ্ডিত য়ামাকামী সোগেনের কিছুমাত্র সংশয় ছিল না। পরন্তু তিনি[৬] মাধবাচার্যের 'সর্বদর্শন-সংগ্রহে'র বর্ণনায় কুমারিল ভট্টের প্ররোচনায় উজ্জয়িনীর জনৈক রাজা সুধন্বা তাঁহার রাজভৃত্যগণকে যে আদেশ দিয়াছিলেন,—

আসেতোরাতুষারাদ্রে বৌদ্ধানাং বৃদ্ধবালকান্।
যো ন হন্তি সে হন্তব্যো ভৃত্যানিত্যন্বশান্নৃপঃ॥

অর্থাৎ, রামেশ্বর সেতুবন্ধ হইতে হিমালয় পর্যন্ত, বৃদ্ধ হোক্, বালক হোক্, বৌদ্ধ দেখিলেই সংহার করিতে হইবে, এবং ইহা যে না করিবে তাহাকেই হত্যা করা হইবে,—এই আদেশটি কাহার আদেশ এবং কোথায় উল্লিখিত আছে,—এ সব না জানিয়াই ভ্রমবশতঃ উহা শশাঙ্কের মুখে বসাইয়া দিয়া হুয়েন সাংয়ের উক্তিগুলি সমর্থন করিতে যত্নবান হইয়াছেন। এবং দেখিয়াছি, শশাঙ্কের কথাপ্রসঙ্গে কোনও কোনও বাঙ্গালী লেখকও শ্লোকটি নিঃসঙ্কোচে পুনরুদ্ধৃত করিয়া বসিয়াছেন। বাস্তবপক্ষে, শশাঙ্কের বৌদ্ধ হত্যা-

(৫) *Journal of the Pali Text Society*, 1896, pp. 87—92 and 107—111.
(৬) *Systems of Buddhistic Thought*, Cal. Uni., p. 16.

কাণ্ডের কথা অবশ্যই পক্ষপোষক হুয়েন সাংয়ের অভিসন্ধিমূলক অতিরঞ্জন, নচেৎ শশাঙ্কের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তিনি নিজেই শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণে অতগুলি বৌদ্ধভিক্ষু ও বৌদ্ধবিহার দেখিলেন কিরূপে? কিন্তু শশাঙ্ক আবার একেবারেই বৌদ্ধদ্বেষ্টা না হইলেই বা হুয়েন সাংয়ের মত একজন বিবুধের স্থিতপ্রজ্ঞমন, শুধু হর্ষবর্ধনের খাতিরে, বানাইয়া বানাইয়া এতগুলি নিছক মিথ্যা কথার অবতারণা করিতে যাইবে কেন?

পরমশৈব শশাঙ্ক যখন গৌড় ও কর্ণসুবর্ণের রাজা, সমতটেও তখন ছিল এক ব্রহ্মণ্যধর্মাবলম্বী রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত। এই বংশেই জন্মিয়াছিলেন বাঙ্গালার অন্যতম গৌরব শীলভদ্র। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পূর্বে তিনি হেতুবিদ্যা, শব্দবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, অথর্ববেদ, সাংখ্য প্রভৃতি শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যলাভ করিয়াছিলেন, এবং সারা ভারত ভ্রমণ করিয়া যখন তিনি বৌদ্ধ-দর্শনেও প্রভূত জ্ঞান অর্জন করিলেন, তখনও তাঁহার যৌবন। অতঃপর মগধের নালন্দা-মহাবিহারে আসিয়া তিনি নালন্দার সর্বাধ্যক্ষ কাঞ্চীর ধর্মপালের নিকট ধর্মোপদেশ গ্রহণ করিলেন, এবং তাঁহাকে অনতি-সাধারণ গুণোপেত দেখিয়া ধর্মপাল তাঁহাকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করিলেন। শীলভদ্র তখন বৌদ্ধশাস্ত্রের সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলিতে আরও পারদর্শিতা লাভ করিলেন, এবং তাঁহার জ্ঞানের খ্যাতি দেশ-দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িল। দক্ষিণ-ভারতীয় বিদ্যাভিমানী এক ব্রাহ্মণ মগধে আসিয়া যখন ধর্মপালকে ধর্মসম্বন্ধীয় তর্কযুদ্ধে স্পর্ধিত

আহ্বান করিলেন, ধর্মপাল শীলভদ্রকেই সেই সমাহ্বানের উপযুক্ত উত্তর দিতে নিদেশ করিলেন, এবং অনতিবিলম্বেই শীলভদ্রের হস্তে প্রতিপক্ষ অপজয়ের গ্লানি বহন করিয়া পলায়ন করিলেন। শীলভদ্র এই যে বৌদ্ধমতের সারবত্তা প্রমাণ করিয়া উহার বিজয় ঘোষণা করিলেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম মোটে ত্রিশ বৎসর। ত্রিশ বছরের এক যুবার এই কীর্তি। এবং এই অপূর্ব কীর্তির বার্তা শুনিয়া মগধের রাজা ত যৎপরোনাস্তি উৎফুল্ল হইয়া সেই অরিন্দমকে একটি নগরীর সমস্ত রাজস্বই প্রদান করিতে চাহিলেন। সকল আসক্তির অতীত সন্ন্যাসী শীলভদ্র সবিনয়ে সেই দান প্রত্যাখ্যান করিলেন— ভিক্ষুর আবার ওসব কি? কিন্তু রাজার নির্বন্ধাতিশয্যে অবশেষে সেই উপচ্ছন্দ রক্ষা করিতেই হইল শীলভদ্রকে, এবং মগধের 'গুণমতী-সঙ্ঘারামে'র নিকট একটি সঙ্ঘারাম নির্মাণ করিয়া শীলভদ্র উহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সেই নগরীর রাজস্ব ব্যয়ের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কালক্রমে আচার্য ধর্মপাল নালন্দার অধ্যক্ষপদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে, শীলভদ্রই সেই পদ অলঙ্কৃত করিলেন। নালন্দা তখন গৌরবের গৌরীশৃঙ্গে উন্নীত, নালন্দার সঙ্ঘারামে তখন বিদ্যার্থীর সংখ্যা কখনও দশ সহস্রের নিম্নে অবতরণ করিত না। তাঁহাদের অধ্যয়নের বিষয় ছিল শুধু মহাযান ও অষ্টাদশ শাখার তত্ত্বনিচয় নয়, বেদ, হেতুবিদ্যা, শব্দবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা এবং সাংখ্য-দর্শনও। এই সকল সূত্র ও শাস্ত্রের দুস্তর সমুদ্র পার হইতে একমাত্র শীলভদ্রই সমর্থ হইয়াছিলেন। ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে হুয়েন সাং যখন

নালন্দায় আগমন করিলেন, শীলভদ্রই তখন নালন্দার পুরোধা। বিদেশী পর্যটক শীলভদ্রের নিকট প্রত্যুদ্গমন করিয়া সসম্ভ্রমে নিবেদন করিলেন, "ভদন্ত! চীনদেশ হইতে আমি আসিয়াছি আপনার পদমূলে বসিয়া যোগ-শাস্ত্রের তত্ত্বাবলী শিখিব বলিয়াই—আপনি অনুগৃহীত করুন।" শীলভদ্র পরম সমাদরে হুয়েন সাংকে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার চীনা শিষ্যটি যথাশক্তি অভিনিবেশ সহকারে যোগশাস্ত্রের উপর তাঁহার বক্তৃতামালা শ্রবণ করিলেন। শুনিয়া হুয়েন সাংয়ের দৃঢ় প্রত্যয় হইল, সিংহলী শ্রমণদের মধ্যেও কেহ যোগশাস্ত্রের এত সুন্দর ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যান করিতে পারেন না। ৬৪২ খৃষ্টাব্দের শেষে অথবা পর বৎসরের প্রথম ভাগে কামরূপাধীশ কুমারের (ভাস্করবর্মার) নিকট হইতে শীলভদ্রের নিকট পত্রী আসিল, তাঁহার রাজ্যে চীনা শ্রমণটিকে পাঠাইয়া দিবার অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া। ঐ একই সময়ে আবার হর্ষ-শিলাদিত্যের নিকট হইতেও অনুরূপ অনুরোধ আসিবার সম্ভাবনায় শীলভদ্র কুমারের অনুরোধ পালনে অক্ষমতা জানাইলেন। শুনিয়া কুমার জ্বলিয়া উঠিলেন, এবং শীলভদ্রকে পুনশ্চ লিখিয়া পাঠাইলেন, "যদি আপনি শ্রমণকে ছাড়িয়া না দেন তবে সৈন্য-সামন্ত এবং করিযূথ নিয়া গিয়া আমি ঐ নালন্দা মহাবিহারটিকে ধূলিসাৎ করিয়া দিয়া আসিব।" তাইত! অচিরাৎ শীলভদ্র হুয়েন সাংকে কামরূপে পাঠাইয়া দিলেন। হুয়েন সাংয়ের 'জীবনী'তে একস্থানে পাই, নালন্দা মহাবিহারে এক হাজার শ্রমণ আছেন, যাঁহারা সূত্র ও শাস্ত্রের কুড়িটি সংগ্রহ

ব্যাখ্যা করিতে পারেন; পাঁচশত জন পারেন ত্রিশটি সংগ্রহের ব্যাখ্যা করিতে; আর হুয়েন সাংকে লইয়া মোটে দশ জন আছেন যাঁহারা পঞ্চাশটি সংগ্রহের ব্যাখ্যায় সমর্থ; একা শীলভদ্রই সমগ্র সংগ্রহ-সংখ্যা আয়ত্ত করিয়াছেন এবং তিনিই একা উহা ব্যাখ্যা করিতে পারেন। এই অভ্রভবান্ সঙ্ঘাধিনায়কের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিবশতঃ কেহই তাঁহার নাম ধরিয়া সম্বোধন করিতে অথবা নামোচ্চারণ করিতে সাহস করিতেন না, সকলেই তাঁহাকে 'সদ্ধর্মনিধি' বলিতেন। তাঁহার রচনার মধ্যে তিব্বতীয় 'ত্যেঙ্গুরে'[৭] 'আর্য-ভূমি-ব্যাখ্যান' নামে একখানিমাত্র গ্রন্থের অনুবাদ রক্ষিত আছে, কিন্তু তাঁহার গ্রন্থাবলীর ভিতর সৌত্রান্তিকদের (অভিধর্মের?) বিভাষা-শাস্ত্রও যে অন্তর্ভুক্ত ছিল, একথা হুয়েন সাং স্পষ্ট বলিয়া গিয়াছেন[৮]। শীলভদ্রের মত গুরু পাওয়া পরম সৌভাগ্যের কথা, হুয়েন সাংয়ের সে সৌভাগ্য হইয়াছিল; হুয়েন সাংকেও শিষ্যরূপে পাইয়া শীলভদ্র যথেষ্ট লাভবান হইয়াছেন, নচেৎ অদ্যাপি এক বাঙ্গালীর এতখানি ইতিহাস রক্ষা পাইত কি করিয়া?

শীলভদ্রের নাম অনেকেই জানেন, কিন্তু অনেকেই জানেন না যে, শীলভদ্রের এক ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন, তাঁহার নাম বোধিভদ্র; আর তিনিও সূত্রে ও শাস্ত্রে বিলক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন, এবং তিনিও

(৭) *Catalogue du fonds Tibétain de la Bibliothèque Nationale,* par P. Cordier (এখন হইতে Cordier), III, p. 365.

(৮) *On Yuan Chwang,* Watters, I, p. 355.

নালন্দায়ই বাস করিতেন। হুয়েন সাং যখন প্রথম নালন্দায় যান, তখন এই বোধিভদ্রের আবাসেই তাঁহার বাসস্থান নির্ণীত হইয়াছিল এবং সাত দিন ধরিয়া বোধিভদ্র এই বিদেশী আগন্তুককে পরিচর্যা করিয়া তৃপ্ত ও তুষ্ট করিয়াছিলেন। তখন বোধিভদ্রের বয়স সত্তরের কাছাকাছি। খুল্লতাত মহাশয়ের বয়সটা না জানি তখন কত ছিল!

ইহার পর চন্দ্রগোমীর কথা[৯]।

প্রাচীন বাঙ্গালায় আর যে সমস্ত মনীষী কীর্তিমান পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া মাতৃভূমির মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, যাঁহাদের গৌরব-গাথায় আমরা কৃতার্থম্মন্য হই,—চন্দ্রগোমী তাঁহাদের অন্যতম। কেবল বাঙ্গালা নয়, একদা এই বৌদ্ধ পণ্ডিতের নিষ্কলঙ্ক যশের সৌরভ নাকি সমগ্র জম্বুদ্বীপকে আমোদিত করিত। তিনি ছিলেন একাধারে বৈয়াকরণ, কবি, নাট্যকার, নৈয়ায়িক এবং বৌদ্ধ-তন্ত্রের একজন উপদেষ্টা ও লেখক। তাছাড়া, তিনি জ্যোতিষ, সঙ্গীত, নানা সুকুমার কলা, আয়ুর্বেদ প্রভৃতিতেও ব্যুৎপন্ন ছিলেন। এক জীবনে এতগুলি বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করা বড় খেলা কথা নয়।

তিব্বতীয় জ্ঞানভাণ্ডার 'ত্যেঙ্গুরে' চন্দ্রগোমীর রচিত অনেকগুলি গ্রন্থের অনুবাদ রহিয়াছে। 'আর্যতারাদেবীস্তোত্র-মুক্তিকামালা' নামে যে গ্রন্থখানি তিনি লিখিয়াছিলেন, সে-খানিরও অনুবাদ

(৯) ভারতবর্ষ, ১৩৪০, কার্তিক, পৃঃ ৭৩৮—৭৪২

'ত্যেঙ্গুরে' আছে। ইহাতে দেখা গেল তাঁহার এক নামান্তর ছিল 'অমরচন্দ্র'। কে জানে, হয়ত ইহাই ছিল তাঁহার আদি ও প্রকৃত নাম। বৌদ্ধ ভিক্ষু হইয়াও গৃহস্থাশ্রমে থাকিতেন বলিয়াই বোধ হয় তাঁহার উপাধি ছিল 'গোমিন্'। গোমিন্ উপাধি-ধারা আর একজন বাঙ্গালী বৌদ্ধ নবম শতাব্দীতে রাষ্ট্রকূট-রাজ প্রথম অমোঘবর্ষের রাজত্বকালে মহারাষ্ট্র দেশে গিয়াছিলেন, এ কথা কান্হেরীতে আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপিতে উৎকীর্ণ আছে।

চন্দ্রগোমীর বাড়ী ছিল উত্তরবঙ্গে,—বরেন্দ্রে। ইহা কেবল তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারনাথের 'বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে' এবং 'পগ্ সাম্ জোন্ জ্যঙ্গে' লিখিত আছে তাহা নয়,—'মনোহরকল্প' নামে তিনি নিজে যে লোকনাথ-স্তোত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও স্পষ্টতঃ লেখা আছে। তিনি জন্মিয়াছিলেন এক ক্ষত্রিয় বংশে, কিন্তু পরে বৌদ্ধাচার্য স্থিরমতির নিকট সূত্র ও অভিধর্ম অধ্যয়ন করিয়া নৈয়ায়িক বিদ্যাধরাচার্য অশোক কর্তৃক তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন।

তিনি ছিলেন মহাযানের চতুর্থ ধ্যানী-বোধিসত্ত্ব অবলোকিতে ও তাঁহার শক্তি তারা'র পরম ভক্ত, এবং ইঁহাদের উদ্দেশ্যে কতগুলি স্তবস্তোত্রও তিনি লেখেন। গল্পে আছে, নালন্দার রাজকন্যার সহিত চন্দ্রগোমীর বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে, চন্দ্রগোমী যখন শুনিলেন রাজকুমারীর নামও তারা, তখন তিনি ত্রাসে, আতঙ্কে

শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার ইষ্টদেবীর নাম যে মানবীর, তাহার পাণিগ্রহণ করিতে চন্দ্রগোমীকে কিছুতেই রাজী করান গেলনা। এই প্রত্যাখ্যানে নালন্দাপতির সম্মানে আঘাত লাগায় বরেন্দ্রের রাজা চন্দ্রগোমীর উপর ভীষণ বিরক্ত ও রুষ্ট হইয়া উঠিলেন, এবং তাঁহাকে একটা সিন্দুকের ভিতরে ভরিয়া গঙ্গায় ভাসাইয়া দিলেন। ভাসিতে ভাসিতে সেই সিন্দুক ঠেকিল গিয়া বাখরগঞ্জ জেলার সমুদ্রের কাছে একটা দ্বীপে। বেচারী চন্দ্রগোমী ততক্ষণ সিন্দুকের মধ্যে বসিয়া বসিয়া তারাদেবীর নিকট একান্তচিত্তে উদ্ধারের প্রার্থনা জানাইতেছিলেন। দেবীর কৃপায়, যাহা হোক্, তিনি সিন্দুক হইতে মুক্ত হইলেন, এবং ঐ দ্বীপে উঠিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেখানে তিনি অবলোকিতেশ্বর ও তারার প্রস্তর-মূর্তিও স্থাপন করিলেন। দ্বীপটায় প্রথমতঃ থাকিত কতকগুলি ধীবর, কিন্তু পরে আরও অনেক জাতীয় লোক সেই দ্বীপে আসিয়া বসবাস করিতে লাগিল, এবং ক্রমশঃ উহার সমৃদ্ধি বর্ধিত হইতে লাগিল। কিন্তু চন্দ্রগোমীর বাসহেতু দ্বীপটার নাম হইয়া গেল 'চন্দ্রদ্বীপ'।

একাদশ শতাব্দীতে পূর্ববঙ্গের চন্দ্র-রাজবংশের ইতিহাসে চন্দ্রদ্বীপের নাম পাওয়া গিয়াছে। শ্রীচন্দ্রদেবের পিতা ত্রৈলোক্যচন্দ্র চন্দ্রদ্বীপের নৃপতি ছিলেন। এক একবার মনে হয়, চন্দ্ররাজবংশের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া ঐ স্থানের নাম চন্দ্রদ্বীপ হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য, 'ত্যেঙ্গুরে' 'শান্তিহোম' বলিয়া চন্দ্রগোমীর স্বীয় একখানি পুস্তকের অনুবাদ রহিয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে 'দ্বৈপ' বলিয়া

অভিহিত দেখিতে পাই। কোনও একটা দ্বীপের সহিত তাঁহার পূর্বেতিহাস জড়িত না থাকিলে তাঁহার নিজ গ্রন্থে এই বিশেষণের ব্যবহার থাকিতে পারে না, ইহা বলা বাহুল্য। সম্ভবতঃ উক্ত গল্পের মূলে কিছুটা সত্য ছিল, পরে লোকের মুখে মুখে অতিরঞ্জিত হইয়া উহা উপরোক্ত রূপ ধারণ করিয়াছে।

পরবর্তীকালে, সম্ভবতঃ ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে, হিন্দুরা চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী নামক বিক্রমপুরের জনৈক ব্রাহ্মণকে নায়ক করিয়া, এবং তারার স্থলে ভগবতীকে ইষ্টদেবী করিয়া, চন্দ্রদ্বীপের নামোৎপত্তির কারণরূপে অনুরূপ একটা গল্প রচনা করিয়াছিলেন। যাহা হোক্, চন্দ্রগোমীর গল্পে পাই, চন্দ্রদ্বীপে কিছুকাল বাস করার পর তিনি সেখান হইতে চলিয়া গেলেন সিংহলে, ফিরিবার পথে তিনি দক্ষিণ-ভারতে বররুচির বাড়ীতে পাণিনি-ব্যাকরণের 'পাতঞ্জল ভাষ্য' দেখিতে পাইলেন। পড়িয়া দেখিলেন, উহাতে নাকি শুধুই শব্দাড়ম্বর, সারপদার্থ বিশেষ কিছুই নাই। সুতরাং তিনি নিজে 'পাণিনি'র একখানি ভাষ্য লিখিলেন, তাহার নাম হইল 'চান্দ্র ব্যাকরণ।'

বাস্তবিকই চন্দ্রগোমী তাঁহার ব্যাকরণ দাক্ষিণাত্যে বসিয়া লিখিয়াছিলেন কিনা, তাহা জানিবার উপায় নাই, কিন্তু তাঁহার ব্যাকরণ-খানি যে পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'র ভাষ্য নয়, এ কথা না বলিলেও চলে। তবে তাঁহার ও পাণিনির ব্যাকরণে অনেকস্থলে সাদৃশ্য আছে, তিনি পাণিনির রীতি ও পদ্ধতির অনেকাংশে অনুসরণ করিয়াছেন। আবার উভয়ের মধ্যে অনৈক্যও আছে। পাণিনির

ব্যাকরণ আট অধ্যায়ে বিভক্ত, 'চান্দ্রব্যাকরণ' ছয় অধ্যায়ে। কিন্তু যেমন পাণিনির, তেমনই চন্দ্রের, ব্যাকরণে প্রত্যেক অধ্যায় চারিটি পাদে বিভক্ত। পাণিনির সূত্রসংখ্যা ৪,০০০, চন্দ্রের ৩,১০০। গণনায় স্থির হইয়াছে, চন্দ্রের নিজস্ব মৌলিক সূত্রসংখ্যা ন্যূনাধিক ৩৫। সূত্রপাঠে বৌদ্ধ চন্দ্রগোমী স্বভাবতঃই বৈদিক সূত্রগুলি পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাকরণে সংজ্ঞাগুলিকে পৃথকভাবে আলোচনা করেন নাই বলিয়া তাঁহার ব্যাকরণের এক নামই হইয়া গেল 'অসংজ্ঞক ব্যাকরণ'।

চান্দ্রব্যাকরণের উপরে কালক্রমে অনেক টীকা টিপ্পনী লেখা হইয়াছিল। চান্দ্র-'সূত্রপাঠে'র উপর ধর্মদাস নামে সম্ভবতঃ চন্দ্রেরই এক শিষ্য যে বৃত্তি লিখিয়াছিলেন, তাহাই সমধিক মূল্যবান। প্রায় ৬০০ খৃষ্টাব্দে বামন ও জয়াদিত্য একত্রে যে 'কাশিকাবৃত্তি' লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা 'চান্দ্রব্যাকরণ' হইতে অনেক কিছু লইলেও চন্দ্রের নামোল্লেখ করেন নাই। কিন্তু বামন যে পাণিনীয় 'লিঙ্গানুশাসন' লিখিয়াছিলেন তাহাতে তিনি চান্দ্র-'লিঙ্গানুশাসনে'র ঋণ স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। নবম শতাব্দীতে বৈয়াকরণ শাকটায়ন তাঁহার ব্যাকরণে, এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে হেমচন্দ্র সূরি তাঁহার 'শব্দানুশাসনে' চন্দ্রের ব্যাকরণের নিকট ন্যূনাধিক ঋণী। এই সকল উদাহরণ হইতে বুঝা যায় অন্যান্য বৈয়াকরণদিগের উপর চন্দ্রের ব্যাকরণ কত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ইহা ছাড়া, ৭৮৩ খৃষ্টাব্দে জিনসেন সূরি তাঁহার 'হরিবংশপুরাণে', এবং ১১৪০

খৃষ্টাব্দে বর্ধমান স্থরি তাঁহার 'গণরত্নমহোদধি'তে মঙ্গলাচরণে চন্দ্রের উদ্দেশ্যে নমস্কার জ্ঞাপন করিয়াছেন, এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধে 'মুগ্ধবোধ'-কার বোপদেব তাঁহার 'কবিকল্পদ্রুমে'র প্রারম্ভে যে অষ্ট-মহাশাব্দিকের নাম করিয়াছেন, চন্দ্র তন্মধ্যে অন্যতম।

ব্যাকরণ ব্যতীত চন্দ্রগোমী 'লোকানন্দ' নামে একখানি পঞ্চাঙ্ক নাটক, এবং 'শিষ্যলেখ' নামে—তাঁহার শিষ্য জনৈক রাজপুত্র রত্নকীর্তিকে সংসার বাসনা ত্যাগ করিবার উপদেশ দিয়া ১১৭ শ্লোকে চিঠির আকারে—একখানি ধর্মকাব্য লেখেন,—যেমন নাগার্জুন সাতবাহন রাজার উদ্দেশ্যে লিখিয়াছিলেন 'সুহৃল্লেখ'। 'ন্যায়সিদ্ধালোক' নামে চন্দ্রগোমীর ন্যায়শাস্ত্রের উপর একখানি গ্রন্থ তিব্বতীয় অনুবাদে আছে। এ সব ব্যতীত, 'ত্যেঙ্গুরে' বৌদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্রে চন্দ্রগোমীর লেখা অনেক পুস্তকের ও স্তবস্তোত্রের অনুবাদ আছে।

গল্পে বলে, বররুচির বাড়ী বসিয়া ব্যাকরণখানা লেখার পর চন্দ্র-গোমী গেলেন নালন্দায়। এখানে তাঁহার সহিত 'মধ্যমক-বৃত্তি'র প্রসিদ্ধ লেখক চন্দ্রকীর্তির দেখা হয়। চন্দ্রগোমী ছিলেন আর্য অসঙ্গের যোগাচার মতানুবর্তী, আর চন্দ্রকীর্তি ছিলেন নাগার্জুনের শূন্যবাদের অনুগামী। অচিরে তাঁহাদের দুইজনের মতদ্বৈধতা উপস্থিত হইল। এই গল্পানুসারে চন্দ্রগোমী চন্দ্রকীর্তির প্রতিদ্বন্দী, কিন্তু তাঁহার 'শিষ্যলেখ' অনুসারে তিনি চন্দ্রকীর্তির ছাত্র। ইহা হইতে তাঁহার তারিখটা নির্ণয় করা যাইতে পারে। কাহারও কাহারও মতে, চন্দ্রগোমী চতুর্থ কিংবা পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে

ছিলেন, কেহ কেহ বলেন, তাঁহার তারিখ ৪৭০ খৃষ্টাব্দ, আবার কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন, তিনি প্রায় ৭০০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন, কিন্তু এই সকল কোনও মতই বিচারসহ নয়। চন্দ্রকীর্তির শিষ্য চন্দ্রগোমী খুব সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যমান ছিলেন।

ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের অবসানের সঙ্গে চন্দ্রের ব্যাকরণের পঠন-পাঠনও অপ্রচলিত হইয়া পড়িতে লাগিল। বাঙ্গালাদেশে কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীতে বৃহস্পতি রায়মুকুট তাঁহার অমরকোষের টীকা 'পদচন্দ্রিকা'য় বহুস্থানে চন্দ্রগোমীর মতামত উল্লেখ করিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দীতেও জয়ানন্দ বন্দ্যঘটীয় তাঁহার 'চৈতন্য মঙ্গলে' বলেন, চৈতন্যদেব চান্দ্র ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ("চান্দ্র সারস্বত নব কাব্য নাটকে")। এমন কি, সপ্তদশ শতাব্দীতেও দুর্গাদাস বিদ্যা-বাগীশ তাঁহার 'মুগ্ধবোধ ব্যাকরণে'র টীকায় চান্দ্র-মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাতে প্রতিপন্ন হয়, অন্ততঃ সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত চন্দ্রের স্মৃতি তাঁহার স্বদেশে জাগরূক ছিল।

চন্দ্রের ব্যাকরণ সিংহলেও সমাদর লাভ করিয়াছিল, এবং দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সে আদর তথায় অব্যাহত ছিল। তাহার পর সিংহলী পণ্ডিত কশ্‌শপের, চান্দ্রমতের উপর ভিত্তি করিয়া লিখিত, 'বালবোধন' নামে সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণখানি ক্রমশঃ তথায় জনপ্রিয় হইতে লাগিল, এবং আদি চান্দ্র ব্যাকরণের ব্যবহারও ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে লাগিল। কিন্তু চন্দ্রগোমীর সময় হইতে তাঁহার ব্যাকরণ

তিব্বতে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল, এবং অদ্যাপি তিব্বত চন্দ্রগোমীকে ও তাঁহার ব্যাকরণকে ভুলিতে পারে নাই।

মহাযান সূত্রের ২২৪ খানি গ্রন্থ এবং মহাযান অভিধর্মের ১৯২ খানি গ্রন্থ, এবং মহাসাঙ্ঘিক, স্থবির, সম্মিতীয়, মহীশাসক, কাশ্যপীয়, ধর্মগুপ্তীয় ও সর্বাস্তিবাদ এই প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ের সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম শ্রেণীর চৌদ্দ, পনের বা তদতিরিক্ত সংখ্যক গ্রন্থ লইয়া[১০] হুয়েন সাংয়ের ৬৪৪ খৃষ্টাব্দে ভারত ত্যাগের পর, এবং ৬৭৩ খৃষ্টাব্দে ই-ৎসিংয়ের ভারতে আগমনের পূর্বে যে বহুসংখ্যক চৈনিক পর্যটক ভারতে আসিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ৫৬ জনের উল্লেখ ই-ৎসিং করিয়া গিয়াছেন, এবং সেঙ্-চি নামে জনৈক শ্রমণ এই ৫৬ জনের অন্যতম সমতটে। আসিয়া সেঙ্-চি তথাকার যে বিবরণ দিয়া গিয়াছেন, তাহা সেখানকার তৎকালীন বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের পক্ষে মূল্যবান। সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে যেখানে এক ব্রহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত ছিল, ঐ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে আসিয়া সেঙ্-চি সেখানে এক বৌদ্ধকে রাজত্ব করিতে দেখেন। হয় বংশের পরিবর্তন হইয়াছিল, না হয় ঐ পুরাতন রাজবংশেরই তৎকালীন প্রতিনিধি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। চীনা ভাষা হইতে রাজার নাম উদ্ধার করা হইয়াছে 'রাজভট'। কেহ কেহ অনুমান করেন, এই রাজভট ঢাকার নিকটে অসরফ্পুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনদ্বয়ে উল্লিখিত বৌদ্ধ খড়্গবংশীয় তৃতীয় রাজা দেবখড়্গের পুত্র রাজরাজ বা

(১০) ডক্টর মাৎসুমোতোর অভিমত, 'বৌদ্ধ গ্রন্থকোষে', পৃঃ ৯, উদ্ধৃত।

রাজরাজভট্টের সহিত অভিন্ন। এই মত স্বীকার করিলে বুঝিতে হইবে, সমতটে রাজবংশের পরিবর্তন সঙ্ঘটিত হইয়াছিল, এবং সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয় হইতে তৃতীয় পাদের মধ্যে চারি পুরুষ রাজা পর পর রাজত্ব করিয়াছিলেন, এবং ইহার মধ্যে আবার একা দেবখড়্গাই অন্ততঃ তের বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু 'রাজভট'কে 'রাজরাজভট্টে', এবং কোন্ এক 'দেববর্ম'কে 'দেবখড়্গো' রূপান্তরিত করিবার স্বাধীনতা থাকিলে, 'রাজভট'কে 'রাজভদ্র'ও করিয়া লইতে বাধা থাকে না, এবং সে ক্ষেত্রে বুঝিতে হইবে শীলভদ্রের পিতৃ-পিতামহের বংশের পরিবর্তন হয় নাই, সেই বংশের তৎকালীন রাজার ধর্মমতেরই পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। যাহা হোক্, সেঙ্-চি'র 'রাজভট' ছিলেন ত্রিরত্নের প্রতি ভক্তিমান, এবং একজন 'পরমোপাসক'। সেঙ্-চি বলেন, রাজভট প্রত্যহ বুদ্ধের একলক্ষ মৃন্ময় মূর্তি গড়াইতেন, এবং প্রত্যহ 'মহাপ্রজ্ঞা-পারমিতাসূত্রে'র এক লক্ষ শ্লোক পাঠ করিতেন। তিনি আবার সময়ে সময়ে বুদ্ধের সম্মানার্থ শোভাযাত্রা বাহির করিতেন, তাহার পুরোভাগে থাকিত অবলোকিতেশ্বরের এক মূর্তি। রাজভট ধর্মের কারণে দান-ধ্যানও করিতেন। দ্রষ্টব্য, বছর ত্রিশেক পূর্বে হুয়েন সাং আসিয়া যে সমতটে শুধু দ্বিসহস্র স্থবিরবাদী শ্রমণই দেখিয়াছিলেন, সেইখানে সেঙ্-চি'র সময়ে মহাযানের প্রভাব ক্রিয়া করিতেছিল। সেঙ্-চি বলেন, রাজভটের রাজধানীতে চারি সহস্র ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী ছিলেন। তাঁহারা কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত

তাহা তিনি ব্যক্ত করেন নাই, কিন্তু দেখা যাইতেছে, হুয়েন সাংয়ের সময় অপেক্ষা সেঙ্-চি'র সময়ে সমতটে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব প্রবলতর ছিল।

৬৭৩ খৃষ্টাব্দে ই-ৎসিং তাম্রলিপ্তিতে আসিয়া কিছুদিন অবস্থান করিয়া সংস্কৃত (ও শব্দবিদ্যা) শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, এবং নাগার্জুনের 'সুহৃল্লেখ'খানি চীনা ভাষায় অনুদিত করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তাম্রলিপ্তিতে আরও কোনও কোনও চীনা শ্রমণ বিদ্যাভ্যাস করিতেছিলেন, এবং তাম্রলিপ্তি তখন সর্বাস্তিবাদের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। তৎকালে তাম্রলিপ্তিতে 'পো-লো-হো' বা 'বরাহ'-বিহার নামে একটি বিখ্যাত বিহার ছিল, সেই বিহারে বাস করিতেন তাম্রলিপ্তির অল্প বয়স্ক এক শ্রমণ, নাম তাঁহার রাহুলমিত্র। রাহুলমিত্রের বয়স যখন ত্রিশ বৎসর, তখনই তাঁহার যশ চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ই-ৎসিং বলেন, তাঁহার জ্ঞানের গভীরতার জন্য তিনি সেই যুগে প্রাচ্য ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রমণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। ই-ৎসিং দয়া করিয়া এই তথ্যটি না লিপিবদ্ধ করিলেই ভাল করিতেন, কারণ অতখানি রাহুলমিত্রের এই এতটুকু না জানিলেও বাঙ্গালার ইতিহাসের পক্ষে কিছুমাত্র ক্ষতি ছিলনা। এমন কত রাহুলমিত্রই বিস্মৃতির তমসাচ্ছন্ন বিবরে লীন হইয়া আছেন, ই-ৎসিং-গণের ক্ষমতাও নাই তাঁহাদের প্রনষ্ট স্মৃতিতে আবার ক্ষীণতম প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে পারেন। তাঁহাদের জন্য খেদ প্রকাশ করিয়া বঙ্গ-জননীর ভাগ্যলিপিকে নিরর্থক

নিষ্ঠুর খোঁটা দিতে চাই না। তবে ই-ৎসিংকে অন্ততঃ মুখের একটা ধন্যবাদ দিতেই হয়।

সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর নবাবিষ্কৃত রাত-শাসনে দেখা যায়, সমতটের পরম বৈষ্ণব রাজা শ্রীধারণের মহাসন্ধিবিগ্রহাধিকারী (বৌদ্ধ) জয়নাথ রত্নত্রয়ের জন্য ("মহাকরুণয়া সর্বজ্ঞস্য ভগবতস্তথাগতোরত্নস্য" ইত্যাদি) এবং ব্রাহ্মণার্যগণের পঞ্চমহাযজ্ঞ প্রবর্তনের জন্য কিছু ভূমিদান করিতেছেন[১১]। ইহা এই সময়ে সমতটে বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাবের আর এক নিদর্শন, এবং ধর্ম বিষয়ে বাঙ্গালী-চিত্তের উদারতার আর এক সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

(১১) সা-প-প, ৫৩ শ ভাগ, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, পৃঃ ৪৪

পাল-যুগ

হুয়েন সাংয়ের সময়েই ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অবনতি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ফা-হিয়েন যে সমস্ত বৌদ্ধ ক্ষেত্র ও বৌদ্ধ মন্দির সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত দেখেন, হুয়েন সাং তন্মধ্যে অনেক স্থান ও তদতিরিক্ত অন্যান্য বহু সঙ্ঘারাম ও দেবালয় ভগ্ন, ভগ্নপ্রায় বা একেবারে পরিত্যক্ত দেখিতে পান, এবং কোনও কোনও স্থান ক্রমশঃ সদ্ধর্মের প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া তীর্থিকদের কবলিত হইতেছে লক্ষ্য করেন। এমন কি, কৌশাম্বী, শ্রাবস্তী, কপিলবাস্তু, কুসিনারা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ তীর্থগুলিরও তখন এই দশা। কেবল কনৌজে হর্ষবর্ধনের অনুপ্রেরণায় ঐ ধর্ম কিছুদিন সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল, বিহারের সংখ্যা দুই হইতে এক শতে দাঁড়াইল, কয়েকদিন বেশ ধূমধাম চলিল। কিন্তু হর্ষের পরেই কনৌজেও আবার উহা ম্লান হইয়া পড়িল, এবং আর একবার প্রমাণ করিল যে, রাজশক্তির আশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষকতা ভিন্ন ভারতে প্রবল ব্রহ্মণ্যধর্মের প্রতিযোগিতায় সঙ্ঘশক্তি বলীয়ান হইয়া টিকিতে পারে না। অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত উত্তরাপথের ও দক্ষিণাপথের স্থানে স্থানে বৌদ্ধধর্মের সত্তার কিছু কিছু চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু পূর্বভারতে দীর্ঘজীবী পালবংশের পৃষ্ঠপোষণে উহার ইতিহাস ও সমৃদ্ধি আরও তিন-চারি শতাব্দীর পরমায়ু প্রাপ্ত হইল। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রথম গোপালদেব (আনুঃ ৭৫০ খৃঃ) প্রকৃতিপুঞ্জ

কর্তৃক রাজপদে নির্বাচিত হইয়া যে বংশের প্রতিষ্ঠা করিলেন, দ্বাদশ শতকের দ্বিতীয় পাদে বাঙ্গালায় মদনপালের (আনুঃ ১১৪০খৃঃ) রাজত্বের সহিত সেই বংশের উচ্ছেদ সাধন হইল। একদিকে প্রবল রাজশক্তির প্রভাবে এবং অপর দিকে আভ্যন্তরীণ শাসনযন্ত্রের সুব্যবস্থা ও উদার ধর্মনীতির কল্যাণে একই বংশের সতের জন নৃপতি প্রায় চারি শত বৎসর ধরিয়া একই রাজ্যে রাজত্ব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভারতের ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত আর নাই। অবশ্য দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাজা ধর্মপালের ও দেবপালের পর এই বংশের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠা ও গুরুত্ব অনেকটা খর্ব হইয়া গিয়াছিল, পূর্বে বঙ্গ (পূর্ববঙ্গ) ও পশ্চিমে মগধের ওদিকে সকল স্থানই তাহাদের হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু গৌড় ও মগধের উপর পালদের অধিকার এই সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া প্রায় অব্যাহতই রহিল।

হুয়েন সাংয়ের সময় পর্যন্তও বাঙ্গালাদেশে হীনযানের প্রাবল্য ছিল, কিন্তু এক শতাব্দীর মধ্যেই মহাযান আসিয়া হীনযানকে স্থানভ্রষ্ট করিয়া দিল, বাঙ্গালা হইতে হীনযান বুঝি অন্তর্ধানই করিল। হয়ত বা দুই চারিটা দৃষ্টান্তে উহার অস্তিত্বের রেখা নয়নগোচর হইতে পারে, কিন্তু ইতিহাসে সে রেখার মূল্য কি? পরমসৌগত পালরাজগণ নিজেরা ছিলেন মহাযান-মতাবলম্বী। তাঁহাদের তাম্র-শাসনগুলির অধিকাংশের প্রারম্ভে যে বন্দনা-শ্লোক আছে তাহা এইরূপ,—

"যিনি কারুণ্যরত্ন-প্রমুদিত হৃদয়ে মৈত্রীকে প্রিয়তমারূপে ধারণ করিয়াছিলেন, যিনি তত্ত্ব-জ্ঞান-তরঙ্গিনীর সুবিমল সলিলধারায় অজ্ঞান-

পঙ্ক প্রক্ষালিত করিয়াছিলেন, যিনি কামক (কামদেব) অরির পরাক্রম-সঞ্জাত আক্রমণ পরাভূত করিয়া শাশ্বতী শান্তি লাভ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীমান্ দশবল লোকনাথের জয় হউক।"

দেবপালদেবের মুঙ্গেরে ও নালন্দায় প্রাপ্ত তাম্রশাসনদ্বয়ের প্রথম শ্লোকটিতে যে বুদ্ধ-কল্পনা আছে, তাহাতে পাই,—

"যে সর্বার্থভূমীশ্বর সুগত (বুদ্ধদেব) প্রবল (অধ্যাত্ম) শক্তি সমূহের আবির্ভাব প্রভাবে ত্রিলোকনিবাসী প্রাণিবর্গের (সুপরিচিত) সিদ্ধিপথ অতিক্রম করিয়া নির্বৃতি (নির্বাণ লোক) লাভ করিয়াছিলেন, সেই পরপ্রয়োজন-সম্পাদন-স্থিরচেতা সৎপথ-প্রবর্তক ভগবান সিদ্ধার্থদেবের সিদ্ধি প্রজাবর্গের সর্বোত্তম সিদ্ধিবিধান করুক।"

আর ধর্মপালের খালিমপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনের প্রথম শ্লোকে আছে,—

"যিনি সর্বজ্ঞতাকেই রাজশ্রীর ন্যায় স্থিরভাবে ধারণ করিয়াছিলেন, সেই বজ্রাসনের (বুদ্ধদেবের) বিপুল-করুণা-প্রতিপালিত বহুমার-সেনাসমাকুল-দিঙ্মণ্ডল-বিজয়সাধনকারী দশবল তোমাদিগকে রক্ষা করুক।"

এই সকল বিভিন্ন বন্দনা-শ্লোকে প্রায় একই ভাব, একই অর্থ, ধ্বনিত হইতেছে। ইহাতে বুদ্ধের সম্বন্ধে মহাযানের নূতন ধারণার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু পাল-নৃপতিগণের নিজেদের ব্যক্তিগত ধর্মমতের অপরাপর বৈশিষ্ট্যের সন্ধান এই সকল শ্লোকে বা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না।

বাঙ্গালার স্থানবিশেষে বা নানাস্থানে দীর্ঘদিন ধরিয়া যে মাৎস্যন্যায় বা অরাজকতা চলিতেছিল, রাজা হইয়া প্রথম গোপাল-দেব তাহা দূর করিয়াছিলেন, কিছু নূতন রাজ্যও জয় করিয়াছিলেন, এবং তারনাথের উক্তি সত্য হইলে বলিতে হইবে, তিনিই স্বধর্মের ও সধর্মিগণের হিতার্থে মগধে উদ্দণ্ডপুর বা ওদন্তপুরী-মহাবিহার নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন, পরে যাহার আদর্শে তিব্বতের সুপ্রসিদ্ধ সম্-য়ে মহাবিহার নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। বোধ করি, দীর্ঘ দিনের মাৎস্যন্যায়ের ফলে এবং হয়ত অন্যান্য কারণেও বাঙ্গালার ব্রাহ্মণাদি বর্ণসমূহ স্ব স্ব শাস্ত্রশাসন হইতে বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। একদা খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে সাতবাহন-রাজ গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি তাঁহার রাজ্যে চতুর্বর্ণের অশাস্ত্রীয় সংমিশ্রনে বাধা দিয়া ("বিনিবতিত চাতুবণ সকরস") সমাজ-সংস্কারকের কাজ করিয়াছিলেন[১] খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতেও ধর্মপাল বাঙ্গালার সিংহাসনে উপবেশন করিয়া একদিকে যেমন শাস্ত্রার্থের অনুবর্তী শাসনকৌশলে শাস্ত্রশাসন হইতে বিচলিত বর্ণসমূহকে স্ব স্ব ধর্মে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া হিন্দুর সমাজ-সংস্কারে ব্রতী হইয়াছিলেন, অন্যদিকে তেমনই রাজ্যের দুই-তিনটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে দুই-তিনটি মহাবিহার স্থাপন করিয়া বৌদ্ধধর্মেরও উন্নতি বিধানে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ধর্মপালের সময়ে, সম্ভবতঃ তাঁহারই অনুপ্রেরণায়, বিস্তর গ্রন্থাদি রচিত হইয়া বাঙ্গালার বৌদ্ধসাহিত্যও পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল[২]। তাঁহারই

(১) *Ep. Ind.*, VIII, p. 60.

(২) *Ind. Cult.*, VI, pp. 327 ff.

সময়ে আবার নালন্দার ('নলেন্দ্রে'র) ধীমান্ ও তৎপুত্র বীতপাল নামক প্রখ্যাত শিল্পীদ্বয় গৌড়ীয় ভাস্কর্য-শিল্পে যে নূতন রীতির প্রবর্তন করিলেন, সেই রীতির অনুবর্তী হইয়াই চারিশত বৎসর পর্যন্ত বাঙ্গালা ও মগধের বৌদ্ধ ও হিন্দু প্রতিমা সমূহ গঠিত হইয়াছিল। যে ধর্মপালের কীর্তিকথা সেকালের লোকের, এমন কি, ক্রীড়াশীল শিশুগণের ও বিলাসগৃহের পিঞ্জরস্থিত শুকগণের মুখে মুখে পরিকীর্তিত হইত, বাঙ্গালার পরবর্তীকালের জনশ্রুতি তাঁহাকে একেবারে বিস্মৃত হইয়া যায় নাই। খৃষ্টীয় ষোড়শ হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রচিত 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যগুলিতে,—চেনা কঠিন হইলেও,—এই গৌড়েশ্বর ধর্মপালই বিরাজ করিতেছেন; সেখানে তিনি 'পরমসৌগত' নহেন, 'পরম বৈষ্ণব', এবং অদৃষ্টের ফেরে তাঁহারই অঙ্কলক্ষ্মী 'রণ্না' তাঁহার কেলিকুঞ্চিকা 'রঞ্জাবতী' সাজিয়া পরের ঘর করিতেছেন।

ধর্মপালের পুত্র দেবপাল পিতার তুল্যই দিগ্বিজয়ী, কীর্তিমান্ ও খ্যাতিমান্ সম্রাট ছিলেন। তাঁহার শাসনকালেই বিক্রমশীল ও সোমপুরী বিহারদ্বয় পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে। ধর্মপাল ও দেবপালের রাজত্বকালে জাভা-সুমাত্রার প্রবল পরাক্রান্ত শৈলেন্দ্র-বংশীয় নরপতিগণের সহিত তাঁহাদের, অর্থাৎ কিনা জাভা-সুমাত্রার সহিত বাঙ্গালা-মগধের, একটা হৃদ্য যোগাযোগ স্থাপিত হয়। জাভার কলসনের নিকটবর্তী কেলুরক নামক স্থানে প্রাপ্ত একটি প্রাচীন লেখে দেখা যায় যে, শৈলেন্দ্ররাজ

শ্রীসংগ্রাম-ধনঞ্জয়ের গুরুদেব ছিলেন কুমারঘোষ নামক একজন বাঙ্গালী, গৌড়ের অধিবাসী। এই 'গৌড়ীদ্বীপগুরু' কুমারঘোষ ৭৭৮ খৃষ্টাব্দে তথায় একটি মঞ্জুশ্রী-মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন[৩]। গৌড়েশ্বর ঐ সময় ধর্মপাল। পরবর্তী শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে শৈলেন্দ্র-বংশীয় বালপুত্রদেব নালন্দায় একটি বিহার নির্মাণ করিয়া-ছিলেন এবং তাঁহারই অনুরোধে দেবপাল উহার সংরক্ষণার্থে পাঁচটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। ইহার অনেক পরেও, চতুর্দশ শতাব্দীতে, গৌড় হইতে বহুসংখ্যক শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ (হিন্দু) জাভার তৎকালীন রাজধানী মজপহিতে গিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে[৪]। জালালাবাদ উপত্যকার নগরহার নামক স্থানের অধিবাসী ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব ইন্দ্রগুপ্তের পুত্র বীরদেব বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া বৌদ্ধমতের অনুরাগী হইয়া পেশোয়ারে কণিষ্ক-বিহারে গমন করেন, এবং সর্বজ্ঞশান্তি নামক আচার্যের নিকট হইতে শিক্ষা ও দীক্ষা লাভ করিয়া বোধ্‌গয়ার যশোবর্মপুর-বিহারে আসিয়া যখন দীর্ঘকাল অবস্থিতি করেন, সেই সময়ে তিনি দেবপালের নিকট পূজা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শুধু তাই নয়, দেবপাল তাঁহাকে নালন্দার প্রতিপালন কার্যেও নিযুক্ত করেন। ৮৫১ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ দেবপালেরই সময়, গোমিন্‌ অবিঘ্নাকর নামক গৌড়ের একজন বৌদ্ধ রাষ্ট্রকূট-সম্রাট প্রথম অমোঘবর্ষের

---

(৩) *Suvarṇadvipa*, R. C Majumdar, Vol. I, p. 152.
(৪) *Ibid*, p 336.

সামন্ত শিলাহার-বংশীয় কপর্দিনের শাসনকালে দাক্ষিণাত্যের কোঙ্কণ-দেশে গমন করিয়া তথায় প্রসিদ্ধ কৃষ্ণগিরি-মহাবিহারের শ্রমণদের নিমিত্ত বিরাট উপাসনাশালা নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন, এবং উপরন্তু এক শত দ্রম্য (মোহর) শাশ্বতকালের জন্য দান করিয়াছিলেন, যাহার কুসীদ হইতে তাঁহার মরণান্তে তত্রত্য ভিক্ষুগণ পরিচ্ছদ পাইবেন। দেবপালের রাজত্বকালে নির্মিত কতগুলি বৌদ্ধমূর্তি মগধে ও বাঙ্গালায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু বৌদ্ধ সাহিত্যের দিক দিয়া দেবপালের রাজত্বকাল বিশেষ স্মরণীয় নয়।

দেবপালের পর প্রথম বিগ্রহপাল বা শূরপাল, নারায়ণপাল, রাজ্যপাল, দ্বিতীয় গোপাল ও দ্বিতীয় বিগ্রহপাল,—এই পাঁচজন রাজা পুরুষানুক্রমে প্রায় একশত চল্লিশ বছর রাজত্ব করেন। ইঁহারা অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাজা ছিলেন, এবং রাজ্যরক্ষার জন্যই এত ব্যস্ত ছিলেন যে অন্য কোনও ব্যাপারে সবিশেষ মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই। আনুমানিক ৯৯০ খৃষ্টাব্দে রাজা হইলেন প্রথম মহীপাল এবং প্রায় ১০৪০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন[৫]। তাঁহার পুত্র নয়পাল তাহার পরে অন্ততঃ পনের বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। একাদশ শতাব্দীর এই প্রথমার্ধ আবার বাঙ্গালা-মগধের বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করিল। মহীপাল ও নয়পালের আগ্রহে ও

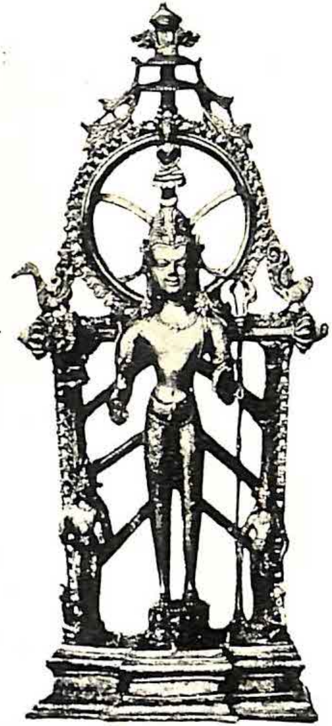
[৫] সা-প-প, ১৩৩৩, পৃঃ ৫৫।

যত্নে বৌদ্ধ ধর্ম নূতন জীবনীশক্তি লাভ করিল। এই যুগেই মগধের বিক্রমশীল ও বাঙ্গালার সোমপুরী যশের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। কাশ্মীর ও ভারতের অন্যান্য স্থানের অসংখ্য শ্রমণ, এবং তিব্বতের অগণিত 'লোচাব' আসিয়া এই দুই বিহারে বহু গ্রন্থ রচনা করিলেন, বহু গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করিলেন, এবং বহু পুঁথি নকল করিলেন। এই যুগেই রত্নাকর শান্তি, অতীশ দীপঙ্কর প্রভৃতি ক্ষণজন্মা পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল। গৌড়ীয় শিল্পরীতি অনুসৃত বহু বৌদ্ধ দেবদেবীর অনবদ্য বিগ্রহ এই যুগেরই শিল্পসাধনার নিদর্শন। এই যুগেই, ১০২৬ খৃষ্টাব্দে, বরেন্দ্র (উত্তরবঙ্গ) হইতে এক বাঙ্গালী শ্রমণ অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ সহ চীনে গিয়াছিলেন, চীনা ভাষায় তাঁহার নাম পৌ-সি (P'ou-tsi), এবং বরেন্দ্রের নাম ফো-লিন-নৈ (Fo-lin-nai)[৬]। জাপানের হোরিয়ুজি (Horiuzi) মন্দিরে রক্ষিত কতগুলি ধর্মপুস্তক একাদশ শতাব্দীর বঙ্গাক্ষরে লিখিত বলিয়া কথিত আছে, উহা সত্য হইলে, সম্ভবতঃ মহীপাল-নয়পালের যুগেই ঐ পুঁথিগুলি বাঙ্গালা হইতে হয় সরাসরি, না হয় স্থানান্তর ঘুরিয়া, জাপানে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। নয়পালের পর তাঁহার পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপাল রাজত্ব করেন, এবং তাঁহার পর তাঁহার তিন পুত্র দ্বিতীয় মহীপাল, দ্বিতীয় শূরপাল এবং রামপাল পর পর রাজত্ব করেন। দ্বিতীয় মহীপালের হঠকারিতার ফলে বরেন্দ্রে যে

(৬) মানসী ও মর্মবাণী, ১৩২৯, পৃঃ ৪৮২।



ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসনের মুদ্রা
ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সৌজন্যে



বরিশাল-কেশবপুরের শিব-লোকেশ্বর
আশুতোষ-চিত্রশালার
কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে

কৈবর্ত-বিদ্রোহ হইয়াছিল, তাহার ফলে বরেন্দ্রী কিছুকালের জন্য পালদের হস্তচ্যুত হইয়া গেল এবং দ্বিতীয় মহীপাল নিহত হইলেন। দ্বিতীয় শূরপাল অতি অল্পদিনই সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। এক শক্তিশালী সামন্ত-চক্র গঠন করিয়া রামপাল কৈবর্তদের হস্ত হইতে বরেন্দ্রী পুনরুদ্ধার করিলেন এবং এই রামপালই পাল-বংশের শেষ পরাক্রান্ত নরপতি। অনবরত যুদ্ধ-বিগ্রহাদির মধ্যে লিপ্ত থাকিয়াও রামপাল বৌদ্ধধর্মকে ভুলেন নাই। নূতন রাজধানী রামাবতী নগরের জগদ্দল-মহাবিহার তাঁহারই কীর্তি। অভয়াকর গুপ্ত প্রভৃতি কয়েকজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্যকে তাঁহার রাজত্বকালেই দেখিতে পাই। রামপালের পর কুমারপাল, তৃতীয় গোপাল ও মদনপাল নামেমাত্র গৌড়েশ্বর ছিলেন। পালদের তাম্রশাসনগুলিতে সংযুক্ত রাজমুদ্রায় রাজার নামের উপরিভাগে বৌদ্ধমত-বিজ্ঞাপক ধর্মচক্র-মুদ্রা, এবং ধর্মচক্রের উভয়পার্শ্বে সমাসীন দুইটি মৃগমূর্তি অঙ্কিত রহিয়াছে।

খৃষ্টীয় অষ্টম হইতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে দুই তিনটি বৌদ্ধ রাজবংশ পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিল। খড়্গ-বংশ ঠিক কখন রাজত্ব করিয়াছিল তাহা এখনও সঠিকভাবে নির্ণীত হয় নাই। যাঁহারা এই বংশকে সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নির্দেশ করিতে চান, তাঁহাদের যুক্তি কত দুর্বল তাহা পূর্বে দেখিয়াছি। অক্ষর-তত্ত্বের প্রমাণানুসারেও অত আগে ঐ বংশের কাল নিরূপণ বোধ হয় সঙ্গত নয়। যাহা হোক্, অসরফপুরের তাম্রশাসনদ্বয়

হইতে ঐ বংশের চারি পুরুষের নাম জানা যায়, খড়্গোদ্যম, জাতখড়্গ, দেবখড়্গ এবং যুবরাজ রাজরাজভট্ট। যে 'কর্মান্তবাসকে' লিপিদ্বয় সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহা কুমিল্লার অনতিদূরবর্তী কর্মান্ত-নগর বা বড়-কাম্‌তা বলিয়া আপাততঃ নির্ধারিত হইয়াছে। লিপিদ্বয়ে খড়্গগণকে "সর্বলোকবন্দ্য ত্রৈলোক্যখ্যাতকীর্তি ভগবান সুগত এবং তাঁহার শান্ত, ভব-বিভব-ভেদকারী, যোগীগণের যোগগম্য ধর্ম এবং অপ্রমেয় বিবিধ গুণসম্পন্ন সঙ্ঘের পরম ভক্তিমান উপাসক" বলিয়া দেখিতে পাই। 'পরম সৌগতোপাসক' জাতখড়্গের পুত্র নরপতি দেবখড়্গের প্রথম শাসনখানি দ্বারা কিয়ৎপরিমাণ ভূমি যুবরাজ রাজরাজভট্টের আয়ুষ্কামনার্থে আচার্যবন্দ্য সঙ্ঘমিত্রের বিহারে, এবং দ্বিতীয়খানি দ্বারা তাঁহার ত্রয়োদশ রাজ্যাঙ্কে যুবরাজ রাজরাজ কিয়ৎপরিমাণ ভূমি বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ এই ত্রিরত্নের উদ্দেশ্যে শালিবর্দ্দ (র্দ্ধ) কস্থিত আচার্য সঙ্ঘমিত্রের বিহারে দান করিয়াছিলেন। উভয় তাম্রশাসনে সংযুক্ত রাজমুদ্রা দেখিয়া অনুমান হয়, অর্হৎগণের বাহন বৃষ খড়্গদের লাঞ্ছন ছিল।

ইহার পর এবং সম্ভবতঃ ৯৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোনও সময়[৭] পূর্ববঙ্গে মহারাজাধিরাজ কান্তিদেব নামক এক বৌদ্ধ নৃপতি রাজত্ব করিয়াছিলেন। কান্তিদেব বিন্দুমতী নাম্নী জনৈক রাজ-পুত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। দশম শতাব্দীর শেষার্ধে পূর্ববঙ্গে চন্দ্র-বংশ নামে আর একটি বৌদ্ধ রাজবংশ স্থাপিত হইয়াছিল।

[৭] *HBDU*, p. 135

এই বংশের প্রথম পুরুষ পূর্ণচন্দ্র 'রোহিতগিরি' বা কুমিল্লার লালমাই পাহাড় হইতে আগত হইয়াছিলেন এবং জগতে 'বৌদ্ধ' বলিয়া বিশ্রুত ছিলেন, কিন্তু তিনি রাজমুকুট ধারণ করিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। তাঁহার পুত্র 'পরম সৌগত' ত্রৈলোক্যচন্দ্র দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গে চন্দ্রদ্বীপে নৃপতি হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার পুত্র শ্রীচন্দ্র সার্বভৌমিকত্ব-সূচক 'পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার একখানি তাম্রশাসন দ্বারা তিনি শ্রীবিক্রমপুর-সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার (বা রাজধানী) হইতে পৌণ্ড্রভুক্ত্যন্তঃপাতী নান্যমণ্ডলে ভূমিদান করিয়াছিলেন। শ্রীচন্দ্রের অন্ততঃ আরও তিনখানি তাম্রফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং ইহাদের প্রত্যেক-খানিরই প্রথম শ্লোকের বুদ্ধ-বন্দনা এইরূপ,—

"করুণার একমাত্র আধার, বন্দনার্হ সেই ভগবান জিন (বুদ্ধ) এবং জগতের একমাত্র দীপসদৃশ তাঁহার ধর্ম (উভয়েই) জয়লাভ করুন। সকল মহানুভব ভিক্ষুসঙ্ঘই বুদ্ধ ও ধর্মের সেবা করিয়া সংসার (-সাগর) পারে উপস্থিত হন।"

শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসনগুলিতে যে রাজমুদ্রা সংযুক্ত আছে তাহাতে পাল-রাজগণের শাসনাবলীর মতই মৃগমূর্তিলাঞ্ছিত ধর্মচক্র-মুদ্রা খোদিত আছে। সম্ভবতঃ প্রথম মহীপালের সমসাময়িক বঙ্গাল-দেশের নৃপতি গোবিন্দচন্দ্রও এই চন্দ্রবংশেরই সন্তান ছিলেন। বাঙ্গালীর জনশ্রুতিতে তিনিই গোপীচাঁদ বলিয়া পরিচিত, এবং তাঁহারই মাতা সিদ্ধ গোরক্ষনাথের শিষ্যা মদনাবতী বা ময়নামতীর

যোগবিভূতি সম্বন্ধে অনেক রোমাঞ্চকর কাহিনী এখনও পূর্ববঙ্গের ঘরে ঘরে প্রচলিত।

পাল-যুগে, সম্ভবতঃ দশম শতাব্দীর তৃতীয় পাদে দ্বিতীয় বিগ্রহ-পালের সময়ে ব্রহ্মদেশ ও বাঙ্গালার মধ্যবর্তী লুসাই পর্বত অঞ্চল হইতে আগত, কম্বোজান্বয় এক রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল উত্তরবঙ্গে। পাল-বংশের অধিকার সেই সময় শুধু পশ্চিমবঙ্গের কিয়দংশ এবং অঙ্গ ও মগধেই পর্যবসিত হইয়াছিল। এই নূতন বংশের রাজাদেরও 'পাল' উপাধি ছিল, এবং উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত ইর্দা গ্রামে আবিষ্কৃত এই বংশীয় নয়পালদেবের এক তাম্রশাসনে দেখা যায়, নয়পালের পিতা 'কাম্বোজ-বংশ তিলক মহারাজাধিরাজ' রাজ্যপাল ছিলেন 'পরম সৌগত', এবং তাম্রফলকে সংযুক্ত রাজমুদ্রায় পাল ও চন্দ্ররাজগণের মতই দুইটি অর্ধ-শায়িত, উন্নতশীর্ষ মৃগমূর্তি-লাঞ্ছিত ধর্মচক্র-মুদ্রা মুদ্রিত রহিয়াছে।

এই পাল-যুগই সর্বতোভাবে বাঙ্গালার ইতিহাসের 'গুপ্ত-যুগ', সর্বাঙ্গীন উন্নতির যুগ। এই প্লুতগতি উন্নয়নের মূলে রহিয়াছে উরুসত্ব পালদের ঐকান্তিক এষণা ও আগ্রহ এবং অবন্ধ উৎসাহ ও প্রেরণার প্রবর্তনা। অগ্নিকোণের কোন্ সাগরপুরী হইতে পালগণ সোনার কাঠি আহরণ করিয়া আনিয়াছিলেন জানিনা, কিন্তু তাহার সম্মোহনস্পর্শে একটা জাতি সহসা এত কর্মনিষ্ঠ হইয়া উঠিল,—বিদ্যায়, উপবিদ্যায়, ধর্মে, আচরণে, চিন্তায়, এৈকেক ব্যাপারে এত দ্রুত সমুৎক্রম হইল সে জাতির,—যেন মনে হইল

গুপ্ত-যুগকেও বুঝি বা পাল-যুগ খ্যাতিতে উপসর্জন করিয়াই যায়। কিন্তু যায় নাই তাহা। বাঙ্গালাদেশের উর্বর মাটির ও ভাগ্যের দোষে, সে-যুগের যথার্থ স্মৃতি বহন করিয়া আনিতে পারে এমন উপাদান এতই কম অবশিষ্ট রহিয়াছে যে, বলিতেই হইবে গুপ্ত-যুগের ঋদ্ধিকে পাল-যুগ অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে নাই। খানকয়েক তাম্রশাসন ও শিলালিপি, কতগুলি দেবমূর্তি, কিছু সংস্কৃত পুঁথি এবং তিব্বতীয় অনুবাদে সংরক্ষিত কয়েক শত বৌদ্ধ গ্রন্থ বা গ্রন্থের টীকা-টিপ্পনী,—এই ত সম্বল। এই ধূম্রাবশেষ দেখিয়া বহ্নিমান পর্বতকেই অনুমান করিতে পারি, কিন্তু সেই দহ্যমান পর্বতের লেলিহান শিখা কোন্ উর্ধ্বগগনে উঠিয়া দিক-চক্রকে কত উদ্ভাসিত করিয়াছিল, তাহা অনুমান করিব কি করিয়া? তবে একটা কথা, যেটুকু রহিয়াছে তাহা দেখিয়াই বুঝি, অন্ততঃ একটা বিষয়ে গুপ্ত-যুগকে বা যে-কোনও যুগকেই পাল-যুগ অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল, সেটা হইতেছে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে নির্মৎসরতা ও ক্ষান্তি। দুই সম্প্রদায়, হিন্দু ও বৌদ্ধ, অসূয়াপরতন্ত্রতা বিসর্জন দিয়া, পাল-যুগে একে অন্যের বুকের কত কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা বুঝা যায়,—আছে অবশিষ্ট যাহা তাহারই অবলম্বনে। পাল-যুগে বাঙ্গালার নৃপতিগণ ও তাঁহাদের প্রকৃতিপুঞ্জ ধর্মবিষয়ে সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিয়া চলিতেন, এইটুকু মাত্র বলিলে ভুল হইবে, সে ভুল করিব না। বলি, ধর্মবিষয়ে তাঁহাদের ঔদার্য ছিল অমিত ও অপ্রতিম। কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি,

সেগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাদের মর্মার্থ অনুধাবন করিলেই প্রতীয়মান হইবে, বৌদ্ধ ও হিন্দু সে-যুগে যেন একই সংহিত ধর্মের দুইটি শাখা ছিল।

ধর্মপাল ও রাজ্যপাল রাষ্ট্রকূট-কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। প্রথম বিগ্রহপালের পত্নী ছিলেন জাহ্নবীর ন্যায় হৈহয়-বংশভূষণরূপা লজ্জা নাম্নী কন্যা। তৃতীয় বিগ্রহপালের অপরা মহিষী ছিলেন হৈহয়রাজ কর্ণদেবের দুহিতা যৌবনশ্রী। স্বামী বৌদ্ধ, পত্নী হিন্দু-তনয়া।

পালগণ ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করিতেন, এবং সেই দান যে করিতেন তাহা 'মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ' পুণ্য ও যশ অভিবৃদ্ধির কামনায়। ধর্মপাল শুভস্থলীতে তাঁহার মহাসামন্তাধিপতি নারায়ণবর্মা-প্রতিষ্ঠিত ভগবন্নন্ননারায়ণ (নন্দ-নারায়ণ ?)-মন্দিরের জন্য ভূমিদান করিয়াছিলেন। নারায়ণপাল স্বয়ং এক সহস্র শিব-মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন ("শ্রীনারায়ণপালদেবেন স্বয়ং কারিত সহস্রায়তনস্য"), এবং কলসপোত নামক স্থানে যে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহার পূজা, বলি, চরু, সত্র প্রভৃতির জন্য এবং তত্রত্য পাশুপত-আচার্য-পরিষদের শয়নাসন-ভৈষজ্য প্রভৃতির জন্য ভূমিদান করিয়াছিলেন, এবং দান করিয়াছিলেন 'ভগবন্তং শিবভট্টারক-মুদ্দিশ্য'। বিষুব সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে প্রথম মহীপাল বিধিবৎ গঙ্গাস্নান করিয়া এক ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। রামপাল তাঁহার সৃষ্ট রামাবতীতে শিবের তিনটি বৃহৎ মন্দির, একাদশ রুদ্রের একটি উচ্চ দেবকুল, এবং সূর্য, স্কন্দ ও গণপতির দেউল স্থাপনা করিয়াছিলেন।

পট্টমহাদেবী চিত্রমতিকাকে বেদব্যাস-প্রোক্ত মহাভারত পাঠ করিয়া শুনাইবার দক্ষিণাস্বরূপ মদনপাল বটেশ্বর শর্মাকে 'বুদ্ধভট্টারকমুদ্দিশ্য' ভূমিদান করিয়াছিলেন। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রাম চরিতে' (৪, ২১) এই মদনপাল স্পষ্টই "চণ্ডী-চরণ-সরোজপ্রসাদ-সম্পন্ন-বিগ্রহশ্রী" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। বৈদ্যদেবের কমৌলি-তাম্রশাসনের রচয়িতা রাজগুরু দ্বিজবর মনোরথের, পালদিগকে হরির দক্ষিণ নয়নস্বরূপ সূর্যদেবের বংশোদ্ভব, অর্থাৎ সূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয়, বলিয়া পরিচয় দিতে সঙ্কোচ হয় নাই। প্রথম বিগ্রহপাল তাঁহার বৃহস্পতি-প্রতিকৃতি মন্ত্রী কেদার মিশ্রের যজ্ঞস্থলে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া অনেকবার শ্রদ্ধাসলিলাপ্লুত-হৃদয়ে, নতশিরে, পবিত্র শান্তিবারি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধর্মপালের ভ্রাতা বাক্‌পালের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র জয়পাল যে শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন, তদুপলক্ষ্যে মহাদান পাইয়াছিলেন কাঞ্জিবিল্লী-গ্রামের নারায়ণের পিতামহ উমাপতি নামক এক ব্রাহ্মণ। ধর্মপাল নামক নরপতিকে পুত্ররূপে লাভ করিয়া গোপালদেব পরলোকগত পিতৃপুরুষগণের ঋণজাল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। এই পরলোকগত আত্মাগুলি তাহা হইলে তখন পর্যন্তও হিন্দু-স্বর্গেই বাস করিতেছিলেন। মাতুল মথনের মৃত্যুসংবাদে রামপাল ব্রাহ্মণগণকে বহুতর ধন দান করিয়া গঙ্গায় ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। এইরূপ প্রাণত্যাগেও ত সেই হিন্দু-স্বর্গেই যাইতে হয়।

ভগবান বুদ্ধ-ভট্টারককে উদ্দেশ করিয়া মাতার, পিতার ও নিজের পুণ্য ও যশোবৃদ্ধির জন্য শ্রীচন্দ্রদেব কোটি-হোম-সম্পাদনকারী,

শান্তিবারিক শ্রীপাতবাস গুপ্তশর্মাকে ধর্মচক্র-মুদ্রা দ্বারা তাম্রশাসনীকৃত করিয়া ভূমিদান করিয়াছিলেন। ঐরূপে ও ঐ উদ্দেশ্যে ঐ রাজাই আবার অদ্ভুতশান্তিহোম-সম্পাদনকারী, শান্তিবারিক ব্যাসগঙ্গা শর্মাকে ভূমিদান করিয়াছিলেন।

পূর্ববঙ্গের খড়্গারা নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ হইলেও, দেবখড়্গের রাণী প্রভাবতী ছিলেন দুর্গার উপাসিকা, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত স্বর্ণ-পত্রমণ্ডিত একটি ধাতব সর্বাণী-মূর্তি কুমিল্লার ছন্দ গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে। সর্বাণী-মূর্তির সহিত একটি অষ্টধাতুর শিবলিঙ্গের গৌরীপট্টও আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাজা বৌদ্ধ বলিয়া রাণীর ব্যক্তিগত ধর্মমতকে বলি দিতে বাধ্য করেন নাই। সেইরূপ আবার দেখি, পরমসৌগত কান্তিদেবের জননী ছিলেন শিবের উপাসিকা 'শিবপ্রিয়া'। উত্তরবঙ্গের কাম্বোজান্বয় পাল-বংশের প্রথম জ্ঞাত রাজা রাজ্যপাল 'পরম সৌগত' হইলেও ভাগ্যদেবীর গর্ভোৎপন্ন তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নারায়ণপাল "বাসুদেবপাদাব্জ-পূজা-নিরত-মানসঃ" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, এবং রাজ্যপালের দ্বিতীয় পুত্র নয়পাল 'পরম মাহেশ্বর' প্রভৃতি কোনও বিশেষণে অঙ্কিত না হইলেও এক পুণ্য নবমী তিথিতে স্নানাদি পূর্বক মহাদেবের (শঙ্কর-ভট্টারক) উদ্দেশে তাঁহার বৌদ্ধ পিতার ও মাতার ও নিজের পুণ্য ও যশোবৃদ্ধির জন্য ধর্মচক্র-মুদ্রা দ্বারা তাম্রশাসন করিয়া ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, একাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে পূর্ববঙ্গের বৈষ্ণব নরপতি সামলবর্মার বজ্রযোগিনী-তাম্রশাসনে নাকি দেখা

যায়, তিনি নারায়ণের প্রীতিকামনায় বিষ্ণুচক্র-মুদ্রা-মুদ্রিত তাম্রশাসন দ্বারা ভীমদেব-প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ দেবীর প্রজ্ঞাপারমিতার মন্দিরে ভূমিদান করিয়াছিলেন।

ধর্মপাল তাঁহার মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত করিয়াছিলেন শাণ্ডিল্য-বংশীয় ব্রাহ্মণ গর্গকে। গর্গের পুত্র 'দ্বিজেশ' দর্ভপাণি ছিলেন ধর্মপালের পুত্র দেবপালের মন্ত্রী, এবং দর্ভপাণির পরে তাঁহার পৌত্র কেদারমিশ্র দেবপালের ও বিগ্রহপালের উভয়েরই মন্ত্রী হইয়াছিলেন। তৃতীয় বিগ্রহপালের মন্ত্রী ছিলেন 'শাস্ত্রবিত্তম' যোগদেব। তৃতীয় বিগ্রহপাল আবার ধর্মপালের মতই বর্ণাশ্রমের আশ্রয়স্থল (চাতুর্বর্ণ সমাশ্রয়ঃ) বলিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছেন। যোগদেবের পুত্র 'তত্ত্ববোধভূ' বোধিদেব ছিলেন রামপালের মন্ত্রী, এবং রামপালের পুত্র কুমারপালের মন্ত্রী ছিলেন বোধিদেবের পুত্র বৈদ্যদেব, যিনি পরে কামরূপের নরেশ্বর হইয়াছিলেন। এই পুরুষানুক্রমে ব্রাহ্মণমন্ত্রী নিয়োগ ব্যাপারে যাঁহারা পালদের 'চালাকি' বা 'ধূর্ততা'র গন্ধ পাইয়া উল্লসিত হইয়াছেন, তাঁহারা এই যুগ-ধর্মকে কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। ইহা ধূর্ততা বা দুর্বলতার অথবা কুহনার অতীত এক অদ্ভুত বৃত্তি সেই গুণগ্রাহী মনের,—যে মন সমষ্টির কল্যাণের অভীপ্সায় সঙ্কীর্ণ দলগত স্বার্থকে বিসর্জন দিতে লেশমাত্র পরাঙ্মুখ নয়, যে মন ফলভাবনার উদ্দেশ্যে যোগ্যতারই সন্ধান করিয়া বেড়ায়, গণতার মোহে অযোগ্যের সম্মাননায় বিবেককে হত্যা করেনা।

হিন্দু নরপতিগণ (যথা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত) যখন বৌদ্ধ সচিব বা অন্য রাজপাদোপজীবি নিয়োগ করেন, তখন তাঁহাদের চালাকি বা দুর্বলতার প্রশ্ন উঠে কৈ?

গুপ্তযুগের উদার আবহাওয়ায় বুদ্ধকে হিন্দুগণ বিষ্ণুর অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন, একথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু এই স্বীকারোক্তিটা নিতান্তই মৌখিক, কারণ বিষ্ণু-মূর্তির প্রভাবলী বা চালিতে ক্ষোদিত দশাবতার-নিবহে বুদ্ধের জন্য দুই এক অঙ্গুলি স্থান ছাড়িয়া দেওয়া ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে বুদ্ধের বিগ্রহ নির্মাণ করিয়া পূজা করা হিন্দুদের কোষ্ঠীতে লেখে নাই, যদিও 'বৃহৎ সংহিতা,' 'মানসার' প্রভৃতি গ্রন্থে বুদ্ধ-মূর্তি রচনার নির্দেশ ও নির্মাণ পদ্ধতি লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। কিন্তু পাল-যুগের অসাম্প্রদায়িকতার অনুপ্রেরণায় বাঙ্গালার ও মগধের দেব-দেবী মহলে নানারূপ অঘটন ঘটিতে লাগিল। বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ই তাঁহাদের নিজ নিজ দেবতা-গোষ্ঠীতে কয়েকটি করিয়া অপর পক্ষের দেব-দেবীকে স্থান দিয়া পূজা-অর্চা আরম্ভ করিয়া দিলেন। তন্মধ্যে সরস্বতীর নামই আগে উল্লেখ করি। কেবলমাত্র হিন্দু (ও জৈন) ভক্তবৃন্দের পূজায় পরিপূর্ণ পরিতুষ্টি লাভ করিতে না পারিয়া, তিনি লজ্জা-সরম জলাঞ্জলি দিয়া মঞ্জুশ্রীর শক্তিরূপে বৌদ্ধদেবতামণ্ডলীতে প্রবেশ করিলেন, এবং এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহার রূপের যদিচ কিছুটা অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন ঘটিল, অনেকগুলি সাধনে (বৌদ্ধ ধ্যান-স্তোত্রে) স্তুত হইয়া তিনি বৌদ্ধ দেবতাসমাজে রীতিমত

কুলদেবীর মধ্যেই গণ্যা হইলেন। ওদিকে ধনকুবের কুবের বৌদ্ধদের প্রতিও সদয় হইয়া উঠিলেন এবং কুবের ও জম্ভল এই দুই নামেই তাঁহাদেরও দেবতা হইতে স্বীকৃত হইলেন, ফলে হিন্দু-দেবতাচক্রে যে অংশিত কুবেরটি রহিয়া গেলেন, তাঁহাকে বৌদ্ধ উচ্ছুষ্ম-জম্ভলের পদারবিন্দের আঘাতে জর্জরিত হওয়া ছাড়া আর কোনও উপায়ই রহিল না। তেমনই যমেরও বোধ করি কেবল এক সম্প্রদায়ের পরিচ্ছিন্ন শিকার দিয়া তেমন সুবিধা হইতেছিল না, তিনিও উচ্চতর ও অধিকতর আশার কুহকে পড়িয়া প্রেতভর্তারূপেই 'ধর্মপাল' উপাধি গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধ দেবতামণ্ডলীভুক্ত হইয়া গেলেন। বজ্রযানের পূর্বদিশাধিপতি বজ্রধর যতই গা-ঢাকা দিয়া চলুন, তাঁহাকে হিন্দুর পূর্বদিকের লোকপাল বজ্রপাণি ইন্দ্র বলিয়া চর্মচক্ষুতেই দিব্য চেনা যায়। সেইরূপ, ত্রিমুখ, চতুর্হস্ত, ঘোরদর্শন ত্রৈলোক্যভস্মঙ্কর হিন্দুর ভৈরব ব্যতীত আর কেহই নহেন; রাজসাহীর বরেন্দ্র-অনুসন্ধানসমিতির চিত্রশালায় এরূপ একটি 'ত্রৈলোক্যভস্মঙ্কর' রহিয়াছেন, পূর্বাশ্রমে তিনি ছিলেন হিন্দু-ভৈরব। এমন কি, অবলোকিতেশ্বরও মাঝে মাঝে পঞ্চশির হইয়া[৮] যেন পঞ্চানন শিবঠাকুরটি সাজিয়া, ভক্তদিগকে না হইলেও, জনসাধারণকে ছলনা করিবার চেষ্টা করেন। অপর পক্ষে আবার হিন্দু তান্ত্রিকগণ বৌদ্ধদের সর্বাপেক্ষা প্রতিপত্তিশালিনী ও প্রথিতযশা দেবী তারাকে (উগ্রতারা বা একজটাকে) দশমহাবিদ্যার অন্যতমা বিদ্যারূপে

৮) *The Gods of Northern Buddhism*, Alice Getty, p. 59.

তাঁহাদের ভৈরবী-চক্রের মধ্যে টানিয়া আনিলেন, তারা বাধা দিলেন না। ব্রহ্মণ্য মঞ্জুঘোষ, যিনি সাধকবর্গের জড়তা বিনাশ করিয়া তাঁহাদিগকে সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করেন ("জাড্যৌঘতিমির-ধ্বংসী সংসারার্ণবতারকঃ"), বৌদ্ধ মঞ্জুশ্রীর ভূমিকায় হিন্দু-তন্ত্রমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন বটে, কিন্তু 'তারকা' হইবার আশা না দেখিয়া অভিনয় প্রায় ছাড়িয়াই দিলেন। মহাকাল[৯], চামুণ্ডা[১০] প্রভৃতি দেব-দেবীও ছাড়িবার পাত্র-পাত্রী নহেন, পূজার ব্যাপারে ছোট এবং বড় উভয় পক্ষের খাতায়ই নাম উঠাইলেন, এবং তাহাতে তাঁহাদের ভারী সুবিধা হইয়া গেল। প্রথম মহীপালের চতুর্থ রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠাপিত একটি (ব্রহ্মণ্য) বিনায়ক মূর্তির কথা শুনিয়া মনে হয়, গণেশ ঠাকুরও প্রকাশ্যেই বৌদ্ধদের পূজা গ্রহণ করিতেছিলেন। ভাবি, পালশক্তির পরাক্রম আরও কিছুকাল অব্যাহত থাকিলে দৈবত সমাজের আরও কত কীর্তিই না নরলোকে প্রকাশ হইয়া পড়িত। এ সকল কথা দেবতা লইয়া ঠাট্টা তামাসার কথা নয়, এ সবই পাল-যুগে বাঙ্গালার সভ্যতার হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন ধ্বনি মাত্র।

ভারতীয় শৈব ও বৈষ্ণবদিগের দ্বন্দ নিরোধের জন্য যে এক সহজ ও সরল উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছিল, তাহা প্রকটিত হইয়াছে 'হরি-হর' মূর্তির পরিকল্পনায়। এই অদ্বৈত মূর্তিতে হরির বা বিষ্ণুর অর্ধাঙ্গ, এবং হর বা শিবের অর্ধাঙ্গ, নৈপুণ্যে সংযুক্ত। সাহিত্যে 'হরি-হর'

(৯) *Mahābodhi*, Cunningham, 1892, p. 55 দ্রষ্টব্য

(১০) ভারতী, ১৩০৮, পৃঃ ১৫১—১৫২, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

মূর্তির প্রথম উল্লেখ আছে 'হরিবংশে', এবং শিল্পে প্রথম অভিব্যক্তি আছে ৫৭৮ খৃষ্টাব্দে নির্মিত বাদামীর এক গিরিমন্দিরে। অনুমান করিতেছি, বিষ্ণুর বুদ্ধাবতারের মতই, 'হরি-হর' পরিকল্পনাটিও গুপ্ত-যুগেরই অবদান, কারণ এ-ছাড়া অন্য কোনও যুগের এত মাথাব্যথা পড়ে নাই যে এই জাতীয় চিন্তা-ভাবনা লইয়া কাল হরণ করিবে। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকে বিষ্ণু-শিব, হর-অচ্যুত, শম্ভু-বিষ্ণু, শঙ্কর-নারায়ণ প্রভৃতি বিভিন্ন নামে এই হরি-হর মূর্তি কাম্বোজে বা কাম্বোডিয়ায় বিলক্ষণ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল, কাম্বোজীয় রাজা এবং প্রজা উভয়েরই নিকট। কাম্বোডিয়ায় যেমন হরি-হর, নবম হইতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে জাভায় বা যবদ্বীপে তেমনই শিব-বুদ্ধ পরিকল্পনা ন্যূনাধিক জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল[১১]। এই শিব-বুদ্ধ পরিচিন্তন ভারতীয় সাহিত্যে বা ভাস্কর্যে প্রতিফলিত দেখা যায় না, কিন্তু আশ্চর্য, বাঙ্গালা দেশে অন্ততঃ একটি দশম শতাব্দীর চতুর্ভুজ, স্থানক, শিব-মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে যাঁহার মৌলিতে, বৌদ্ধ মূর্তির মতই, একটি ক্ষুদ্রাকৃতি দ্বিভুজ ধ্যানীবুদ্ধ উপবিষ্ট রহিয়াছেন। মূর্তিটি ধাতুময়, আবিষ্কৃত হইয়াছে বরিশাল জেলার কেশবপুর গ্রামে, সংরক্ষিত আছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ চিত্রশালায়। উহার নামকরণ হইয়াছে 'শিব-লোকেশ্বর'। একাদশ শতাব্দীতে বা তন্নিকটবর্তী কোনও সময়ে জাভায় 'কমহাযানিকম্' নামে লিখিত মহাযান-গ্রন্থে

(১১) *Hinduism and Buddhism*, Eliot, Vol. III, pp. 113-14 and 181; also *Asiatic Mythology*, J. Hackin and others, p. 211.

বুদ্ধ ও বিষ্ণুর পরাতত্ত্বের একত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, অর্থাৎ কার্যতঃ বিষ্ণু-বুদ্ধের পরিকল্পনাও পরিগৃহীত হইয়াছে, যদিও সেখানে শিব-বুদ্ধের ন্যায় বিষ্ণু-বুদ্ধতত্ত্ব জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারে নাই। ঢাকা চিত্রশালায় বাখরগঞ্জের লক্ষ্মণকাটির যে অষ্টম-নবম শতাব্দীর গরুড়ের উপর ললিতাসনে উপবিষ্ট বিষ্ণুমূর্তিটি রহিয়াছে, তাঁহারও মূর্ধায় পদ্মাসনে উপবিষ্ট ধ্যানমুদ্রাঙ্কিত একটি চতুর্ভুজ পুরুষমূর্তির ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি রহিয়াছে। এই পুরুষমূর্তিও যে অন্যতম ধ্যানীবুদ্ধ ইহা অনুমান করাই স্বাভাবিক ও সমীচীন, যদিও কেহ কেহ ইঁহাকে যোগাসন-বিষ্ণুমূর্তি বলিতে ইচ্ছুক। অর্ধাঙ্গ শিব ও অর্ধাঙ্গ বুদ্ধ, অথবা দেহার্ধ বিষ্ণু ও অপরার্ধ বুদ্ধ, এরূপ অদ্বৈত-মূর্তি আবিষ্কৃত না হইলেও শিব ও বিষ্ণুর শিরাগ্রে ধ্যানীবুদ্ধের অবস্থানে বাঙ্গালাদেশে হিন্দু জনমতের উপর বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব কিরূপ ক্রিয়া করিতেছিল তাহার আভাস সুস্পষ্ট, এবং এই প্রভাব যে পাল-যুগের 'দুরন্ত বাতাসে' সঞ্জাত, ইহাতে সংশয় নাই। কে বলিতে পারে, হয়ত ধর্মপাল-দেবপাল যুগে শৈলেন্দ্রীয় যবদ্বীপের সহিত বাঙ্গালার যে ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হইয়াছিল, তাহারই প্রবাহে শিব-বুদ্ধ ও বিষ্ণু-বুদ্ধ পরিকল্পনা জাভায় গিয়া উপনীত ও সংবর্ধিত হইয়াছিল। হোক্ বা না হোক্, পূর্ববঙ্গে প্রাপ্ত ও ঢাকা যাদুঘরে সংরক্ষিত, কমঠের চতুরংশ-খোলায় একাদশ শতাব্দীর অক্ষরে উৎকীর্ণ একটি লিপিতে পাওয়া যায়, "নমো ভগবতে বাসুদেবায়। নমো বুদ্ধায়।......সুজিনো জনানাং (বৌদ্ধদিগের

শ্রেয়র জন্য)। ......নমো ভগবতে বাসুদেবায়।"[১২] একই লিপিতে বুদ্ধ ও বিষ্ণুকে এই নমস্কার জ্ঞাপন ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে বাঙ্গালী রামচন্দ্র কবি-ভারতীর 'ভক্তিশতকে'র "বুদ্ধো বা গিরীশো-ঽথবা স ভগবাংস্তস্মৈ নমস্কুর্মহে" এই অতি-প্রসিদ্ধ উক্তি স্মরণ করাইয়া দেয়। 'মহাচীনাচারক্রম' তন্ত্রের প্রথম পটলের এক স্থানে আছে, "ময়ি আরাধনাচারং বুদ্ধরূপী জনার্দনঃ"; দ্বিতীয় পটলে পাই, "কিমিদং ক্রিয়তে কর্ম বিষ্ণুনা বুদ্ধরূপিণা", "জগাম বিষ্ণোঃ সমীপং বুদ্ধরূপস্য পার্বতি", ইত্যাদি। এগুলি বিষ্ণুর বুদ্ধাবতারের কথা নয়,—বিষ্ণু-বুদ্ধের অভিন্নতার কথা, কিন্তু এই ধারণার জন্মদাতা কোন্ যুগ ও কোন্ জাতি?

মুর্শিদাবাদের ঘিয়াসাবাদে প্রাপ্ত, অধুনা ইণ্ডিয়ান্ মিউজিয়ামে রক্ষিত, উরুপর্বা পর্যন্ত বৈজয়ন্তী-শোভিত এবং বিষ্ণুর অন্যান্য বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত এক মূর্তিতে, পাদপীঠে অবলোকিতেশ্বরের অনুগ প্রেত সূচী-মুখের প্রতিমূর্তি খোদিত আছে, এবং ইহাকে 'লোকেশ্বর-বিষ্ণু' মূর্তি আখ্যা দেওয়া হইয়াছে[১৩]। ঐ জেলার সাগরদীঘি অঞ্চলে প্রাপ্ত এবং বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে রক্ষিত, ত্রিভঙ্গ-ভদ্রপীঠের উপর পদ্মপীঠে ত্রিভঙ্গ বা অতিভঙ্গ ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান একটি পিত্তলের ষড়্-হস্ত, সপ্ত-ত্রিশির নাগের আচ্ছাদনবিশিষ্ট বিষ্ণু-(হৃষিকেশ)

---

(১২) *Ann. Rep. of the Dacca Museum* for 1939—40, p. 8.

(১৩) *Eastern Indian School of Mediæval Sculpture*, R. D. Banerjee, p. 125, Pl. XXXVIII (c).

মূর্তিকে বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণির সমস্ত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করা হইয়াছে, এবং ইহাকেও 'লোকেশ্বর-বিষ্ণু' বলা হইয়াছে।[১৪] সুন্দরবনের কাকদ্বীপে আবিষ্কৃত একটি আজানুলম্বিত বনমালা-শোভিত দণ্ডায়মান চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তিতে,—এই মূর্তিটিও সপ্তফণাধর নাগের প্রচ্ছায়ে গঠিত,—না আছে কোনও বাহন, না আছে কৌস্তভ-মণি, না আছে কোনও প্রভামণ্ডলী, না আছে চতুর্হস্তের কোনও হস্তে গদা,— অথচ ইহা বিষ্ণুরই মূর্তি।[১৫] প্রায় অনুরূপ অপর একটি বিষ্ণুমূর্তি রক্ষিত আছে রাজসাহী বরেন্দ্র-অনুসন্ধানসমিতির চিত্র-শালায়; এই মূর্তিটিতে আবার সর্পফণাচ্ছাদনের পরিবর্তে প্রস্তর-খণ্ডের শীর্ষে একটি উপবিষ্ট ধ্যানীবুদ্ধের (অমিতাভের) প্রতিকৃতি খোদিত আছে; মূর্তিটিকে দেখিলে বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রীর বা অপর কোনও বোধিসত্ত্বের মূর্তি বলিয়াই বিভ্রম হয়।[১৬] বরেন্দ্র-অনুসন্ধানসমিতির চিত্রশালায় দিনাজপুর জেলায় প্রাপ্ত একটি বলরামের (অনন্তের ?) মূর্তি আছে, এই মূর্তিটিও ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান এবং ইঁহারও মস্তকোপরি পঞ্চনাগের ফণা রহিয়াছে। শৈল বা ধাতব বৌদ্ধ দেব-দেবীর মূর্তির প্রভাবলীতে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পঞ্চ-ধ্যানীবুদ্ধের প্রতিমূর্তি খোদিত থাকে, বলা বাহুল্য, তাহারই

(১৪) *Handbook to the Sculptures in the Vangīya Sāhitya Parisad*, M. Ganguly, p. 139, Pl. XXXVI.

(১৫) *Varendra Research Society's Monographs*, No. 4, p. 13, fig. 12

(১৬) *Ibid*, pp. 18—23.

অনুকরণে বৈষ্ণব, সৌর ও শৈব মূর্তির চালিতে হিন্দু দেব-দেবীর নানাসংখ্যক ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি ক্ষোদিত করার রীতি উদ্ভাবিত হইয়াছিল; দশাবতারের ক্ষুদ্র প্রতিকৃতিবিশিষ্ট বিষ্ণুমূর্তি ত বাঙ্গালায় (ও মগধে) প্রচুর পাওয়া গিয়াছে, তা'ছাড়া সূর্যের মূর্তিতে একাদশ বা দ্বাদশ আদিত্যের, বিষ্ণুমূর্তিতে সপ্তনাগের, নটরাজ-শিবের মূর্তিতে দশ-নটরাজের, কল্যাণসুন্দর-মূর্তিতে নবগ্রহ এবং কার্তিক-গণেশের, সিদ্ধেশ্বরের মূর্তিতে কেতুবিহীন অষ্টগ্রহের, গণেশমূর্তিতে ষড়-গণেশের, উগ্রতারার মূর্তিতে শিব-ব্রহ্মা-কার্তিকের এবং সম্ভবতঃ গণেশ ও বিষ্ণুরও, চামুণ্ডার মূর্তিতে অস্পষ্ট কতগুলি দেবতার ক্ষুদ্র প্রতিকৃতিশোভিত মূর্তি বাঙ্গালাদেশে, বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গে, বিরল নয়। পক্ষান্তরে, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে রক্ষিত, কিন্তু বিক্রমপুর-সোনারঙ্গে প্রাপ্ত, ভদ্রপীঠের উপর রক্ষিত একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর দণ্ডায়মান, দ্বাদশভুজ ও সপ্তফণানাগের আবরণবিশিষ্ট অবলোকিতেশ্বরের একটি মূর্তির সাধারণ গঠন-ভঙ্গিমা প্রচলিত, স্থানক, বিষ্ণুমূর্তি হইতেই যেন লব্ধ, এবং সাগরদীঘির বিষ্ণুমূর্তির সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য অতিশয় পরিস্ফুট। আদিতে স্থাপত্যের জন্য, খিলানের মধ্যশীর্ষকে শোভনশীল করার উদ্দেশ্যে, গুপ্ত-পরযুগে বাঙ্গালায় ও মগধে 'কীর্তিমুখ' নামক যে মাঙ্গলিক অলঙ্করণ-চিহ্ন উদ্ভাবিত হইয়াছিল, তাহা উত্তরকালে নানারূপে বিবর্তিত হইয়া, স্থাপত্য হইতে প্রতিমার প্রভাবলীর শীর্ষে গিয়া স্থান লাভ করিল, এবং উড়িষ্যা ও ভারতীয়

দ্বীপপুঞ্জে এবং এমন কি দাক্ষিণাত্যের[১৭] ও পশ্চিম-ভারতের অনেক মূর্তিতে ও মন্দিরে[১৮] উহার ব্যবহার ব্যাপ্তি লাভ করিল। এই 'কীর্তি-মুখ' ছিল প্রথমতঃ শৈব লাঞ্ছন,[১৯] পরে বৈষ্ণবীয় মূর্তিতে ইহার যথেচ্ছ প্রচলন দৃষ্ট হয়। বাঙ্গালার সামান্য সংখ্যক অ-বৌদ্ধ মূর্তিরই প্রস্তরশীর্ষে 'কীর্তিমুখে'র পরিবর্তে 'ছত্র' (যথা, বিক্রমপুর-বাঘরার হলধর বা বাসুদেবমূর্তি[২০], ঢাকা-আবদুল্লাপুরের নরসিংহমূর্তি, বরিশাল-কাশীপুরের নীলকণ্ঠমূর্তি), 'পঞ্চাম্র' স্তবক'[২১] (যথা, আউটসাহীর নর্তন-গণেশ, রাজসাহী-মান্দার নর্তন-গণেশ, ইণ্ডিয়ান্ মিউজিয়ামের ৫৬২৫ সংখ্যক বানগড়ে প্রাপ্ত নর্তন-গণেশ মূর্তি ইত্যাদি) বা 'পদ্ম' (যথা, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের $\frac{F(b) 2}{384}$ সংখ্যক বরাহমূর্তি, $\frac{F(a) 7}{10}$ সংখ্যিত বিষ্ণুমূর্তি ইত্যাদি) ক্ষোদিত আছে। আশ্চর্য, 'কীর্তিমুখ' কালক্রমে তাহার মৌলিক সাম্প্রদায়িক বিশিষ্টতা এমনই হারাইয়া ফেলিল যে গৌড়ীয়

(১৭) *Elements of Hindu Iconography*, Gopinath Rao, Vol. I, Part II, 1914, Pls. XCIII (2), XCI, etc.; Vol. I, Part I, Pls. XLII, LXXII (2), etc.; *South Indian Images of Gods and Goddesses*, H. Krishna Śāstrī, 1916, Pls. 16, 18, 31, 74, 111, 115, 117, 138, 151 etc.

(১৮) *History of Fine Arts in India and Ceylon*, V. A. Smith, 2nd. ed., p. 86.

(১৯) *Rupam*, 1920, pp. 11 ff.

(২০) *Ann. Rep. Dacca Museum*, 1940-41, p. 4.

(২১) *Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum*, N. K. Bhattasali, (এখন হইতে *Dac. Cat.*), p. 146, Pl. LVI (a).

শিল্পরীতির পীঠভূমি বাঙ্গালার এবং মগধেরও কয়েকটি বৌদ্ধ মূর্তির শিরোদেশে উহা মাঙ্গলিক লাঞ্ছনরূপে শোভা পাইতে লাগিল। হিল্‌সায় প্রাপ্ত দেবপালের ৩৫ রাজ্যাঙ্কে নির্মিত তারামূর্তিতে[২২], ইণ্ডিয়ান্ মিউজিয়ামের বিহারে প্রাপ্ত দ্বিভুজ বৃহদায়তন মঞ্জুশ্রীর মূর্তিতে (৩৮০৩ সংখ্যক),[২৩] বোধ্‌গয়ার মায়াদেবী ও পদ্মপাণি মূর্তিদ্বয়ে,[২৪] এবং ত্রিপুরা জেলার পাইওর গ্রামের বুদ্ধমূর্তিতে, ঢাকা-সোমপাড়ার তারামূর্তিতে, পূর্ববঙ্গের কোথাও আবিষ্কৃত একটি হারিতী (?) মূর্তিতে ও এইরূপ আরও কোনও কোনও বৌদ্ধ মূর্তিতে 'কীর্তিমুখ' রহিয়াছে। আবার, যেমন কতগুলি ব্রাহ্মণ্য-মূর্তিতে 'কীর্তিমুখ' নাই, ফরিদপুর-উজানি গ্রামে প্রাপ্ত মারিচী-মূর্তির, পণ্ডিতসারের মারিচীমূর্তির প্রভৃতির শীর্ষে ধ্যানীবুদ্ধও নাই, —যদিও আছে বৌদ্ধত্বব্যঞ্জক একটি চৈত্য। পাহাড়পুরের হিন্দু-মন্দির যখন সোমপুরী-বিহারে পরিণত হইল, বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ হিন্দুর দেব-দেবীর মূর্তিরাজিকে বিক্ষত করেন নাই, বিখণ্ডিত করেন নাই, অপসারিতও করেন নাই, ঐগুলির অবস্থানে তাঁহাদের মহাবিহারের পবিত্রতা একটুও অশুদ্ধ হইয়া যায় নাই।

(২২) *Art of the Pal Empire*, J. C. French, Pl. IX.

(২৩) *Buddhist Iconography*, Benoytosh Bhattacharyya, Pl. XV (c).

(২৪) *Bodh Gaya*, R. L. Mitra, Pl. XXVI, fig. 3, and Pl. XXXII, fig. 3.

এই এতগুলি উদাহরণের কোনওটিই অকিঞ্চিৎকর নয়, অকস্মাদুৎপন্ন নয়। বাঙ্গালার ইতিহাস প্রশ্ন করে, সবিনয়ে নয়, সঙ্কোচে নয়, প্রশ্ন করে সাহঙ্কারে,—অন্য কোন্ প্রদেশের, কোন্ যুগের ইতিহাস এত কম্র, এত শুভ্র, এত স্মিত? এই প্রশ্ন করার অধিকার পাল-যুগের বাঙ্গালার ভূয়োভূয়ঃ আছে। ইতিহাস উচ্ছ্বাসের স্থান নয়, নইলে হয়ত বলিতাম, এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য প্রতীক্ষা করিতে হইবে,—ভূমণ্ডলের কোনও স্থানবিশেষে এমনই স্তন্যবাহিনী মাটির কোলে আবার এক পাল-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, আবার সেই মিলন-গৃধ্নু প্রজালোক সৃষ্টি করিতে হইবে, আবার অন্ততঃ সার্ধ-তিন শতাব্দীর এক নূতন ইতিহাস কোনও নূতন বংশধরকে নূতন দিনের আলোয় বসিয়া লিখিতে হইবে, তবে উত্তর মিলিবে। হয়ত বলিতাম, সার্ধ-তিন শতাব্দী ধরিয়া গণতা কোন্ নিতলে ডুবিয়া গিয়াছিল, সেই নূতন বংশধর আসিয়া তুলনায় তাহা স্থির করিবে।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব, বহু পূর্ব, হইতেই বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে এক বিরাট ও অভিনব পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। এবং সেই পরিবর্তিত ধর্মমতই বাঙ্গালাদেশের ও মগধের চারি শতাব্দীর বৌদ্ধ ধর্মের মুখ্য ইতিহাস রচনার জন্য দায়ী। সোজা ভাষায় ইহার নাম তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম। 'তন্ত্র' শব্দের প্রাথমিক বা আদিম অর্থ যাহাই হোক্ না কেন, তান্ত্রিক সাধনা বলিতে সাধারণতঃ আমরা বুঝিয়া থাকি কোনও সাধকের একাকী বা নারীপ্রকৃতি-সহ-

একত্র মন্ত্র, মুদ্রা, মণ্ডল, ন্যাস প্রভৃতি দ্বারা কোনও শক্তি-সহ-দেবতার বা কেবলমাত্র শক্তির বা স্ত্রী-দেবতার পূজাকে ; এবং এই পূজার ও সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানগুলির সবই গুহ্য। এইরূপ পূজার প্রথা কবে এবং কি প্রকারে গৌতম বুদ্ধের প্রবর্তিত ধর্মে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, তাহা নিরূপণ করা আধুনিক জ্ঞানে অসম্ভব। বুদ্ধের সময় হইতেই বৌদ্ধেরা তন্ত্র-মন্ত্রের অনুশীলন করিতেন, এবং স্বয়ং বুদ্ধকে মন্ত্র, মুদ্রা, ধারণী, যোগ, সমাধি প্রভৃতি দিয়া এক শ্রেণীর শিষ্যগণকে সন্তুষ্ট রাখিতে হইয়াছিল, [২৫] এই উক্তি গ্রহণযোগ্য নয়, শত শান্ত রক্ষিত ও কমলশীলের দোহাই দিয়া করিলেও এই উক্তি অবিশ্বাস্য। সকলেরই স্মরণ রাখা কর্তব্য, তান্ত্রিকতা মূল বৌদ্ধ ধর্মের (কিংবা মহাযানেরও) কোনও অচ্ছেদ্য বা মৌলিক অঙ্গ নয়, অথবা ইহাদের কোনও শাখাও নয়। হয় ভারতবর্ষের মধ্যেই, না হয় ভারতের বাহিরে, কোথাও তান্ত্রিক ধারণাগুলি পরিপুষ্টি লাভ করিয়া এক পথে হিন্দুধর্মে ও অপর পথে বৌদ্ধধর্মে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, এবং এই দুই ধর্মই নিজ নিজ শক্তি, সামর্থ্য ও প্রয়োজন অনুসারে ঐ ধারণাগুলি ক্রমে ক্রমে সংশোধিত, পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত করিয়া লইয়াছিল। জনশ্রুতি অনুসারে, গান্ধারের অসঙ্গ, শুধু শক্তিতত্ত্ব নয়,—পার্বত্য ও অনুন্নত জাতিসমূহকে বৌদ্ধধর্মের গণ্ডীর মধ্যে আকর্ষণ করিবার জন্য—মাতৃকা, যোগিনী, ডাকিনী ভূত,

(২৫) *Two Vajrayāna Works*, ed. Benoytosh Bhattacharyya, Intro. p. x.

পিশাচ, যক্ষ, রক্ষ, এবং মন্ত্র, যন্ত্র, মণ্ডল, ধারণী প্রভৃতিও মহাযানের মধ্যে অনুপ্রবেশ করাইয়াছিলেন। অসঙ্গের আগেও ভারতে আগম-শাস্ত্রের অভাব ছিল না, বহু আগম রচিত হইয়াছিল, এবং খুব সম্ভবতঃ মন্ত্রের মাহাত্ম্যেও এক শ্রেণীর বৌদ্ধ বিশ্বাসী হইয়া পড়িয়াছিল। বোধ হয়, প্রথমতঃ সূত্রগুলিই মন্ত্রের কাজ করিত, তারপর 'ধারণী' (যে সকল গূঢ়ার্থক অক্ষর সাধকের ধর্মজীবন ধারণ করার শক্তি রাখে) ও 'বীজ' আসিল। কিন্তু তখনও 'মন্ত্রযান' বলিয়া একটি স্বতন্ত্র যানের উৎপত্তি হয় নাই। মন্ত্রযানের উৎপত্তি হইল মহাযান হইতে। যে মহাযান বড় গলায় বলিয়াছিল, আমি সকলের কল্যাণের জন্যই আবির্ভূত হইয়াছি, সর্বভূতের মঙ্গলবিধানই আমার উদ্দেশ্য, সেই ধর্ম স্বভাবতঃই টানিয়া আনিবার প্রয়াস করিতে লাগিল নিজের পরিবেশের মধ্যে সকলকে, প্রত্যেককে। এই প্রকার জনপ্রিয়তা অর্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষার ফলে হইল কি, এমন কতগুলি লোক ইহা গ্রহণ করিল যাহারা নিতান্তই অতি সাধারণ স্তরের। নাগার্জুনের শূন্যবাদ (অর্থাৎ, ব্যবহারিক দৃষ্টিতে দুঃখ, সংসার, কর্ম, কর্মফল প্রভৃতি সবই আছে, কিন্তু পরমার্থতঃ এ-সমস্তই শূন্য, এবং স্বভাব-শূন্যতাই বা সংসারের অসংস্কৃত অবস্থাই নির্বাণ), ও অসঙ্গ-বসুবন্ধুর বিজ্ঞানবাদ (অর্থাৎ, ধর্মসমূহ বিজ্ঞানমাত্র বা চিত্তমাত্র, এবং চিত্তমাত্রতাই ধর্মসমূহের আত্যন্তিক অবস্থা বা ধর্মধাতু, যাহা প্রত্যক্ষ হইলেই দ্বয়জ্ঞান বিনষ্ট হইয়া অ-দ্বয়জ্ঞান লাভ হয়), ইত্যাদি পারমার্থিক

সত্য সম্বন্ধে দার্শনিক আলোচনা এবং সাধনমার্গের নানা স্তর-নির্দেশ এই সকল সাধারণ লোকের নিকট দুর্বোধ্য বা অজ্ঞেয় তত্ত্বরূপেই প্রতিভাত হইতে লাগিল। তখন, হারাই হারাই ভয়ে, ইহাদের পরিতুষ্টি সাধনের জন্য মহাযানকে ভারতীয় ধর্ম-জগতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রচলিত কতগুলি সাধারণ নিয়মের আশ্রয় লইতে হইল, সেগুলি আর কিছুই নয়, নানা দেব-দেবীতে বিশ্বাস, তাঁহাদের পূজার জন্য নানাপ্রকার মন্ত্র ও তৎসহ নানা প্রকার আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকে অনুমোদন। মন্ত্র প্রভৃতি যখন বৌদ্ধধর্মে বিধিসঙ্গত ভাবে প্রবেশ লাভ করিয়াই বসিল, তখন মন্ত্রের মাহাত্ম্য এক শ্রেণীর বৌদ্ধাচার্যকে পাইয়া বসিল। ক্রমশঃ তাঁহাদের ধারণা হইল, মন্ত্রই বুদ্ধত্ব লাভের প্রকৃষ্ট উপায়। সম্ভবতঃ এই শ্রেণীর বৌদ্ধদের চেষ্টাতেই মন্ত্র ও ধারণী উত্তরোত্তর জনপ্রিয় হইয়া উঠিল[২৬]। মহাযান তখন দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গেল,—পারমিতা-নয় ও মন্ত্র-নয়। মন্ত্র-নয় বা মন্ত্রযান তখন আর সর্ব-সাধারণের জন্য নয়, মন্ত্রযানের সূক্ষ্ম ও গভীর তত্ত্বগুলি সর্বসাধারণের ধারণা ও বুদ্ধির অগম্য হইয়া উঠিল, মন্ত্রযান তখন কেবল ঊর্ধ্বস্তরের সাধকদের জন্য অঙ্কিত হইল। এই মন্ত্রযানই তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রথম স্তর। ইহার পরের স্তরে 'মহাসুখবাদ' যুক্ত হইয়া 'বজ্রযানে'র আবির্ভাব ঘটাইল।

---

(২৬) *Journal Asiatique,* Tome CCXXV, No. 2, *Buddhistic Researches,* by Rahula Sankrityana.

বুদ্ধের আবির্ভাব কালে ভারতীয় যোগপন্থা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। এক পন্থায় ছিল আত্মনিগ্রহ ও অপর পন্থায় ছিল কামসুখোদ্রেক বা কামবিলাস (মৈথুন)। এক পন্থার মুখ্য আদর্শ ও উদ্দেশ্য ছিল, দুঃখের দ্বারা অর্থাৎ দেহ-নিপীড়ণ দ্বারা (আত্মিক) সুখ লাভ করা (দুঃখেন সুখং অধিগন্তব্যম্)। অপর পন্থার আদর্শ ছিল, সুখের দ্বারা, অর্থাৎ সকল বিষয়ে সুখ বা আনন্দের অনুভূতির দ্বারা পরমসুখ বা পরমানন্দ লাভ করা। বুদ্ধদেব এই দুইয়ের মধ্যে একটা মধ্যযোগপন্থার নির্দেশ করিলেন। আত্মশোধন, চরিত্রশোধন, চিত্তবিশুদ্ধিসাধন, দৃষ্টিশোধন ইত্যাদি দ্বারা আত্ম-বিশুদ্ধি লাভ করাই ছিল ইহার উদ্দেশ্য। কিন্তু পরবর্তীকালের বৌদ্ধসাধকগণ বলিলেন, যেরূপ ময়লা বস্ত্র পরিষ্কার করিতে হইলে ক্ষারাদি কতগুলি ময়লা সামগ্রীর আশ্রয় লইতে হয়, আত্মবিশুদ্ধি লাভ করিতে গেলেও সেইরূপ ব্যক্তিভেদে কতগুলি অশুদ্ধ কার্যের, আপাতদৃষ্টিতে অশোভন বলিয়া মনে হইলেও, আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। প্রাক্-বুদ্ধ কামবিলাস-পন্থার ধারা শৈব-তন্ত্রের মধ্যে প্রবাহিত ছিল। উহাদের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিতে গিয়া পরবর্তী বজ্রযানীয় প্রভৃতি বৌদ্ধদের মধ্যেও কোনও কোনও যোগপন্থার ভিতরে কামবিলাস-পন্থা বা সুখপন্থা অনুসৃত হইতে এবং উত্তরোত্তর বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিতে লাগিল।

এই 'মহাসুখবাদ' নামক বাদের বা তত্ত্বের প্রাদুর্ভাবের ফলে নির্বাণের পর তিন অবস্থা দাঁড়াইল,—শূন্য, বিজ্ঞান ও মহা-

সুখ। শান্ত, উৎপত্তি-বিনাশহীন, প্রপঞ্চ (মায়া) দ্বারা অপ্রপঞ্চিত (অকলুষিত) যে শূন্যতা বা নির্বিকল্পজ্ঞান, তাহার স্থলে সাধারণের বোধগম্যের জন্য 'নিরাত্মা' শব্দের আমদানী করা হইল। এই 'নিরাত্মা'র মধ্যেই আত্মা লয় প্রাপ্ত হয়। 'নিরাত্মা'কে দেবী-রূপে কল্পনা করিয়া বলা হইল, বোধিচিত্ত নিরাত্মার আলিঙ্গন-বদ্ধ হইয়া এবং নিরাত্মাতেই লীন হইয়া 'মহাসুখ' লাভ করে। নির্বাণের এই ব্যাখ্যা হইতেই 'বজ্রযানে'র উৎপত্তি হইল। বজ্রযান মন্ত্রযানেরই একটা ধারা মাত্র। 'বজ্র'কে আশ্রয় করিয়া যে যানে বা পথে নির্বাণ লাভ করা যায় তাহাই হইল বজ্রযান। বোধিচিত্তই বজ্র, "বোধিচিত্তং ভবেৎ বজ্রম্"। কঠোর যোগ-সাধনার দ্বারা বোধিচিত্ত স্থিরস্বভাব প্রাপ্ত হইলে, উহা বজ্রস্বরূপ হয়, বজ্রের মত কাঠিন্য লাভ করে; উহাকে তখন ভেদ করা যায় না, দাহন করা যায় না, ছেদন করা যায় না। বোধিচিত্ত এইরূপ বজ্রস্বভাব প্রাপ্ত হইলে সাধক বোধিজ্ঞান বা তথাগতজ্ঞান লাভ করেন। 'বোধি-চিত্ত' কি? ইহা চিত্তের বা মনের সেই বৃত্তি বা অবস্থা, যাহাতে কেবলমাত্র বোধি, অর্থাৎ সম্যক ও পূর্ণজ্ঞান, লাভের দৃঢ় সঙ্কল্প বিদ্যমান থাকে। এই বোধিজ্ঞান লাভের সঙ্কল্পের সহিত আবার সর্ব-জনীন করুণার একটা আবেগময় আকাঙ্ক্ষা বিজড়িত থাকে। কাজেই 'বোধিচিত্ত' বলিতে চিত্তের দুই উপাদানকে পূর্বসূচনা করে,—শূন্যতা (সকল বস্তুর স্বভাবই হইতেছে অবিমিশ্র বা বিশুদ্ধ শূন্য এই জ্ঞান) এবং করুণা। শূন্যতা ও করুণা, এই দুই উপাদান সহ

বোধিচিত্তের উদয় হইলে, বোধিচিত্ত তখন ঊর্ধ্বদিকে ধাবমান হইয়া, স্তরের পর স্তর পার হইয়া, সাধনার শেষ স্তরে উপনীত হয়। কিন্তু বজ্রযানীদের ধারণায়, মৈথুন সহকারে যোগ দ্বারা চিত্তের যে চরম আনন্দময় অবস্থা উৎপন্ন হয়, তাহাই হইল বোধিচিত্ত। তাঁহারা কহিলেন, স্বভাবজাত শক্তি ও ইন্দ্রিয়সমূহকে সম্পূর্ণ দমন করিতে না পারিলে বোধিজ্ঞানের উদয় হইতে পারে না। সেগুলিকে দমন বা বশীভূত করিতে গেলে আগে সেগুলিকে উদ্বুদ্ধ বা জাগরিত করিয়া লইতে হয়। তাঁহারা আরও বলিলেন, মন্ত্রশক্তির নিয়োগে যেমন বোধিসত্ত্ব অবস্থাকে স্থায়ী করা যায়, তেমনই ইন্দ্রিয় ও শক্তিনিচয়কে বশীভূত করিয়া বোধিজ্ঞানও লাভ করা যায়। মন্ত্র শব্দবীজ। সাধকের সাধনার জোরে শব্দবীজ মূর্ত হইয়া উঠে, এবং তখনই নানা দেব-দেবীর উৎপত্তি হয়। এই জন্যই দেখা যায়, বজ্রযানে অসংখ্য দেব-দেবীর অধিষ্ঠান। ইঁহাদের উপলক্ষ্য করিয়া বজ্রযানে এক বিরাট পূজা-পদ্ধতি গড়িয়া উঠিল। ইঁহাদের আবাহনের জন্য বহু মুদ্রা বা করন্যাসের সৃষ্টি হইল। এই ভাবে তিন ম'-কার, মন্ত্র, মুদ্রা আর মণ্ডল (অর্থাৎ সাধনায় দেব-দেবীগণ আবির্ভূত হইয়া যে নির্দ্দিষ্ট স্থানে বা অঙ্কিত যন্ত্র-মণ্ডলে আসিয়া অবস্থিতি করেন), এই সাধন-পদ্ধতির অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য অঙ্গ হইয়া উঠিল। কিন্তু এই গুহ্য সাধন-পদ্ধতিতে যে সকল পারিভাষিক শব্দ সাধারণত প্রয়োগ করা হয়, তাহা দীক্ষিত সাধকই

গুরুর সাহায্যে বুঝিতে পারেন, অপরের পক্ষে অনুধাবন করা অসম্ভব-প্রায়।

বজ্রযানের আর একটি সাধনপন্থা কালচক্রযান। এই মতাবলম্বী সাধকদের নিকট করুণাত্মক কালচক্রই শূন্যতা, অর্থাৎ শূন্যতা হইতে কালচক্র অভিন্ন। কালচক্রের সহিত তাঁহার শক্তিরূপে সংযুক্ত ভগবতী প্রজ্ঞা, যিনি সাকার ও নিরাকার উভয়বিধই। সর্বজ্ঞ কালচক্রই আদিবুদ্ধ এবং সকল বুদ্ধের জনক। অর্থাৎ ভগবতী প্রজ্ঞার সহিত সম্মিলিত হইয়া আদিবুদ্ধ কালচক্র লোকহিতার্থে 'অসংখ্য সম্ভোগকায় ও নির্মাণকায় বুদ্ধ সৃষ্টি করেন। কালচক্রের মধ্যেই ত্রিকাল—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান, নিহিত। কালচক্রযায়িগণ সাধন বিষয়ে বার, তিথি, নক্ষত্র, যোগ, করণ, রাশি প্রভৃতির বিচারের প্রতি অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন, এবং গ্রহ নক্ষত্রের গতি অনুসারে তাঁহাদের সর্ববিধ কর্ম নিয়ন্ত্রণ করিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু এই জন্যই এই যানের নাম হইয়াছে কালচক্রযান, এই ধারণা ভুল। সর্বভুক্ ও আত্মভুক্ কালকে গ্রাস বা ভক্ষণ করিয়া কালগ্রাসী বা কালভুক্ হওয়াই ভারতীয় যোগী ও বৌদ্ধ সাধকদের উদ্দেশ্য ছিল। কালচক্রযান সেই পূর্ব যোগ-সাধানারই এক বিশিষ্ট পরিণতি। কাল-চক্রযানীদের উদ্দেশ্য সেই কালকে নিরস্ত করা, এবং নিজেকে কালের চক্রের বা আবর্তের সকল প্রভাবের উর্ধ্বে রাখা। সেই কালই হইল আসলে আমাদের মূল প্রাণক্রিয়া। কালচক্রযায়িগণ যে সাধন বিষয়ে বার, তিথি, নক্ষত্র প্রভৃতি বিচারের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী,

তাহার কারণ, এই সমস্ত কালবিভাগ হইতেছে এই প্রাণক্রিয়ারই দ্যোতক বা জীবনীশক্তির কার্যেরই ব্যঞ্জক। অন্যান্য সম্প্রদায়ের তন্ত্রের ন্যায় ইঁহারাও স্বীকার করেন যে, আমাদের এই দেহ সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র সংস্করণ মাত্র। কাজেই সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সম্বন্ধে যে সকল কার্য নিরন্তর চলিতেছে, আমাদের জীবনের মধ্যেও সেইরূপ কার্যই চলিতেছে। অতএব কার্যের মধ্যেই কালের প্রকাশ, ও কার্য নিয়াই কালের ধারণা। কার্য বন্ধ করিতে পারিলেই কালও রুদ্ধ হইয়া যায়। যোগসাধনার দ্বারা প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান,—শরীরের অভ্যন্তরস্থ এই পঞ্চ বায়ুর স্থিরীকরণ করিতে পারিলে, কালকে দমন, কালকে জয়, করার পথ সুগম হয়। কালচক্রযানীদের সাধন সংক্রান্ত আর সমস্ত ব্যাপার বজ্রযানীদেরই মত। গ্রহ-নক্ষত্রের গতি বুঝিতে গণিতের প্রয়োজন, এজন্য তাঁহাদের মধ্যে যথেষ্ট গণিতের চর্চা হইত।

তান্ত্রিক সাধনার আর একটি ধারা সহজযান, এবং ইহা মন্ত্রযান, বজ্রযান, কালচক্রযান, পূর্ব-বোধিসত্ত্বযান ও হীনযানের বিরুদ্ধে প্রতি-ক্রিয়ার ফল। এই প্রতিক্রিয়া কতদিনের পুরাতন, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। আর্যদেব, কাহ্ন, সরহ, লুই প্রভৃতি সিদ্ধাচার্যগণ সন্ধা ভাষায় যে সকল চর্যা বা গান লিখিয়াছিলেন, এবং কাহ্নু, সরহ, তিলোপাদ প্রভৃতি সহজ-সিদ্ধগণ অপভ্রংশে যে সকল দোহা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে এই মতাবলম্বিগণের সম্বন্ধে কিছু কিছু ধারণা করা যায়। সহজযানী বৌদ্ধেরা পূজার্চনা বা মন্ত্রজপে একটুও বিশ্বাস করিতেন না,

তাঁহাদের সাধনায় বাহ্যানুষ্ঠানের কোনও স্থান বা মূল্য ছিল না। বরঞ্চ, ব্রাহ্মণাদি যাঁহারা এ সকল করিতেন, তাঁহাদের তাঁহারা বিদ্রূপই করিতেন। যে সকল বৌদ্ধ প্রবজ্যা, শাস্ত্রপাঠ, মন্ত্রজপ ও পূজার্চনা করেন, তাঁহারাও তাঁহাদের মতে শুধু বৃথা সময়ই নষ্ট করেন, সিদ্ধিলাভ তাঁহারা করিতে পারেন না। সহজযানীরা শ্রমণপন্থিগণের ও শ্রাবকযানাশ্রিতগণের নিন্দায়ও মুখর ছিলেন। তাঁহাদের দুঃসাহসিক ধারণায় পরমতত্ত্ব অন্যেতর লোকের কা কথা, স্বয়ং বুদ্ধেরও অজ্ঞাত ছিল,—

"বুদ্ধোঽপি ন তথা বেত্তি যথায়মিতরো নরঃ।"

সহজতন্ত্রের মতে, সকলেই যখন বুদ্ধত্ব লাভ করিবার অধিকারী, তখন মানুষী বা ঐতিহাসিক বুদ্ধের বিশেষত্বই বা কি, তাঁহাকে 'অলৌকিক', 'অবতার' প্রভৃতি বলিয়া স্বীকার করার প্রয়োজনই বা কি? কাজেই ইঁহারা বাহিরের বুদ্ধকে না মানিয়া দেহের মধ্যস্থিত বুদ্ধেরই চিন্তন করিয়াছেন,—

দেহহি বুদ্ধ বসন্ত ণ জাণই। (সরোজবজ্রের 'দোহাকোষ', পৃঃ ১০৭)

দেহস্থিতং বুদ্ধত্বং। (অদ্বয়বজ্রের টীকা)

পরবর্তীকালে বৈষ্ণব সহজিয়ারাও "দেহের মাঝে বৃন্দাবনে"র কল্পনা করিয়াছেন। এইরূপে শূন্যবাদ বা বিজ্ঞানবাদের স্থান দেহবাদ আসিয়া অধিকার করিল।

সহজ অবস্থায় উন্নীত হইলে সাধকের মায়াময় সংসারের জ্ঞান সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়, সংস্কার বিনষ্ট হইয়া যায়, আত্ম-পর জ্ঞান

লোপ পায়। এই অবস্থা ক্রমে এমন এক সুখে গিয়া ঠেকে, যে সুখের সাগরে ডুব দিয়া সাধক উদ্‌ভ্রান্তের মত অবস্থান করেন। বহির্জগতের কোনও কিছুই তখন তাঁহাকে সেই সহজ সুখ হইতে স্খলিত করিতে পারে না। সেই পরম মহাসুখই এক-মাত্র সত্য, একমাত্র ধ্রুব। সেই সুখ উপলব্ধি হইলে ইন্দ্রিয়শক্তি বিলোপ পায়, সহজকারের উন্মেষ হয়। সেই অবস্থা লাভ করিতে পারিলেই মুক্তি, না পারিলে সাধকের মুক্তির কোনও সম্ভাবনা নাই। যে শূন্যতা ও করুণার মিলনে বোধিচিত্ত উৎপন্ন হয়, সহজযানীদের মতে, সেই শূন্যতা প্রজ্ঞা ও করুণা উপায়, শূন্যতা ক্ষেত্র ও করুণা বীজ, শূন্যতা প্রকৃতি ও করুণা পুরুষ। কিন্তু একবার যখন 'পুরুষ' ও 'প্রকৃতি' এই দুই শব্দ ধর্মের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল, তখন ধর্মের চেহারাটাই গেল বদ্‌লাইয়া। শূন্যতা ও করুণার মিলনে যে বোধিচিত্তের জন্ম হয়, সেই স্থলে যোগসাধনায় নারী ও পুরুষের মিলনে যে অনির্বচনীয় সুখের উৎপত্তি হয়, সেই সুখই সহজ-ধর্মীদের কাম্য হইয়া উঠিল মুক্তির বাহনরূপে।

বজ্রযান, কালচক্রযান ও সহজযান, এই তিনের উদ্ভব যখনই হইয়া থাকুক না কেন, বাঙ্গালাদেশের পাল-যুগীয় বৌদ্ধধর্মে এই তিন যান প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, এবং বলিতে গেলে এই তিন যানের ইতিহাসই এই যুগের বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্মের বার-তের আনা ইতিহাস। এই যানগুলিকে কেন্দ্র করিয়া বাঙ্গালাদেশে একটা বিরাট সাহিত্যও রচিত হইয়াছিল। একটা কথা স্মরণ

রাখিতে হইবে, এই তিনটি স্বতন্ত্র নামধেয় যান হইলেও, এগুলি মুখ্যতঃ একই ভাবধারা হইতে উৎপন্ন, এবং একই ব্যক্তির পক্ষে বিভিন্ন যানের উপর পুস্তক রচনা কঠিনও ছিল না, তাহাতে বাধাও কিছু ছিল না। কাজেই কোন গ্রন্থ-বিশেষ দেখিয়া গ্রন্থকর্তার মুখ্য যান নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। এই যানগুলির মতবাদের অনেকাংশ পরস্পর পরস্পরের সহিত এত সংশ্লিষ্ট যে অনেক সময় তাহাদের মধ্যে সূক্ষ্ম সীমারেখা অঙ্কিত করা দুরূহ। আবার এই পাল-যুগেই আর একটা ধর্মমতও কম লোকপ্রিয় হইয়া উঠে নাই, তাহার নাম নাথ-ধর্ম। নাথ-পন্থিগণের মতের সহিত তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের সাদৃশ্য এত বেশী যে অনেকে মনে করেন যে উহা সম্ভবতঃ বজ্রযান হইতেই উদ্ভূত। ইহা যদি না-ও হয়, নাথ-পন্থিগণের ধর্ম আদিতে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণের মতের দ্বারা যে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। সিদ্ধাচার্যগণের ন্যায় নাথগণও বর্ণাশ্রমকে অস্বীকার করিয়াছেন। কোনও কোনও সিদ্ধাচার্যকেও নাথগণ নিজেদের আচার্য বলিয়া আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছেন। ইঁহাদের কতগুলি ক্রিয়াকলাপ আবার কৌলধর্ম অথবা তান্ত্রিক শৈবধর্ম হইতে গৃহীত। নানা প্রকার যোগে, বিশেষতঃ হঠযোগে, ইঁহারা খুব সিদ্ধ ছিলেন। সম্ভবতঃ নাথগণ তারারও উপাসনা করিতেন। উপাখ্যান অনুসারে, নাথদের মৎস্যেন্দ্রনাথ বাখরগঞ্জের চন্দ্রদ্বীপের একজন ধীবর ছিলেন। কাহারও কাহারও মতে চন্দ্রদ্বীপের মৎস্যেন্দ্রনাথই নাকি রাঢ়ের সিদ্ধাচার্য

লুইপাদ[২৭]। মীননাথকেও কেহ কেহ মৎস্যেন্দ্রনাথের সহিত অভিন্ন মনে করেন, কিন্তু 'তেঙ্গুরে' একস্থানে স্পষ্টই আছে মীনপাদ মৎস্যেন্দ্রনাথের পিতা এবং তাঁহার নামান্তর ছিল বজ্রপাদ ও অচিন্ত্য। মৎস্যেন্দ্রের শিষ্য গোরক্ষনাথ একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বঙ্গাল-দেশের রাজা গোপীচন্দ্রের বা গোবিন্দচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন। মৎস্যেন্দ্রনাথকে তাহা হইলে দশম শতাব্দীর শেষের লোক বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। মৎস্যেন্দ্রের অবতারিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে সংস্কৃতে রচিত পাঁচখানি গ্রন্থ নেপাল হইতে উদ্ধার করিয়া প্রকাশিত করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে 'কৌলজ্ঞান নির্ণয়ে' দেখা যায় মৎস্যেন্দ্রনাথ সিদ্ধ বা সিদ্ধামৃত সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। নেপালে মৎস্যেন্দ্র অব-লোকিতেশ্বরের অবতার বলিয়া পূজিত হন। 'তেঙ্গুরে'র একস্থানে জালন্ধরিপাদকে 'আদিনাথ' বলিয়া বর্ণিত দেখিতে পাই।[২৮] ইহা হইতে মনে হয়, জালন্ধরিপাদ মীননাথ ও মৎস্যেন্দ্রনাথেরও পূর্বে ছিলেন এবং মৎস্যেন্দ্রনাথই নাথ-ধর্মের প্রবর্তক নহেন। এক বিবরণে জালন্ধরিপাদ অষ্টম শতাব্দীর উড্ডিয়ান-রাজ ইন্দ্রভূতির শিষ্য। কিন্তু অপরাপর বিবরণে, জালন্ধরিপাদই রাজা গোপীচাঁদের গুরু হাড়ি-পা, এবং তিনি ছিলেন গোরক্ষনাথের শিষ্য। কাশ্মীর ও পাঞ্জাবের মধ্যে জলন্ধরে অনেকদিন অবস্থান করার জন্য তাঁহার নাম হইয়াছে জালন্ধরিপাদ, তারনাথের গ্রন্থে এরূপ একটা কথা আছে। কিন্তু মৎস্যেন্দ্রনাথ বাঙ্গালী হইলেও, জালন্ধরিপাদ, গোরক্ষ-

(২৭) *HBDU.*, p. 342.

(২৮) *Cordier*, III, p. 113.

নাথ, চৌরঙ্গীনাথ প্রভৃতি নাথ-যোগিগণ বাঙ্গালী ছিলেন এরূপ মনে করার হেতু নাই। অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত, মৃত্যুর পর, দেহ হইতে আত্মা বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর, মুক্তিলাভ হয়, এরূপ ধারণা নাথ-সিদ্ধগণের ছিল না। অশুদ্ধ মায়া পরিহার করিয়া বিশুদ্ধ মায়ার সহযোগে, যোগহীন সাধারণ মনুষ্যের দুঃখ ও শোকের কারণ অপক্ক দেহকে (হঠ) যোগাগ্নি দ্বারা পক্ক করিয়া দেবদুর্লভ ও নানা শক্তিধর যোগদেহ, বা সিদ্ধ দেহ, উৎপন্ন করিয়া এই জীবনেই জীবন্মুক্তি লাভ করিয়া, পরে দিব্য দেহে সিদ্ধি বা শিবত্ব (মহেশ্বরত্ব) লাভ করাই ছিল তাঁহাদের উদ্দেশ্য। তাহা হইলেই হইল, যেখানে সাধারণ মানুষ স্থূল দেহে বাঁচে, সেখানে তিনি মৃত, আর যেখানে সকলের মৃত্যু সেখানে তিনি বাঁচিয়া থাকেন কারণ মৃতের মরণ নাই,—সিদ্ধ দেহে মৃত্যুকে জয় করিয়া এরূপ অমরত্ব লাভই ছিল তাঁহাদের চেষ্টা। এইরূপে, কায়সাধন দ্বারা পুরাতন দেহকে যোগে দগ্ধ করিয়া তন্মধ্য হইতে জাত নূতন, অ-জড় ও অ-ধ্বংসী সিদ্ধ দেহে যে অমরত্ব লাভ করা যায়, দিব্য দেহ ধারণ করার পরও সেই অমরত্বই রহিয়া যায়, এবং তাহাই নাথ-সিদ্ধগণের সিদ্ধি বা পরামুক্তি, ইহাকেই তাঁহারা শিবত্ব বা ঈশ্বরের পরাপ্রকৃতির সার নির্যাস বলিয়া থাকেন। অমর হইয়া মহেশ্বরের অবস্থা লাভ করাই তাঁহাদের সাধনার লক্ষ্য। এই দিক দিয়া বিচার করিলে নাথ সিদ্ধদের মতবাদকে ঠিক বৌদ্ধ বলা চলে না।[২৯]

---

(২৯) নাথদের ধর্ম্ম ও মতবাদের বিশদ, প্রামাণ্য ও প্রাঞ্জল আলোচনার জন্য *Obscure Religious Cults as Background of Bengali Literature*, S. B. Das Gupta, 1946, Part III, pp. 219 ff. দ্রষ্টব্য।

সহজযান ও নাথ-পন্থায় মূর্তিপূজার স্থান ছিলনা, এবং ইহাদের কথাটি লক্ষ্মীঙ্করার 'অদ্বয়সিদ্ধি'তে এইরূপে ধ্বনিত হইয়াছে, "কাঠ, পাথর বা মাটির তৈয়ারী দেবমূর্তির কাছে প্রণত হওয়া বৃথা।"[৩০] কিন্তু মহাযান, বজ্রযান ও কালচক্রযানকে উপাশ্রয় করিয়া বাঙ্গালায় ও মগধে অষ্টম হইতে দ্বাদশ পর্যন্ত চারি-পাঁচ শতাব্দীতে বহুসংখ্যক বৌদ্ধ দেব-দেবীর মূর্তি নানাবিধ প্রস্তরে, ধাতুতে ও দারুতে গঠিত হইয়াছিল। ভাস্কর্য-রীতির দিক দিয়া ব্রহ্মণ্য ও বৌদ্ধ মূর্তিতে একই রীতি অনুসৃত, লোকতঃ সে রীতির নাম গৌড়ীয় শিল্প-রীতি, এবং জনশ্রুতিতে সেই রীতির উদ্ভাবয়িতা ধীমান ও বীতপাল নামক ধর্মপালের সমসাময়িক শিল্পীদ্বয়। অষ্টম হইতে দশম শতক পর্যন্ত কালে বাঙ্গালার তুলনায় মগধের মূর্তি সংখ্যায় অনেক অধিক। এই দুই-তিন শতাব্দীতে উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের শিল্পের সহিত মগধের শিল্পের সম্বন্ধ ঘনিষ্ট। পূর্ব-বঙ্গের শিল্পাদর্শ অনেকটা স্বতন্ত্র মার্গ অনুসরণ করিত, এবং সুষ্ঠুতা, শারীর-স্থানের যথাযথতা ও সৌকুমার্যের প্রতি-যোগিতায় পূর্ব-বঙ্গের ভাস্কর অগ্রগ ছিলেন। কিন্তু দশম শতকে বাঙ্গালা ও মগধ উভয় দেশেই শিল্পাদর্শের যে অপকর্ষ ঘটিয়াছিল, পূর্ব-বঙ্গের ভাস্কর্যও তাহার প্রভাব হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে সমগ্র বাঙ্গালার শিল্প একই আদর্শে অনুপ্রাণিত ও প্রতিফলিত হইল, এবং বাঙ্গালার শিল্পে যে দাক্ষ্য

(৩০) *Sādhanamālā*, Benoytosh Bhattacharyya, Vol. II, Intro., p. lv.

আত্মপ্রকাশ করিল, মাগধীয় শিল্পীগোষ্ঠীর রচনায় তাহার অভাব সুপরিস্ফুট। কিন্তু এই সমগ্র যুগে বাঙ্গালা ও মগধের প্রত্যেক অংশের শিল্পী যে রীতির অনুসরণে হিন্দু দেববিগ্রহ রচনা করিতেন, বৌদ্ধ দেবতামূর্তি রচনায় সেই রীতির ব্যত্যয় বা অন্যথা ঘটিত না। একই ভাস্করের হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় মণ্ডলীরই দেবমূর্তি গঠন অধিকারগত ছিল,শিল্প-রীতি ছিল জাতীয়।

বাঙ্গালার এই মূর্তিগুলির একাংশ সংগৃহীত হইয়া রহিয়াছে বাঙ্গালার বিভিন্ন চিত্রশালায়, একাংশ পড়িয়া আছে পল্লীপথের ধারে, প্রান্তরে, বৃক্ষতলে অথবা কোনও গৃহস্থের বা ধনবানের আঙ্গিনায় বা মালঞ্চে, একাংশ চলিয়া গিয়াছে বিদেশী পোতে বিদেশীয় যাদুঘরের শোভাবর্ধনের জন্য, বাকী অংশ আছে মন্দিরস্থান-সংলগ্ন পুরাণো দীঘির পচা নিথর জলের তলে অথবা ভূগর্ভে লোকনয়নের অন্তরালে। পূজা যখন বন্ধ হইয়া যাইত, প্রেমার্ত পূজারী, অথবা মন্দিরের অধিকারী, তখন দেববিগ্রহটিকে সোহাগে সামান্য ক্ষত করিয়া নিক্ষেপ করিতেন নিকটস্থ জলাশয়ে। যে মূর্তিগুলির সে সৌভাগ্য হয় নাই, তাহারা প্রায়শঃ গতনাসিক হইয়া, অথবা অন্য কোনও, বা কোন কোনও, অঙ্গে বিক্ষত হইয়া পরধর্মীর শোচনীয় আক্রোশের চিহ্ন বহন করিতেছে। এই জন্য অক্ষত মূর্তি বাঙ্গালাদেশে এবং উত্তর-ভারতের অন্যত্রও বেশী আবিষ্কৃত হইতে পারে নাই। বাঙ্গালার অক্ষত বা কিঞ্চিৎ ব্যাকৃত মূর্তিগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে প্রথম উপজ্জাই হয়, বুঝি মাতৃগর্ভেই বাঙ্গালার

রূপদক্ষগণের করপল্লবগুলি স্বয়ং বিশ্বকর্মা নিজের হাতে গড়াইয়া দিতেন, যে দরদী বিশ্বকর্মা গুপ্ত-যুগীয় সারনাথের শিল্পীর অঙ্গুলিগুলি নির্মাণে একদা নিজেকে ব্যাপৃত করিয়াছিলেন অবধানে। নচেৎ পাথরের মত শক্ত পাথরকে মোমের মতন নরম উপাদানরূপে ব্যবহার সম্ভব নয়, নচেৎ পাথরের গা কাটিয়া এমন সুঠাম সুডৌল তনু, এমন পেলব অঙ্গ, এমন মঞ্জু আননশ্রী আর এমন রুচির আঁখি রচনা সম্ভব নয়, পাষাণের গা চিরিয়া তরল ওষ্ঠের তলে প্রসন্নতার এমন অংশুল মৃদু হাসি ফুটানও অসম্ভব। নামের কাঙ্গাল ছিলেননা শিল্পের এই যাদুকরগণ, নাম তাঁহারা রাখিয়াও যান নাই, তাঁহারা জাতিতে ব্রাহ্মণ কি শূদ্র, ধর্মে বৌদ্ধ কি হিন্দু, বয়সে বৃদ্ধ কি যুবা তাহারও কোনও ইঙ্গিত নাই, কিন্তু বাঙ্গালীর তাঁহারা নমস্য। বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন অংশের শিল্পীগোষ্ঠীগুলি রাজার বা ধনবানের উৎসর্পণা করিয়া আনুকূল্য লাভের কতখানি প্রযত্ন করিতেন বা করিতেন না,—অথবা গুণমুগ্ধ ঐশ্বর্যশালী স্বয়ং উপচিকীর্ষু হইয়াই তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন,—কিংবা আত্মনিষ্ঠ শিল্পীকে ব্যষ্টিগত ভাবে রুদ্ধদ্বার শিল্পশালার অভ্যন্তরে অপররাত্রি পর্যন্ত সুন্দরের সাধনায় তন্ময় হইয়া বিনিদ্র থাকিতে হইত শুধু পেটের দায়ে, দুটো ভাতের জন্য,—তাহার কিছুই জানিনা, কিন্তু যদি স্মরণ করি, সাহিত্য যেমন সমাজের উন্নত মনের প্রাতিফলিক, শিল্প তেমনই গণ-চিত্তের একখানি স্বচ্ছ মুকুর, তাহা হইলে অভিনন্দ, সন্ধ্যাকর নন্দী, উমাপতিধর, ধোয়ী,

গোবর্ধন, জয়দেব প্রভৃতির কীর্তির সহিত এই সকল অনামী রূপকৃৎগণের কীর্তিসম্ভার নিরপেক্ষচিত্তে তুলনা করিয়া বুঝা যায়, দেশের লোকায়ত ইতিহাসের জন্য শিল্পীও যে উপাদান-সম্পৎ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার মূল্য অনধিক নয়। শিল্পীর হাতের পাথরের ও ধাতুর এই মূক রূপকগুলি একই নীরব ভাষায় প্রত্যেকের কাছে,—ভূলোকের যাবতীয় চক্ষুষ্মানের কাছে,—চোখে চোখে অনন্ত কথা বলিয়া আজিও অপূর্ব রসলোকের সৃষ্টি করে, কিন্তু দুঃখ এই, তাঁহাদের কীর্তিই শুধু জীবিত আছে,—কীর্তি তাঁহাদের জীবিত রাখিতে পারে নাই।

মৌর্য এবং মৌর্য-পর যুগেও যখন বুদ্ধের মূর্তি কল্পিত হয় নাই, তখন হয় পদচিহ্ন, না হয় শূন্য সিংহাসন বা অগ্নিশিখাময় স্তম্ভ, না হয় স্তূপ প্রভৃতি প্রতীক দ্বারা বুদ্ধ সূচিত হইতেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের গান্ধারে যে গ্রীক-বৌদ্ধ শিল্পরীতির উদ্ভব হইল, সেই রীতিই জন্ম দিল বুদ্ধ মূর্তির। পেশী-বহুল দেহে, গ্রীক সূর্যদেবতার মুখমণ্ডলকে আদর্শ করিয়া [৩১] বুদ্ধের গুম্ফ-শোভিত মুখ এবং তীক্ষ্ণ ভাঁজ-যুক্ত পরিধেয় প্রকাশ লাভ করিল। পরবর্তী শতকে মথুরা ও অমরাবতীর শিল্পে বুদ্ধ-মূর্তি হইতে গুম্ফ অন্তর্হিত হইল এবং পেশী ও বস্ত্রের ভাঁজ অনেকটা সংযত হইল। গান্ধার-শিল্পিগণ সাধারণ ভিক্ষুবেশ পরিহিত বুদ্ধ প্রতিমাও যেরূপ গঠন

(৩১) *Catalogue of the Archæological Museum at Mathura*, J. Ph. Vogel, 1910, p. 34.

করিয়াছিলেন, বুদ্ধদেবের সারাজীবনের এবং তাঁহার পূর্ব-জাতকের অসংখ্য ঘটনাবলীকেও তাঁহারা শিলাখণ্ডে রূপ দান করিয়াছিলেন। অমরাবতীতেও তাই [৩২]। কিন্তু মথুরার শিল্পিগণের হাতে এই ঘটনাবলী হইল সীমাবদ্ধ, এবং গুপ্ত-যুগের শিল্পে তাঁহার জীবনের কেবলমাত্র চারিটি প্রধান এবং চারিটি অপ্রধান ঘটনায় আসিয়া হইল পর্যবসিত [৩৩]। পরবর্তীকালের শিল্পেও গুপ্ত-যুগের এই বৈশিষ্ট্যই বজায় রহিল, এবং এই আটটি ঘটনাকে ফুসে সাহেব 'আটটি বিস্ময়' বলিয়া অভিধা দিয়াছেন। আম্রবৃক্ষের শাখা ধারণ করিয়া দণ্ডায়মানা মায়াদেবীর উদরের দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া বুদ্ধের জন্মগ্রহণ; বোধ্গয়ার সন্নিকটে নৈরঞ্জনা নদীর তীরে উরুবেলায় তাঁহার বুদ্ধত্বলাভ; সম্বোধিলাভের পর মৃগদাব-সারনাথে প্রথম ধর্মোপদেশ দান করিয়া ধর্মচক্র-প্রবর্তন; এক বানরের হস্ত হইতে তাঁহার এক ভাণ্ড মধু গ্রহণ; শ্রাবস্তীতে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে পরাভূত করিবার নিমিত্ত বহু বুদ্ধের সৃষ্টি; দেব-রূপে জন্মগৃহীত তাঁহার মৃতা জননীর নিকট অভিধর্ম ব্যাখ্যানের জন্য ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে আরোহণের পর ব্রহ্মা ও ইন্দ্র সহ সঙ্কাশ্যে অবতরণ; রাজগৃহে দেবদত্ত কর্তৃক বুদ্ধকে পদদলিত করিতে প্ররোচিত নালগিরি নামক উন্মত্ত হস্তীকে বশীভূত করণ; আর, কুসিনারায় তাঁহার মহা-

(৩২) *Amaravati Sculptures in the Madras Govt. Museum*, C. Sivaramamurti, 1942, p. 54 f.

(৩৩) *Catalogue of the Museum of Archæology at Sārnāth*. Daya Ram Sahni, 1914, p. 24.

পরিনির্বাণ,—বুদ্ধের জীবনের এই ঘটনাষ্টই শেষকালে ভারতীয় বৌদ্ধগণকে সর্বাপেক্ষা আকৃষ্ট করিল, এবং শিল্পিগণও তাহাই প্রস্তরে খোদিত করিতে লাগিলেন। এই আটটির মধ্যে জন্ম, সম্বোধিলাভ, ধর্মচক্র-প্রবর্তন ও মহাপরিনির্বাণ,—এই চারিটিই প্রধান ঘটনা। কোনও কোনও প্রতিমায় সম্বোধিলাভের পর বুদ্ধ ভূমিস্পর্শ-মুদ্রায় পদ্মাসনে আসীন, এবং মূর্তির চালিতে অপর সাতটি ঘটনা পর-পর শ্রেণীবদ্ধভাবে খোদিত রহিয়াছে। এস্থানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবেনা যে, জাভার বোরো-বুদুর মন্দিরে শাক্যমুনি-বুদ্ধের জীবনী সম্বন্ধে এক সারিতে যে ১২০টি খোদিত মূর্তি-ফলক (panel) রহিয়াছে, তাহা তাঁহার নির্বাণে আসিয়া শেষ হয় নাই; সারনাথে ধর্মচক্র-প্রবর্তনের পর তাহাতে তাঁহার জীবনের কোনও ঘটনাই স্থান পায় নাই [৩৪]।

কুষাণ-যুগের মথুরা শিল্পরীতির অনুবর্তনে যে বুদ্ধ প্রতিমা-সমূহ গঠিত হইয়াছিল তাহা দ্বিবিধ, (১) করতল বহির্দিকে প্রকাশ পূর্বক দক্ষিণ হস্ত স্কন্ধের দিকে উত্তোলন করিয়া অভয়-মুদ্রায় 'স্থানক' (দণ্ডায়মান) মূর্তি, ও (২) ধ্যান-মুদ্রায় 'আসন' (উপবিষ্ট) মূর্তি। কোনও কোনও আসন-মূর্তিতেও অভয়-মুদ্রা দেখা যায়। গুপ্ত-যুগের সারনাথ শিল্পরীতিতে অনুসৃত বুদ্ধমূর্তিতে ধর্মচক্র-মুদ্রাই পরিলক্ষিত হয়। ধর্মচক্র-মুদ্রা গান্ধার-শিল্পও না জ্ঞাত ছিল এমন নয়।

---

(৩৪) *The Influences of Indian Art*, J. Ph. Vogel, 1925, pp. 62—63.

কুষাণ-যুগের মথুরার শিল্প নিদর্শনগুলি দেখিয়া অনুমান করা হইয়াছে যে, বোধিসত্ত্ব-তত্ত্ব সেখানে তখনও প্রবর্ধিত হয় নাই, কারণ মোটে দুই তিনটি বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়ের মূর্তি'ই মথুরায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, অবলোকিতেশ্বরের ত একটিও নয়। কিন্তু গুপ্ত-ও গুপ্ত-পর যুগে মহাযানের কল্যাণে পঞ্চ-বোধিসত্ত্বের মূর্তি-ও পূজা উত্তরোত্তর জনপ্রিয় হইল, এবং সাধারণতঃ বুদ্ধমূর্তি'র দুই পার্শ্বে অবলোকিতেশ্বরের ও মৈত্রেয়ের প্রতিমূর্তি খোদিত হইতে লাগিল। এই দুই যুগের উত্তর-ভারতীয়, বিশেষতঃ সারনাথের, বিগ্রহগুলি পরিমার্জিত রুচি এবং আধ্যাত্মিক-ভাবের গভীরতা, এই দুই প্রধান বৈশিষ্ট্যাঙ্কিত। বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব এবং মহাযানের অন্যান্য দেব-দেবীর মূর্তিগুলি সবই ধ্যানভাবে অনুপ্রাণিত, এবং নিমীলিত বা অর্ধ-নিমীলিত চোখে ধ্যানে নিমগ্ন। এই ধ্যান প্রভাবেই বোধিসত্ত্ব এবং অপরাপর দেব-দেবীর বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি ঘটে, এবং সম্বোধিলাভের পরও বুদ্ধগণ সেই ধ্যানস্থ হইয়াই থাকেন, ধ্যান আর ভাঙ্গেনা। শুধু বৌদ্ধ মূর্তি নয়, ঐ দুই যুগের উত্তর-ভারতীয় বৈষ্ণব ও শৈব মূর্তিতেও সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে এই যোগ-ভঙ্গীই প্রকাশমান[৩৫]। মুদিতার্ধ আঁখির নাসিকাগ্রে সংবদ্ধ দৃষ্টি লইয়া কায়োৎসর্গ ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান, অথবা লীলাগতি-পরায়ণ মূর্তিগুলি এই ধ্যানভাবেরই দ্যোতনা করিতেছে।

---

(৩৫) *Medieval Indian Sculpture in the British Museum*, R. P. Chanda, p. 35.

কিন্তু আরাধ্য দেবতার কঠোর ধ্যান-যোগীর ভাব পাল-যুগের বাঙ্গালীর যেন তত মনঃপূত হয় নাই, উহা অনেকটা তাহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধও। যদি আমার দেবতা তাঁহারই উগ্র ধ্যান লইয়া বিভোর হইয়া রহিলেন, তবে তাঁহাকে আমার পূজার সার্থকতা কই? যদি, আমার পূজা তিনি গ্রহণ করিলেন কিনা না-ই বুঝিলাম, আমার পূজায় তিনি প্রসন্ন হইলেন কিনা না-ই জানিলাম, আমার দেবতা ইহকালে ও পরলোকে আমারই হইলেন কিনা না-ই টের পাইলাম, তবে কিসের লোভে আমি সেই পাষাণের পূজায় আত্ম-নিবেদন করিব? তাঁহার ধ্যান তাঁহার থাকুক, কিন্তু আমাকে দিতে হইবে প্রসন্নতার আশা, পরিতৃপ্তির আশ্বাস। এই জন্যই পাল-যুগের রূপদক্ষগণ মানস-নয়নে প্রত্যক্ষ করিলেন প্রসন্ন-দেবতার কমনীয় রূপ। কেমন সেই দেবতা? সেই দেবতার মুখ হইবে ধ্যানানন্দে ঢল ঢল, এবং সেই মুখে থাকিবে হয় ধ্যানের আবেশে, না হয় ভক্ত হৃদয়ের উচ্ছল অনুরাগের গভীর তৃপ্তিতে, মুদিয়া-আসা আঁখি। অথবা, সেই মুখে থাকিবে দুই বিস্ফারিত চোখের স্বচ্ছ চাহনি, আর চোখের তলে, টোল-খাওয়া দুই গালের মাঝে, ঠোঁটের কোণে কোণে ভাসিবে রহস্য-মেদুর মৃদুমন্দ হাসি। মুখের দীপ্তিতে, চোখের ভাষায় ও ঠোঁটের হাসিতে প্রসন্ন দেবতা তাঁহার ভীরু ভক্তকে দিবেন পূজার সার্থকতার আশ্বাস পলে অনুপলে, সর্বক্ষণ। এমন দেবতাকে অন্তরে অবলোকন করিলেন পাল-শিল্পী, এবং তখন সেই অরূপ দেবতাকে জীবন্ত রূপ দিলেন

মৃত পাথরের গায়ে অথবা জড় ধাতুপিণ্ডে,—বিশেষতঃ একাদশ-দ্বাদশ শতকের মূর্তিতে। এই দুই রূপে ধরা দিলেন আকাশের দেবতা পাল-যুগে বাঙ্গালার মন্দিরে মন্দিরে, হিন্দুর ও বৌদ্ধের দেবালয়ে। এই অভিরাম রূপ দেখিয়া হয়ত অতি বড় নাস্তিকেরও এক একবার সাধ যায় ভক্তের আসনে গিয়া বসিবার, এবং তাই যদি হয়, মূর্তি-পূজার যথার্থ উদ্দেশ্য অধিকতর সাফল্য লাভ করিল তন্দ্রালু পাল-শিল্পীর মায়াবী হাতে। সেই মায়াবী হাত জানিত কেমন করিয়া ভার-সাম্য রক্ষা করিয়া রচনা করিতে হয় বিপুলায়তন মূর্তি, কিন্তু জানিতনা কেমন করিয়া খাড়া করিয়া দিতে হয়,—বাদামি, কাঞ্চী ও এলিফাণ্টার শিল্প-রীতির অনুকরণে বিরাট শক্তি ও মহান কল্পনায় মণ্ডিত বৃহদাকার মূর্তিই গঠন করিয়া,—আরাধ্য ও ভক্তের মাঝখানে একের ঐশ্বর্য এবং অপরের বিস্ময় ও সঙ্কোচের উচ্চ প্রাচীর। শিল্পশাস্ত্রের নিগড় যতই তাহাকে বাঁধিবার চেষ্টা করুক না কেন, মায়াবী কিনা,—বাঁধন সত্ত্বেও দেবমূর্তির গণ্ডীর মধ্যেই সেই হাতে ক্রিয়াশক্তি পাইল প্রভূত স্ফূর্তি, উষ্ণ ভাবোচ্ছ্বাস পাইল পর্যাপ্ত বিকাশ,—এবং এই কথার সম্যক উপলব্ধি হয় বাঙ্গালার মারীচী, পর্ণশবরী, নৃসিংহ, নটরাজ, অঘোর, মহিষমর্দিনী, নর্তন-গণেশ প্রভৃতি মূর্তিগুলি দর্শন মাত্রেই। কিন্তু তাই বলিয়া সে প্রশ্রয় দেয় নাই উড়িষ্যার ও মহোবার শিল্পের ভাবী অবাধ স্বাধীনতাকে, কারণ দৈবত মূর্তিতে সংযমের রশ্মি টানিয়া না রাখিতে জানিলে ভক্তের চোখে দেবতা হইয়া পড়েন খাটো,

তাঁহার মহিমায় বিশ্বাস যায় কমিয়া,—তখন ঐশ্বর্যের বিকারটুকুই শুধু পড়ে নজরে।

মহাযান ও বজ্রযান প্লাবিত হইলেও বাঙ্গালা একেবারে বিস্মৃত হয় নাই গৌতম বুদ্ধকে। বুদ্ধের যে সমস্ত মূর্তি বাঙ্গালাদেশে, বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গে ও উত্তরবঙ্গে, আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা অসংখ্য না হইলেও নেহাৎ সামান্যও নয়। মূর্তিগুলি বিভিন্ন 'মুদ্রায়', অর্থাৎ দেবতার মনের বিভিন্ন ভাব ও ক্রিয়াব্যঞ্জক হস্তের বিভিন্ন ভঙ্গীতে, কিন্তু অধিকাংশ মূর্তিই ভূমিস্পর্শ-মুদ্রায় আসন-মূর্তি। বুদ্ধ যে মার এবং মারবলের দর্পনাশ করিয়া সম্বোধিলাভ করিয়াছেন, ভূদেবীকে সেই মুহূর্তে তাহারই সাক্ষী রাখিবার জন্য দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া আছেন। ঢাকা চিত্রশালার ফরিদপুর-উজানিতে প্রাপ্ত একাদশ শতাব্দীর যে মূর্তিতে বুদ্ধ বজ্রাসনে বসিয়া ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় রহিয়াছেন, তাহাও এই একই শ্রেণীর। মূর্তির পীঠে একটি বজ্র ও সপ্তরত্ন অঙ্কিত আছে। বিক্রমপুর-মধ্যপাড়ায় প্রাপ্ত ভূমিস্পর্শ-মুদ্রায় ধ্যানীবুদ্ধের একটি কৃষ্ণ প্রস্তর মূর্তিতে, পাদপীঠে, দশম-একাদশ শতাব্দীর অক্ষরে 'দানপতি নিরুপমস্য' উৎকীর্ণ আছে[৩৬]। মথুরা শিল্পের অভয়-মুদ্রা ও ধ্যান-মুদ্রা এবং সারনাথ শিল্পের ধর্মচক্র-মুদ্রার সহিত পাল-শিল্পের বুদ্ধমূর্তি কল্পনার এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন লক্ষিতব্য। বাঙ্গালী-চিত্তে বোধগয়ায় গৌতমের সম্বোধিলাভই বুদ্ধ-চরিতের সর্বাপেক্ষা

(৩৬) *Ann. Rep. of the Dacca Musuem,* 1939-40 p. 5.

প্রধান ঘটনা বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল। নালন্দার ও বোধগয়ার গৌড়ীয় শিল্পরীতির বুদ্ধমূতি গুলিতেও ভূমিস্পর্শ-মুদ্রাই বেশী লক্ষিত হয়, এবং হওয়ারই কথা, কারণ মগধেই বুদ্ধ সম্বোধি-লাভ করেন। বাঙ্গালার মাটির সহিত বুদ্ধ-চরিতের ছোট-বড় কোনও ঘটনাই বিজড়িত নয় বলিয়া, এবং পাল-যুগে বাঙ্গালা ও মগধ একই রাষ্ট্রীয় ঐক্য-বন্ধনে ছিল বলিয়া, বাঙ্গালার শিল্পীও সম্বোধিলাভের মুদ্রাকেই বুদ্ধমূর্তি রচনায় গ্রহণ করিলেন। তবে ধ্যান-মুদ্রায় (দক্ষিণ করতল বাম করতলে ন্যস্ত করিয়া হস্তদ্বয় উপবিষ্ট বুদ্ধের দুই পাদোপরি স্থাপিত) অন্ততঃ দুইটি বুদ্ধ-মূর্তি ঢাকা চিত্রশালায়, ব্যাখ্যান-মুদ্রায় (প্রথম ধর্ম-প্রচারের ভঙ্গীতে) অন্ততঃ তিনটি, এবং সমাধি-মুদ্রায় অন্ততঃ একটি বুদ্ধমূর্তি রাজসাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধানসমিতির চিত্রশালায় সংগৃহীত আছে। অভয়-মুদ্রায় (ঊর্ধ্বোত্থিত অঙ্গুলি সহ করতল সম্মুখ ভাগে ন্যস্ত করিয়া অভয় দান করিয়া) বুদ্ধের একটি স্থানক ব্রঞ্জমূর্তি এবং ধর্মচক্র-মুদ্রায় পদ্মাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধের একটি ব্রঞ্জমূর্তি চট্টগ্রামে পাওয়া গিয়াছে[৩৭]। বজ্রপর্যঙ্ক লীলায়-উপবিষ্ট একটি ভগ্ন বোধিসত্ত্বমূর্তি রাজসাহী চিত্র-শালায় আছে, এটি সম্ভবতঃ জম্বুবৃক্ষের ছায়ায় গৌতমের তপশ্চরণের দৃশ্য সূচিত করিতেছে[৩৮]। এই চিত্রশালায় বিহার হইতে পাঁচটি এবং রাজসাহী হইতে একটি যে কীরিট-শোভিত এবং অলঙ্কৃত মূর্তি

(৩৭) *ASI., Ann. Rep.*, 1921—22, p. 105.
(৩৮) *Ann. Rep. of V.R.S., for* 1926—27, Museum Notes, p. 1.

আছে, সেগুলিকে আদি-বুদ্ধের মূর্তি বলিয়া প্রথম অনুমিত হইয়াছিল, কিন্তু স্বর্গীয় রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন, মূর্তিগুলি শাক্যমুনি-বুদ্ধের[৩৯]। বগুড়া-কাসিয়াবাড়ী হইতে এই জাতীয় একটি দ্বিভুজ ও অলঙ্কৃত, উধ্বভাগ-ভগ্ন, মূর্তি রাজসাহী চিত্রশালায় পরে স্থান পাইয়াছে[৪০], এবং পাহাড়পুর ধ্বংসাবশেষের মধ্যেও এইরূপ দ্বি-পদ্মাসনে উপবিষ্ট, অলঙ্কার-ভূষিত বোধিসত্ত্বের একটি প্রস্তরমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া, বুদ্ধের স্থানক প্রস্তর মূর্তিও উত্তরবঙ্গে কয়েকটি পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু পূর্ববঙ্গে সম্ভবতঃ পাওয়া যায় নাই। পাহাড়পুরে প্রধান মন্দিরের পূর্বদিকে সম্মুখস্থ প্রাচীরে সংলগ্ন সারিবদ্ধ মৃণ্ময় মূর্তি-ফলকের মধ্যে ভূমিস্পর্শ ও ব্যাখ্যান-মুদ্রায় বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। মৃণ্ময় বুদ্ধমূর্তি বাঙ্গালা-দেশে আরও আবিষ্কৃত হইয়াছে। বালুপ্রস্তরের একটি শিলাখণ্ডে চারিটি কুলুঙ্গির মধ্যে ধ্যান-মুদ্রায় চারিটি আসন বুদ্ধমূর্তি ঢাকা চিত্রশালায় আছে, পাওয়া গিয়াছে ঢাকার চুড়াইন গ্রামে। বিক্রম-পুরের একটি দারু, ব্যাকৃত, বুদ্ধমূর্তি চট্টগ্রামে রক্ষিত আছে, এটিও দ্বি-পদ্মাসনে উপবিষ্ট, ভূমিস্পর্শ-মুদ্রায়[৪১]।

বুদ্ধমূর্তি-স্তবক বিহারে অনেকগুলি আবিষ্কৃত হইলেও, এ পর্যন্ত বাঙ্গালাদেশে হইয়াছে মাত্র একটি, খুলনা-শিববাটিতে, যেখানে

(৩৯) *ASI., Ann. Rep.*, 1921—22, p. 105.
(৪০) *A Note to the Additions to VRS. Museum*, 1925—26, p. 2.
(৪১) *ASI., Ann. Rep.*, 1921—22, p. 82, No. 13.

শিবের মূর্তি বলিয়া উহা পূজিত হইতেছে। একাদশ শতাব্দীর এই কষ্টিপাথরের স্তবকটির মধ্যভাগের অনেকটা স্থান জুড়িয়া আছেন ভূমিস্পর্শ-মুদ্রায় আসীন বুদ্ধ, এবং স্তবকের অবশিষ্ট অংশে তাঁহার জীবনের ঘটনাষ্ট খোদিত। সারনাথের বুদ্ধ-চরিত স্তবকগুলিতে কিন্তু এমনটি নয়[৪২]। সেখানে বুদ্ধের আটটিই হোক্, চারিটিই হোক্, প্রতিটি ঘটনার জন্য সমান স্থান অংশিত। কিন্তু বাঙ্গালার ও মগধের শিল্পিগণ পৃথক মূর্তিতেও বটে, স্তবকেও বটে, বার বার এই ইঙ্গিতই করিয়াছেন যে, সম্বোধিলাভের চেয়ে মহিমময় ঘটনা বুদ্ধ-চরিতে আর কিছুই ছিলনা। শিববাটির স্তবকটিতে বুদ্ধ উপবিষ্ট রহিয়াছেন বোধ্গয়ার মন্দিরে, কিন্তু নালন্দার নিকট জগদীশপুরে যে বিরাট, অক্ষত ও অতি সুন্দর এই জাতীয় স্তবক আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে এই মন্দির নাই[৪৩]। শিববাটি-স্তবকে বোধ্গয়া-মন্দিরের তিন পার্শ্বে অপর সাতটি ঘটনা খোদিত। মন্দিরের বামে একটি ক্ষুদ্রাকার মন্দিরের অভ্যন্তরে মায়াদেবী একটি বৃক্ষশাখা ধরিয়া লুম্বিনি উদ্যানে দণ্ডায়মানা, এবং তাঁহার পার্শ্বে সদ্যোজাত গৌতম। এই জন্ম হইতে বুদ্ধ-চরিত আরম্ভ করিয়া শেষ হইয়াছে মহাপরিনির্বাণে, সেই চিত্রটি রহিয়াছে স্তবকশীর্ষে। ভূমিস্পর্শ-মুদ্রায় আসীন বুদ্ধের পদ্মাসনের নীচে দুই সারি চিত্রে একটিতে মহাভিনিষ্ক্রমণ এবং অপরটিতে মার (বৌদ্ধ শয়তান),

(৪২) *ASI., Ann. Rep.*, 1921—22, p. 77.
(৪৩) *Modern Review*, 1930, Jan., pp. 104—110.



খুলনা-শিববাটীর বুদ্ধমূর্তি স্তবক
ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সৌজন্যে

মার-পত্নী ও মারের নারী-বাহিনী, অর্থাৎ সম্বোধিলাভের অব্যবহিত পূর্বে মার-ধর্ষণের কথা, খোদিত আছে। পেগানে, স্থইজিগন্ প্যাগোডার নিকটে একটি মাঠে এই জাতীয় একটি বুদ্ধচরিত-স্তবক আবিষ্কৃত হইয়াছিল, এবং ইহা যে পাল-যুগের গৌড়ীয় শিল্পের প্রভাবান্বিত তাহাতে সন্দেহ নাই [৪৪]। ত্রিপুরা জেলার পাইওর গ্রামে ভূমিস্পর্শ-মুদ্রায় বুদ্ধের একটি যে 'কীর্তিমুখ' সম্বলিত মূর্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহার প্রভাবলীতেও বুদ্ধ-চরিতের প্রধান ঘটনা-চতুষ্টয় খোদিত রহিয়াছে [৪৫]। চব্বিশপরগণার খলিসাদি হইতে প্রাপ্ত কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্মিত বুদ্ধের একটি স্বতন্ত্র পরিনির্বাণ-মূর্তি আশুতোষ-চিত্রশালায় সংগৃহীত হইয়াছে, এইরূপ স্বতন্ত্রভাবে পরিনির্বাণের দৃশ্য খোদিত মূর্তি বাঙ্গালায় আর পাওয়া যায় নাই। রাজসাহীর চিত্রশালায় দিনাজপুর-গোয়ালায় প্রাপ্ত, এক হস্তে বৃক্ষশাখা ধরিয়া এবং অপর হস্ত তাঁহার ভগিনী গৌতমীর স্কন্ধোপরি স্থাপন করিয়া দণ্ডায়মানা মায়াদেবীর একটি মূর্তি এস্থলে উল্লেখযোগ্য, এবং পাহাড়পুর মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের একটি খোদিত চিত্রে সম্ভবতঃ তরুতলে দণ্ডায়মানা নারী-মূর্তিটি মায়াদেবী-ই। বাঙ্গালার ও মগধের তথাকথিত 'জননী ও শিশু' মূর্তিগুলির অন্ততঃ কোনও কোনওটিতে বুদ্ধজন্মের দৃশ্য খোদিত থাকা অসম্ভব নয় [৪৬]।

---

(৪৪) *ASI., Ann. Rep.*, 1922—23, p. 123.

(৪৫) *Dac. Cat.*, p. 33.

(৪৬) *On the* Iconography *of the Buddhist Nativity*, A Foucher, Mem. A.S.I., 1934

ঢাকা চিত্রশালায়, ভিক্ষু-পরিচ্ছদ পরিহিত দীপঙ্কর-বুদ্ধের একটি কৃষ্ণপ্রস্তরের স্থানক মূর্তি সংগৃহীত হইয়াছে। দীপঙ্কর-বুদ্ধের দুই পার্শ্বের দুই ক্ষুদ্র মূর্তিকে মৌদ্গলায়ন এবং সারিপুত্র বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে[৪৭], কিন্তু দক্ষিণ পার্শ্বের মূর্তিটির মস্তকের চতুর্দিকে বিন্দুকিত প্রভামণ্ডলী উঁহার দেবত্ব সূচিত করিতেছে, অতএব ইনি মৌদ্গলায়ন বা সারিপুত্র হইতে পারেননা, এবং দীপঙ্কর-বুদ্ধের সহিত ইঁহাদের কোনও সম্পর্কও নাই। বুদ্ধের আরও কত মূর্তি বাঙ্গালার বনে-জঙ্গলে বা লোকালয়ের এখানে সেখানে পড়িয়া আছে, তাই বলিতেছিলাম, বাঙ্গালা গৌতমকে,—সারা ভারতের দুলালকে,—মহাযান ও বজ্রযান প্রভৃতির স্রোতেও বিস্মৃত হয় নাই।

বুদ্ধের মূর্তিগুলিরও যেমন, অপরাপর দেব-দেবীর মূর্তিগুলিরও তেমনই, সংখ্যা, প্রকৃতি এবং অপরাপর বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিলে বাঙ্গালার বৌদ্ধ-জগতের সাধারণ মনের গতি কোন্ কোন্ দিকে ধাবিত ছিল তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যাইবে।

আদি-বুদ্ধের একটিও মূর্তি এ যাবৎ বাঙ্গালায় পাওয়া যায় নাই, এমন কি পূর্ববঙ্গেও গিয়াছে বলিয়া অজ্ঞাত। অথচ বাঙ্গালার উত্তরে নেপালে এই আদি-বুদ্ধের মূর্তির ছড়াছড়ি। সকল ধ্যানী-বুদ্ধের জনক হইলেও তাঁহার পূজা বাঙ্গালাদেশে বজ্রযানের কল্যাণে কেন প্রচলন বা বিস্তার লাভ করে নাই, বলা কঠিন; কালচক্র-যানীর কালচক্রও ত আদি-বুদ্ধই, তাঁহারাই বা কি করিলেন?

(৪৭) *Ann. Rep. of the Dacca Museum*, 1939—40, p. 6.

আদি-বুদ্ধ আদি ও স্বয়ম্ভূ বলিয়াই যদি মূর্তিতে তাঁহাকে খোদিত না করিবার কারণ হয়[৪৮], তবে নেপালে ও মগধে আদি-বুদ্ধের মূর্তি কি করিয়া গঠিত হইল, এবং আদি-প্রজ্ঞাই বা মূর্তিতে ধরা দিলেন কিরূপে? আদি-প্রজ্ঞা ঠিক আদি-বুদ্ধের শক্তি না হইলেও, বজ্রধর নামে তাঁহার যে গুহ্য রূপ আছে,—যে রূপে তিনি অবিনাশী সকল গুহ্য এবং গোপন তথ্যের প্রভু ও পূর্বদিশাধিপতি, তাঁহারই শক্তি। আদি-প্রজ্ঞা বা প্রজ্ঞাপারমিতা তন্ত্র-মতে জননশক্তির মূর্তিমতী বিগ্রহ এবং সকল বুদ্ধের জননী। ঐশ শব্দ এবং মহাযানের প্রধান শাস্ত্র 'প্রজ্ঞাপারমিতা'ই মূর্ত হইয়া দেবী-প্রজ্ঞাপারমিতা হইয়াছেন। কাম্বোডিয়া, জাপান, জাভা, ইন্দোচীন, নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি স্থানে ইনি যেমন পূজিতা, আশ্চর্য, চীনে তিনি তেমনই অজ্ঞাত। বাঙ্গালাদেশে এ যাবৎ অন্ততঃ দুইটি দেবী-মূর্তিকে প্রজ্ঞাপারমিতা-মূর্তি বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে; শ্বেত বালু-প্রস্তরে নির্মিত মূর্তিটি ঢাকা চিত্রশালায়, এবং বগুড়া-হিলিতে আবিষ্কৃত একটী ভগ্ন মূর্তি রাজসাহী চিত্রশালায়[৪৯] আছে। ধর্ম-শ্রীপাল নামক এক ভিক্ষু দক্ষিণ-ভারতের কর্ণাটকের বনবাসী (করবার জেলার সিরসি তালুক) হইতে উত্তরবঙ্গে আসিয়া একটি প্রজ্ঞাপারমিতা-মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এই মূর্তিটি ইণ্ডিয়ান্ মিউজিয়ামে আছে।

(৪৮) *Dac. Cat.*, p. 23.

(৪৯) *A Note to the Additions to the VRS. Museum*, 1925—26, p. 1.

আদি-বুদ্ধের আত্মস্বরূপ হইতে উৎপন্ন ধ্যানীবুদ্ধ-পঞ্চক ব্যতীতও একটি ষষ্ঠ ধ্যানী-বুদ্ধের, বজ্রসত্ত্বের, উল্লেখ 'সাধনমালা'য় পাওয়া যায়, ঢাকা-সুখবাসপুরে বীরাসনে উপবিষ্ট দশম শতাব্দীর একটি বজ্রসত্ত্ব মূর্তি পাওয়া গিয়াছে।

কিন্তু কি মহাযানী, কি বজ্রযানী বা কালচক্রযানী, বৌদ্ধজগতের সর্বত্রই অবলোকিতেশ্বর-লোকনাথের তুল্য লোকপ্রিয় দেবতা আর একটিও নয়। মাহাত্ম্যও তাঁহার সকল দেবতার চেয়ে বেশী। হইবারই কথা। প্রথমতঃ, তিনি সুখাবতী স্বর্গ নামক অরূপ লোকের ধ্যানী-বুদ্ধ, অমিতজ্যোতিঃ, অমিতাভ ও তাঁহার শক্তি পাণ্ডোরার অধ্যাত্ম-সুত। দ্বিতীয়তঃ, এই যে বর্তমান যুগ বা কল্প, ভদ্রকল্প, ও এই যে বর্তমান জগৎ, চতুর্থ জগৎ, ইহা এই অবলোকিতেশ্বরের নিজের সৃষ্টি, এবং যতদিন মৈত্রেয় মানুষী-বুদ্ধ হইয়া ধরাধামে না আসিতেছেন, ততদিন বৌদ্ধধর্মকে রক্ষা করিবেন এই ইনি-ই। তদুপরি, তিনি করুণার দেবতা, সকলকে বোধিজ্ঞানে প্রবুদ্ধ করিতে সদাই যত্নবান। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বভূতের বোধিজ্ঞানের উদয় না হওয়া পর্যন্ত নির্বাণ চাহিনা বলিয়া এই করুণাময় দেবতাই একদিন নিজের নির্বাণ পর্যন্ত প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, এবং তদবধি তিনি বোধিসত্ত্বই হইয়া আছেন, বুদ্ধ হন নাই। কাজেই ইঁহার লোকপ্রিয়তা না হইলে আর হইবে কাহার?

কিন্তু মহাযান খৃষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকে উদ্ভূত হইলেও পঞ্চম শতাব্দীর আগের কোনও অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি কোথাও

পাওয়া যায় নাই। ইহার অবশ্যই একটা কারণ ছিল। বোধ করি, বুদ্ধ ও বুদ্ধ-চরিত লইয়াই তিন-চারি শতাব্দী ধরিয়া সকলে ছিলেন ব্যস্ত। প্রথম যুগের অবলোকিতেশ্বর-লোকনাথের মূর্তিগুলি হিন্দুর ব্রহ্মা-প্রজাপতির মূর্তির আদর্শে গঠিত[৫০]। আকৃতিতে ব্রহ্মা-সদৃশ হইলেও, এবং ব্রহ্মার মতই ব্রহ্মাঞ্জলি-মুদ্রাবদ্ধ হস্ত হইলেও, তিনি কর্মে বিষ্ণু, স্থিতিরক্ষক। বর্ণটি আবার শিব-ভট্টারকের মত শ্বেতবর্ণ, এবং সর্প-বিজড়িত ত্রিশূলও আয়ুধ হিসাবে তিনি সময় সময় ব্যবহার করিতে পারেন[৫১], শাস্ত্রে বাধে না। আবার, অমিতজ্যোতিঃ অমিতাভের অধ্যাত্মপুত্র বলিয়া তিনি চন্দ্র-সূর্যের পরিমিত জ্যোতিঃ। এইরূপে আংশিক ব্রহ্মা ও বিষ্ণু, আংশিক শিব এবং আংশিক চন্দ্র-সূর্যও হইয়া সর্বশক্তির বিগ্রহ-রূপে তিনি বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার অন্ততঃ তিনটি ধাতব মূর্তি ঢাকা চিত্রশালায় আছে, তন্মধ্যে $\frac{1 \text{ A (ii) B}}{1}$ সংখ্যকটি রীতি-মত প্রাচীন। রাজসাহী চিত্রশালায়ও ইঁহার তিন চারিটি ধাতব মূর্তি, এবং বগুড়া হইতে আনীত একটি বৃহদাকার কৃষ্ণ প্রস্তরমূর্তির শুধু মস্তকটিই আছে। বাঙ্গালাদেশে ইঁহার আরও কয়েকটি শৈল, ধাতব ও মৃণ্ময় মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। ঢাকা যাদুঘরের ঢাকা-মহাকালী গ্রামের লোকনাথ গৌড়ীয় শিল্পের অন্যতম উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ঐ যাদুঘরে লোকনাথের একটি আসন মূর্তিও আছে,

(৫০) *J. R. A. S.*, Waddell, 1894, p. 57.
(৫১) Getty, *op. cit.*, p. 59.

এবং ঢাকা-মূলচরে প্রাপ্ত একটি আসন মূর্তি এখন রাজসাহী চিত্রশালার শোভাবর্ধন করিতেছে।

কিন্তু এইরূপ বিরাট দেবত্বশালী দেবতার একই রূপে অবস্থান অসম্ভব। তাঁহার সমস্তখানি শক্তির একসঙ্গে সর্বদা ধারণা ও উপলব্ধি করা সাধকের পক্ষে বড়ই কঠিন। এইরূপে তিনি নানা রূপে, নানাস্থানের সাধকবর্গের নিকট প্রতিভাত হইলেন। গণনায় দেখা গিয়াছে এই রূপের সংখ্যা অন্ততঃ ১০৮টি[৫২]। অবশ্য সকল রূপ সমান আদর পাইল না, অন্ততঃ বাঙ্গালা দেশে ত নয়ই। বাঙ্গালায় পদ্মপাণি, সিংহানন্দ ও খসর্পণ লোকনাথই বেশী আদৃত হইলেন।

পদ্মপাণি-বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের একটি অ-তান্ত্রিক রূপ। তিনি মহাযানে ধ্যানীবুদ্ধ অমিতাভের আদেশে সমস্ত প্রাণিজগৎ সৃষ্টি করেন। বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিকতা প্রবেশের পর তিনি অমিতাভের দ্বারা আদি-বুদ্ধের নিকট হইতে সৃষ্টির ক্রিয়াশক্তি লাভ করেন, এবং তাঁহার হাতের যে পদ্মটি উহাই ঐ সৃষ্টি-শক্তির প্রতীক। অবলোকিতেশ্বরের এই রূপই বৌদ্ধদের চতুর্থ জগৎ, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ, সৃষ্টি করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও মহেশ্বরকে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। পদ্মপাণির মূর্তিগুলি প্রায়ই স্থানক, এবং মূর্তিতে তিনি রাজ-পরিচ্ছদ ও নানা অলঙ্কারে শোভিত একটি সুদর্শন

(৫২) *Buddhist Iconography*, p. 177 f.

যুবা। লীলাসনে উপবিষ্ট, বামহস্তে মৃণালধৃত, পদ্মপাণির একটি স-লেখ রজতপত্রমণ্ডিত ব্রঞ্জমূর্তি চট্টগ্রামে পাওয়া গিয়াছে[৫৩]। পাহাড়পুরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পদ্মপাণির একটি সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর প্রাচীন প্রস্তরমূর্তি, এবং মূল মন্দিরের পূর্ব দিকে একটি মৃৎ স্তবকে তাঁহার পদ্মাসনে উপবিষ্ট মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাজসাহী চিত্রশালায় পদ্মপাণির অন্ততঃ চারিটি স্থানক মূর্তি আছে, এবং তন্মধ্যে একটি কষ্টি পাথরের। বোষ্টনের চিত্রশালায় ললিতাসনে উপবিষ্ট পদ্মপাণির একটি দ্বাদশ শতাব্দীর অতি সুন্দর প্রস্তরমূর্তি ও একটি একাদশ শতাব্দীর পিত্তলমূর্তি রহিয়াছে, মূর্তি দুইটি হয় বিহার, না হয় বাঙ্গালা, হইতে নীত[৫৪] আলিপুর বেলভিডিয়ার হাউস্ হইতে কলিকাতা-যাদুঘরে নীত একটি নবম শতাব্দীর কষ্টি পাথরের স্থানক পদ্মপাণি-মূর্তির বদনে জে, সি, ফ্রেঞ্চ সাহেব নিগ্রো মুখের ভাব আবিষ্কার করিয়াছেন[৫৫]।

সিংহানন্দ-লোকেশ্বরও অবলোকিতেশ্বরের একটি অ-তান্ত্রিক রূপ, এবং সচরাচর কুষ্ঠব্যাধি আরোগ্যের নিমিত্তই তাঁহার নিকট প্রার্থনা করা হয়। রাজসাহী চিত্রশালায় ইঁহার অন্ততঃ দুইটি প্রস্তর মূর্তি রহিয়াছে, তাহার একটি কষ্টি পাথরের। বীরভূমে

(৫৩) *ASI., Ann. Rep.*, 1921—22, p. 82, No. 5.

(৫৪) *Catalogue of the Indian Collections in the Museum of Fine Arts, Boston*, A. K. Coomaraswamy, Parts I and II, p. 78, Pls., XXIV and XXXVI.

(৫৫) *Art of the Pal Empire*, Pl. XXII.

ইঁহার নমঃকার মুদ্রায় একটি আসন মূর্তি পাওয়া গিয়াছে, এরূপ মূর্তি বিরল[৫৬]। সিংহানন্দ অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি বস্তুতঃ অবলোকিতেশ্বর ও বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রীর সম্মিশ্র রূপ।

খসর্পণ-লোকনাথের একটি মূর্তি ত্রিপুরা হইতে আনীত হইয়া ঢাকা চিত্রশালায় রহিয়াছে। অপর একটি মূর্তি ঢাকা-মুন্সীগঞ্জে আছে। কিন্তু ঢাকা-মহাকালীতে প্রাপ্ত দ্বিপদ্মের উপর ললিতাসনে উপবিষ্ট একাদশ শতাব্দীর যে খসর্পণ-মূর্তি ঢাকা-চিত্রশালায় আছে, তাহার তুলনা বিরল। শিল্পীর মায়াবী হাত কি মায়াই না রচনা করিয়াছে! মূর্তিটির দক্ষিণ হস্ত ভগ্ন, বাম হস্তে একটি স-নাল পূর্ণ-বিকশিত কমল, মুখখানি দক্ষিণে বিনত। কিছুকাল আগে রাজসাহী-চৌরাপাড়ায় একটি খসর্পণ-লোকেশ্বরের স্থানক মূর্তি পাওয়া গিয়াছে[৫৭]। দক্ষিণ-বাঙ্গালার খসর্পণ নামক স্থান-বিশেষ হইতে অবলোকিতেশ্বরের এই রূপের নামকরণ হইয়াছে বলিয়া একটি অনুমান করা হইয়াছে।

ঢাকা-সোনারঙ্গের একটি এক-মুখ, দ্বাদশ-ভুজ লোকনাথের স্থানক ক্ষুদ্র প্রস্তর মূর্তি বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে রক্ষিত আছে। এই মূর্তিটিতে বিষ্ণু-মূর্তির প্রভাব যে অনেকখানিই আছে, একথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

---

(৫৬) *Ann. Rep. Arch. Surv. Ind., Eastern Circle*, p. 27, Pl. 1, figs. 1 and 2.

(৫৭) *ASI, Ann. Rep.*, 1930—34, pp. 262—63, Pl. CXXXI(b)



ঢাকা-মহাকালীর খসর্পণ-লোকেশ্বর
ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সৌজন্যে

অবলোকিতেশ্বরের 'নাম-সংগীতি' নামে একটি এক-শির ও দ্বাদশ-ভুজ রূপ আছে[৫৮], কিন্তু ভুজগুলির সংস্থানের পার্থক্য দেখিয়া ইহাকে 'নাম-সংগীতি' মূর্তি আখ্যা দিতে আপাততঃ সাহস হয় না। দ্বাদশভুজ অবলোকিতেশ্বরের অপর একটি স্থানক মূর্তিও দিনাজপুরে আবিষ্কৃত হইয়া রাজসাহী-চিত্রশালায় সংগৃহীত আছে। এই চিত্রশালায় 'সুগতি সন্দর্শন লোকেশ্বর' নামে অবলোকিতেশ্বরের অপর এক দুষ্প্রাপ্য রূপের ষড়ভুজ মূর্তি আছে। মালদহ-রাণীপুরে আবিষ্কৃত যে ষড়ক্ষরী-লোকেশ্বরের চতুর্ভুজ মূর্তি মালদহ-চিত্রশালায় আছে, ইহাও অবলোকিতেশ্বরের একটি অ-সাধারণ রূপ। সম্মুখের দুই হস্ত অঞ্জলিবদ্ধ, পশ্চাতের বাম হস্তে পদ্ম ও দক্ষিণটিতে অক্ষমালা এবং শীর্ষে জটামুকুট। ঢাকা-সোনারঙ্গে ললিতাসনে উপবিষ্ট লোকনাথের একটি দারুময় মূর্তি পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু মূর্তিটি অক্ষত নয়[৫৯]।

অবলোকিতেশ্বরের শক্তি-ভাগ্যও উত্তম ছিল, তাই তারার মত দেবীকে তিনি শক্তি-রূপে পাইয়াছিলেন। লোকপ্রিয়তায় তারাও বড় কম নহেন। শক্তির মত অবলোকিতেশ্বর জগৎটিও পাইয়াছিলেন ভাল, কাজেই দুইজনে মিলিয়া বর্তমান জগতের সংখ্যাতীত ভক্তবৃন্দের নিকট হইতে প্রচুর সমাদর অর্জন করিতে লাগিলেন,—যেরূপ সমাদর পরে দ্বাদশ শতাব্দী হইতে বৈষ্ণব-জগতে

(৫৮) Getty, *op cit.*, pp. 66—67.

(৫৯) *Ann. Rep. Dacca Museum*, 1940—41, p. 8.

শ্রীকৃষ্ণ ও রাধা লাভ করিয়াছিলেন। তারার কাজ, সকলকে ভবসাগর নিস্তরণ করিয়া দেওয়া। এই জন্যই তারা তারিণী, ত্রাণকর্ত্রী। এবং এই জন্যই সকলের নিকট তিনি এত আদৃতা। তিব্বতে তারাই একমাত্র প্রথম শ্রেণীর দেবতা যাঁহার নিকটে লামার মধ্যস্থতা ব্যতীতও ভক্তবৃন্দ সরাসরি প্রত্যক্ষভাবে প্রার্থনা জানাইতে পারেন, কাজেই সে দেশে তারার জনপ্রিয়তার সীমা নাই। বাঙ্গালাদেশে পাল-যুগে কি রকম কি বন্দোবস্ত ছিল বলা যায় না, কিন্তু তিনি যে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন সেটা তাঁহার আবিষ্কৃত মূর্তির সংখ্যা দেখিয়া আন্দাজ করা চলে।

তারারও কয়েক প্রকার রূপভেদ আছে, যথা শ্যামাতারা, পীততারা, সিতাতপত্রা বা শ্বেততারা ইত্যাদি। ইঁহারা কিন্তু একই ধ্যানী-বুদ্ধ হইতে উৎপন্ন নহেন। অর্থাৎ, ধ্যানী-বুদ্ধ ও বর্ণ-ভেদে প্রকার ভেদ। শ্যামাতারার অপর এক নাম খদিরবনী-তারা, এবং তিনি অমোঘসিদ্ধি হইতে উৎসৃষ্ট। শ্যামাতারার একটি বালুপ্রস্তরের মূর্তি ঢাকা-চিত্রশালায় আছে, মূর্তিটি অতি প্রাচীন। বামহস্তে স-নাল পদ্মধারিণী, নানা অলঙ্কারে শোভিতা, লীলাসনে উপবিষ্টা তারার নবম শতাব্দীর একটি প্রস্তরমূতি চট্টগ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে[৬০]। দ্বাদশ শতাব্দীর একটি কৃষ্ণ প্রস্তরের শ্যামাতারা-মূর্তি ঢাকা-সোমপাড়ায় আবিষ্কৃত হইয়া ঢাকা-চিত্রশালায় স্থান পাইয়াছে। এই মূর্তিটির প্রভাবলীতে পঞ্চ-ধ্যানীবুদ্ধের পরিবর্তে

(৬০) *ASI., Ann. Rep*, 1921—22, p. 82, No. 4.



বগুড়া গুণীর তারা
শ্রীযুক্ত সরসীকুমার সরস্বতীর সৌজন্যে

দেবীর মস্তকের দুই পার্শ্বে দুই সারিতে উপর হইতে নীচে চারিটি করিয়া অষ্টতারার মূর্তি খোদিত। মূর্তির পাঠের দক্ষিণ প্রান্তে বজ্রসত্ত্বের ক্ষুদ্র প্রতিমূর্তি খোদিত দেখিয়া মনে হয়, এই তারা বজ্রসত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হওয়ারও কোন সাধন আছে। সাধারণতঃ যে সকল বৌদ্ধ তারামূর্তি দেখা যায়, তাহা এই শ্যামাতারা-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, এবং তিব্বতীয়দের মতে, শ্যামাতারাই আদিতারা। তিনি ঐশী উদ্যমের প্রতিমূর্তি। নীলপদ্মধারিণী এই দেবীর মূর্তি কখনও স্থানক, কখনও আসন। মূর্তিতে সাধারণতঃ মারীচী ও একজটা তাঁহার দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকেন। বগুড়া-গুর্ণীতে আবিষ্কৃত একটি নবম-দশম শতাব্দীর খদিরবনী-তারার প্রস্তরমূর্তি রাজসাহী-চিত্রশালায় আছে[৬১]।

সিতাতপত্রা বা সিততারা বিশুদ্ধতা বা পবিত্রতার প্রতীক, এবং তিনিই অধ্যাত্ম বা লৌকিক জ্ঞানের প্রতিমূর্তি, যাহা লাভ করিয়া সাধক অনন্ত সুখের অধিকারী হন। সাধারণতঃ অবলোকিতেশ্বরের মূর্তিতে তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বের অধিকার লইয়া দাঁড়াইয়া থাকেন এই সিতাতপত্রা বা শ্বেততারা। কিন্তু ঢাকা-চিত্রশালায় অষ্টভুজা সিতাতপত্রার একটি নবম শতাব্দীর ধাতব স্বতন্ত্র মূর্তি আছে,—আসনমূর্তি, দেবীর একটি পা প্রলম্বিত হইয়া নীচে একটি পদ্মের উপর স্থাপিত। মূর্তিটি শিল্প-চাতুর্যেরও একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

---

(৬১) *A Note on the Additions to the VRS. Museum*, 1925—26, p. 1.

ঢাকা-সাহিত্যপরিষদে ত্রিশিরা ও অষ্টহস্তা, বীরাসনে উপবিষ্টা অতি সুন্দর এক নারীমূর্তি আছে, তাহাকে ভৃকুটি-তারা বলিয়া প্রাথমিক অনুমান করা হইয়াছে। এই অনুমান সত্য না হইলেও, মূর্তিটি কোনও বৌদ্ধ দেবীর এবং নবম-দশম শতাব্দীর। দেবীর বামে ঝাঁটা ও কুলা হস্তে হিন্দু শীতলা-দেবীকে দণ্ডায়মানা করিয়া রাখা হইয়াছে। রাজসাহী-চিত্রশালায়ও দিনাজপুরে প্রাপ্ত একটি ভৃকুটি-তারার ভগ্ন আসনমূর্তি আছে, সম্ভবতঃ উহা কোনও একটি বড় মূর্তির অংশ মাত্র। ভৃকুটি-তারা পীততারারই এক শ্রেণী-ভেদ মাত্র। বজ্রতারাও তাই। বজ্রতারার একটি ভগ্ন ধাতুমূর্তি ফরিদপুর-মাজবাড়ী হইতে ঢাকা-চিত্রশালায় সংগৃহীত হইয়াছে। বজ্রতারা রত্নসম্ভব হইতে উৎসৃষ্ট। পাহাড়পুরে একটি মৃণ্ময় বর্তুল-ফলকে খোদিত একটি অষ্টভুজা তারামূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। জাহাজডুবি, বজ্রপাত, হস্তী, চোর, সিংহ, সর্প, বন্ধনভয় এবং দানব, এই অষ্ট-ভীতি হইতে রক্ষা করিবার প্রতীক স্বরূপে সন্নিবেশিত এই অষ্টভুজ[৬২]। লীলাসনে উপবিষ্ট তারার রজতপত্রে মণ্ডিত একটি ব্রঞ্জমূর্তি চট্টগ্রামে রহিয়াছে[৬৩]। দিনাজপুর-অগ্রদিগুণে প্রাপ্ত একাদশ শতাব্দীর একটি তারার সুন্দর প্রস্তর-মূর্তি আশুতোষ-চিত্রশালায় আছে।

---

(৬২) *ASI., Ann. Rep.*, 1930—34, Part I, pp. 122—23, Part II, Pl. LX (e).

(৬৩) *A.S.I., Ann Rep.*, 1921—22, p. 82, No. 6.



ঢাকা-বজ্রযোগিনীর পর্ণশবরী
ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সৌজন্যে

একদা হইল কি, বছর কয়েক আগে, বগুড়া জেলায় প্রাপ্ত ব্রঞ্জের এক তারা-মূর্তি,—সর্বাঙ্গে তাঁহার স্বর্ণলেখার চিহ্ন তখনও লাগিয়া আছে,—চোখ দুটি রজতনির্মিত, বোধ করি সপ্তম শতাব্দীর মূর্তিই হইবে[৬৪],—বিশেষজ্ঞগণের চোখে ধূলি দিয়া, লক্ষ্মীর ছদ্মবেশে বিষ্ণুলোকে চলিয়াছিলেন আর কি,—কিন্তু ফ্রেঞ্চ সাহেব[৬৫] আর কে কে যথাসময়ে ধরিয়া ফেলায় ব্যাপারটা আর বেশী দূর গড়াইতে পারে নাই। মূর্তিটি এখন রাজসাহী-চিত্রশালায় স্থান পাইয়াছে। যাহা হোক্, উহার কালনির্দেশের অনুমানটি বিচারসহ হইলে, বুঝিতে হইবে চন্দ্রগোমীর গল্পে তারা-সাধনার যে কথা আছে, তাহা মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিবার নয়।

তারার এক অনুচারিনীর নাম পর্ণশবরী। ইঁহার নামটি দেখিয়া লোকের সন্দেহ, ইনি প্রথমে শবর প্রভৃতি হীন জাতির পূজা গ্রহণ করিতেন, পরে কি করিয়া বৌদ্ধ-দৈবতে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন। ইঁহার অনুরূপ ত্রিশির ও ষড়ভুজ বিশিষ্ট দুইটি প্রস্তরমূর্তি,—যেন দুইটি যমজ মূর্তি,—বিক্রমপুরে নয়নন্দ এবং বজ্রযোগিনী গ্রামে পাওয়া গিয়াছিল, এখন ঢাকা-চিত্রশালায় আছে। ইঁহার পরণে শাড়ী নয়, পর্ণাচ্ছাদন। ইঁহার ধ্যান-মন্ত্রেও ইঁহাকে 'পিশাচী' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ইঁহার পূর্বেতিহাস সত্য বলিয়া জানিলেও শিল্পী সেই ব্যপদেশে মূর্তি-নির্মাণে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেন নাই, বরঞ্চ এই

(৬৪) *Ann. Rep. VRS.*, 1926—27, Museum Notes, p. 5.

(৬৫) French, *op. cit.*, p. 23.

খর্বাকৃতি, স্ফীতোদরা দেবীটির উভয় মূর্তিরই তিনটি মুখে এত সুষমা ও এত দীপ্ত হাসি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন যে মূর্তিদ্বয়কে পাল-শিল্পের অন্যতম সম্পদ বলিয়াই গণ্য করিতে হয়। পর্ণশবরীরও রূপভেদ আছে। পীত-পর্ণশবরী অক্ষোভ্যের উৎসৃষ্ট, তিনি গণেশকে পদদলিত করেন। কলিকাতা-যাদুঘরে, বিহারে প্রাপ্ত, যে পর্ণশবরীর মূর্তি আছে, তাহা এই শ্রেণীর[৬৬]। কিন্তু ঢাকা-চিত্রশালার মূর্তিদ্বয় গণেশের পরিবর্তে ব্যাধি ও মহামারীকে পদতলে পিষ্ট করিতেছেন। এই দেবী হরিৎ-পর্ণশবরী, এবং ইনি অমোঘসিদ্ধি হইতে উৎপন্ন[৬৭]।

অবলোকিতেশ্বরের পরেই বৌদ্ধ-জগতে যে দেব লোকপ্রিয় হইয়াছিলেন, তিনি ধ্যানীবুদ্ধ অক্ষোভ্যের অধ্যাত্ম-পুত্র বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী। মঞ্জুশ্রীর পূজা যে গুপ্ত-যুগেই বাঙ্গালাদেশে প্রচলিত ছিল, তাহা মহাস্থানের স্বর্ণপত্রমণ্ডিত মঞ্জুশ্রী-মূর্তি প্রমাণ করিয়াছে। মহাযানীদের ধারণা, মঞ্জুশ্রীর পূজায় জ্ঞান ও পরাজ্ঞান, স্মৃতি ও ধৃতিশক্তি, বুদ্ধি ও বাকপটুতা এবং বহু শাস্ত্র-গ্রন্থাদি আয়ত্ত করিবার সামর্থ্য লাভ হয়। সংক্ষেপে, তিনি বিদ্যা ও সংস্কৃতির অধিষ্ঠাতৃ দেবতা, এবং সেই হেতু ইঁহার এত লোকপ্রিয়তা। বৌদ্ধ শাস্ত্রানুসারে ইনিই প্রথম বোধিসত্ত্ব। অথচ পাহাড়পুরে এই প্রথম বোধিসত্ত্বটির

(৬৬) Bloch's *Supplementary Catalogue of the Archæological Collection of the Indian Museum*, p. 95, No. 3957.
(৬৭) *Buddhist Iconography*, pp. 109—10.



ঢাকা-জলকুণ্ডির মঞ্জুশ্রী
ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সৌজন্যে

মৃণ্ময়, বা শৈল, বা ধাতব কোনও মূর্তিই আবিষ্কৃত হয় নাই। অন্যত্র যে মূর্তিগুলি বাঙ্গালায় আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার সংখ্যা দেবতার মাহাত্ম্যের তুলনায় খুবই কম, এবং সে কয়টিও আবার প্রায় সবই একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর। জ্ঞানের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বলিয়া তাঁহার মূর্তিতে কোনও এক হস্তে, অথবা হস্তধৃত-মৃণালের উপরে, একখানি পুস্তক, এবং অজ্ঞান বা মোহান্ধকার যে তরবারি দ্বারা ছেদন করেন, তাহা অপর কোনও হস্তে, অথবা কখনও কখনও একই মৃণালের উপর পুস্তকের সহিত, খোদিত থাকে। ঢাকা-যাদুঘরে মঞ্জুশ্রীর একটি মূর্তি আছে, মূর্তিটি কষ্টি পাথরের, দ্বাদশ শতকের, এবং ঢাকা-জালকুণ্ডিতে প্রাপ্ত। এই মূর্তির বিশেষত্ব এই যে, প্রভাবলীতে পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধ-মূর্তির মধ্যে অমোঘসিদ্ধির মূর্তি নাই। বীরভূম-বরা গ্রামে আবিষ্কৃত একটি মূর্তিকে মঞ্জুশ্রী বলিয়া নির্ণয় করা হইয়াছে [৬৮]। দিনাজপুরে আবিষ্কৃত ও রাজসাহী চিত্রশালায় রক্ষিত, একটি স্থানক মঞ্জুশ্রী-মূর্তি ষড়্ভুজ। এই চিত্রশালায় রাজসাহী-তলান্দায় প্রাপ্ত, সিংহের উপর ললিতাসনে উপবিষ্ট একটি দ্বিভুজ করণ্ড-মুকুট শোভিত, অলঙ্কৃত ও সুশ্রী একাদশ-দ্বাদশ শতকের মঞ্জুশ্রী-মূর্তি আছে। হস্ত দুইটি ধর্মচক্র-মুদ্রায় বুকের উপর নিবদ্ধ, এবং পুস্তকটি আছে বাম বাহুতে ধৃত একটি স-নাল উৎফুল্ল পদ্মের উপর। বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদে মালদহের যে প্রসিদ্ধ স্থিরচক্রের

---

(৬৮) *ASI., Ann. Rep., Eastern Circle,* 1920—21, p. 27, Pl. 1.

মূর্তিটি আছে, তাহা সম্ভবতঃ মঞ্জুশ্রীরই একটি স্বাধীন রূপভেদ। এই মূর্তিটির বাম হস্তে ধৃত একটি স-নাল পদ্মের উপর পুস্তক ও তরবারি উভয়ই রক্ষিত।

মঞ্জুশ্রীর শক্তি সরস্বতী বা বাগীশ্বরী। তিনিও, ভর্তার মতই, জ্ঞান-বিজ্ঞানের দেবী। বৌদ্ধ সরস্বতীর বা বাগীশ্বরীর মূর্তিও বাঙ্গালা দেশে অতি অল্পই আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে ঢাকা-সোনারঙ্গে প্রাপ্ত ও রাজসাহী-চিত্রশালায় রক্ষিত অষ্টভুজা, ক্ষুদ্র, ধাতু-নির্মিত বাগীশ্বরী মূর্তিটিই উল্লেখযোগ্য। ব্রহ্মণ্য সরস্বতীকে কখনও সাবিত্রীর সপত্নীরূপে ব্রহ্মার, কখনও লক্ষ্মীর সপত্নীরূপে বিষ্ণুর পাশে বীণা হস্তে থাকিতে দেখা যায়। স্বতন্ত্র, ব্রহ্মণ্য, পদ্মাসনা, শুভ্রা, সরস্বতীর মূর্তিতে বাহনরূপে মরাল থাকিলে তিনি বিষ্ণুর, এবং মেষ থাকিলে তিনি ব্রহ্মার গৃহিণী। বৌদ্ধ বাগীশ্বরীর হস্তে বীণা থাকে না, তাঁহার বাহনও মরাল বা মেষ নয়। দ্বিতীয় গোপালদেবের প্রথম রাজ্যাঙ্কে নির্মিত, বিহারে প্রাপ্ত, ও নালন্দায় প্রতিষ্ঠিত একটি বৌদ্ধ বাগীশ্বরী-ভট্টারিকার স্বর্ণমণ্ডিত মূর্তিতে দেখা যায়, সিংহবাহনা, অর্ধ-পর্যঙ্কলীলায় উপবিষ্টা এই চতুর্ভুজা দেবীর এক হস্তে কুঠার, এক হস্তে গদা বা ঐ জাতীয় কোনও আয়ুধ, আর অপর দুই হস্ত দ্বারা তিনি দুই দানব বা রাক্ষসের জিহ্বা দুই সাঁড়াশি দিয়া নিষ্কাশিত করিতেছেন[৬৯]। ধর্মপালের খালিমপুর-তাম্রশাসনে একটি 'কাদম্বরী দেবকুলিকা'র উল্লেখ আছে, কিন্তু তিনি ব্রহ্মণ্য কি বৌদ্ধ কাদম্বরী, তাহা অনির্ণেয়।

(৬৯) Bloch, *op. cit*, pp. 87—88, No. 3947.



রাজসাহী তালন্দের মঞ্জুবর
শ্রীযুক্ত সরসীকুমার সরস্বতীর সৌজন্যে

হিন্দু-দৈবতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব মিলিয়া যেমন ত্রিমূর্তি গঠন করিয়াছেন, বোধিসত্ত্ব মণ্ডলীতেও তেমনই মঞ্জুশ্রী, অবলোকিতেশ্বর ও বজ্রপাণি কর্তৃক বৌদ্ধ ত্রিমূর্তি নিষ্পাদিত। বজ্রপাণিও অক্ষোভ্যেরই অধ্যাত্ম-সুত। তিনি শক্তির দেবতা। তিনি বৃষ্টিরও দেবতা, এবং যখনই বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন হয়, তখন বজ্রপাণিকে ধ্যানে স্মরণ করিতে হয়। এই শক্তিমান দেবতাই আবার দানব. রাক্ষস প্রভৃতিরও নিসূদন। কিন্তু মূর্তিতে তাঁহাকে একাকী কদাপি দেখা যায়। মূর্তিতে তাঁহার আবির্ভাব প্রায়শঃই মঞ্জুশ্রী এবং অবলোকিতেশ্বরের সহিত একত্রে। ত্রিমূর্তিতে জ্ঞানের দেবতা মঞ্জুশ্রীর স্থান প্রথম; করুণার দেবতা অবলোকিতেশ্বর মঞ্জুশ্রী অপেক্ষা অধিকতর জনপ্রিয় হইলেও বোধিসত্ত্ব হিসাবে তাঁহার স্থান দ্বিতীয়, এবং শক্তির দেবতা বজ্রপাণির স্থান তৃতীয়। বৌদ্ধ ত্রিমূর্তিতে অবলোকিতেশ্বরের স্থান,—হিন্দু ত্রিমূর্তিতে বিষ্ণুর স্থানেরই অনুরূপ। কখনও কখনও পদ্মপাণি ত্রিমূর্তিতে অবলোকিতেশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করিয়া থাকেন। বজ্রপাণির একটি মনুষ্য-প্রমাণ কষ্টি-পাথরের মূর্তি ত্রিপুরা-শুভপুরে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এবং এইটিই বোধ হয় বাঙ্গালায় প্রাপ্ত একমাত্র বজ্রপাণি-মূর্তি। কলিকাতা-যাদুঘর হইতে প্রাপ্ত বালু-প্রস্তরের একটি বোধিসত্ত্ব-মূর্তি রাজসাহী-চিত্রশালায় আছে, সেটিকে মৈত্রেয়ের মূর্তি বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। ভাবীবুদ্ধ, তুষিত-স্বর্গবাসী মৈত্রেয়ের মূর্তিও বাঙ্গালায় সম্ভবতঃ আর পাওয়া যায় নাই।

মঞ্জুশ্রীর পরেই বাঙ্গালাদেশের মূর্তিতত্ত্বে লোকপ্রিয়তার দিক হইতে মারীচী ও হারিতী নাম্নী দেবীদ্বয়, এবং জম্ভল নামক দেবের উল্লেখ করিতে হয়। মারীচী বৈরোচন হইতে উৎপন্ন। কখনও কখনও তিনি আবার নাকি বৈরোচনের শক্তি[৭০]। 'মারীচী'র শব্দগত অর্থ অংশু বা কিরণ। কাজেই তিনি 'ঊষাদেবী'। তাঁহার সাধনে তাঁহাকে দেখা যায়, তিনি রথারূঢ়া, এবং সেই রথখানি অগ্নিশিখার মত কিরণজালে সমাচ্ছন্ন। রাহু-কর্তৃক চালিত তাঁহার রথ যে সপ্ত-শূকরে টানে তাহারা ব্রহ্মণ্য সূর্যের সপ্তাশ্বেরই অনুকরণ। মূর্তিতে তাঁহার তিন আননের বামেরটি শূকরীর আনন। তিনি অষ্টভুজা, তাঁহার হাতে থাকে বজ্র, অঙ্কুশ, শর, অশোকপত্র, সূচী, ধনু ও পাশ, এবং অবশিষ্ট হস্তটি তর্জনী-মুদ্রায়। তিনি প্রত্যালীঢ়-লীলায় রথে দণ্ডায়মান। সঙ্গে তাঁহার আরও চারিটি অনুচরী থাকে। ঢাকা-চিত্রশালায় মারীচীর অন্ততঃ পাঁচটি এবং রাজসাহী-চিত্রশালায় অন্ততঃ চারিটি ভগ্নাভগ্ন মূর্তি আছে।

দেবী হারিতী জম্ভলের শক্তি। তিনি ধনদাত্রীও বটে, আবার হিন্দুর ষষ্ঠীদেবীর মত তিনি শিশু-রক্ষিত্রী ও শিশুমঙ্গল-বিধাত্রী। নেপালে তিনি আবার শীতলার মত বসন্ত রোগ দূর করিয়া থাকেন। ঢাকা-চিত্রশালায় হারিতীর একটি ও রাজসাহী-চিত্রশালায় অন্ততঃ চারিটি ধাতব ও শৈল মূর্তি আছে।

---

(৭০) *Buddhist Iconography*, p. 93.

হারিতী-কান্ত জম্ভল ব্রহ্মণ্য কুবেরের প্রতিকায়। কিন্তু আকৃতিটি তাঁহার কতকটা গণেশের মত লম্বোদর ও খর্বকায়। ঢাকা-চিত্রশালায় জম্ভলের যে পাঁচ ছয়টি মূর্তির সংগ্রহ আছে, তাহার একটি ছোট প্রস্তর-মূর্তিতে নবম শতাব্দীর উৎকীর্ণ লেখ আছে। দিনাজপুর-মঙ্গলবাড়ীতে প্রাপ্ত রাজসাহী-চিত্রশালার জম্ভলের প্রস্তর-মূর্তিটিও ছোট[৭১]। বাঙ্গালার সমস্ত জম্ভল-মূর্তির মধ্যে বিক্রম-পুরের ও রাজসাহী-ধুরাইলের একাদশ-দ্বাদশ শতকের মূর্তিদ্বয় শিল্পের দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য। মূর্তিগুলিতে আছে জম্ভলের একটি প্রলম্বমান পদমূলে উল্টামুখ মুদ্রাভাণ্ড, আর বাম হস্তে উৎকন্ধর রত্নোদ্গীর্ণ নকুল। জম্ভল ধ্যানীবুদ্ধ রত্নসম্ভব, বা অক্ষোভ্য অথবা বজ্রসত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হইতে পারেন, কিন্তু রত্নোদ্গীর্ণ নকুল খোদিত থাকায় প্রমাণিত হয়, বাঙ্গালার জম্ভল-মূর্তিগুলি রত্নসম্ভব হইতে উৎপন্ন। কিন্তু চট্টগ্রামে প্রাপ্ত লীলাসনে উপবিষ্ট একটি জম্ভল-মূর্তির বাম হস্তে একটি ক্ষুদ্র হস্তীমূর্তি ধৃত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে[৭২]। বৌদ্ধ কুবেরের ক্ষুদ্র প্রস্তরমূর্তি পাহাড়পুরেও পাওয়া গিয়াছে[৭৩]।

অপরাপর দেবতার মধ্যে হেরুকের কষ্টি-পাথরের একটি একাদশ শতাব্দীর দ্বিভুজ মূর্তি ত্রিপুরার বড়-কামতা হইতে

(৭১) *A Note on the Additions to the VRS. Museum*, 1925—26, p. 2.
(৭২) *ASI., Ann. Rep.*, 1921—22, p. 82, No. 10.
(৭৩) *ASI., Ann. Rep.*, 1926—27, Part I, p. 118.

ঢাকা-চিত্রশালায় সংগৃহীত হইয়াছে। মূর্তির শীর্ষে অগ্নিশিখাময় জটার মধ্যে খোদিত অক্ষোভ্যের প্রতিমূর্তিই বলিয়া দেয়, তিনি অক্ষোভ্য হইতে উৎপন্ন। দেবতা হিসাবে হেরুক সংসারের সকল মারগণকে করেন বিধ্বস্ত, আর তাঁহার ভক্তগণকে প্রদান করেন বুদ্ধত্ব। অতএব তিনি নিতান্ত তুচ্ছ দেবতা নহেন। হার, কেয়ূরাদি অলঙ্কার এবং আজানুলম্বিত মুণ্ডমালা শোভিত নর্তন-রত মূর্তিটির হস্ত দুইটিই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই নীলবর্ণ দেবতা সাধনে ঘোর ও বিকটদর্শন হইলেও, মূর্তিটির আননে প্রসন্ন দেবতার হাসির স্পর্শ রহিয়াছে। কলিকাতা-যাদুঘরে শ্রীযুক্ত আচার্য বিমলাচরণ লাহা মহাশয় কর্তৃক উপহৃত উত্তর-বঙ্গের মূর্তিসমূহের মধ্যে একটি সম্বর-মূর্তি আছে[৭৪], এবং সম্বর হেরুকেরই রূপভেদ মাত্র। নেপালে ও তিব্বতে সম্বরের পূজা যথেষ্ট প্রচলিত আছে, কিন্তু সম্বরের মূর্তি ভারতে বড় একটা মিলেনা। এই মূর্তিটিতে সম্বর চতুর্মুখের পরিবর্তে ত্রিমুখ, দ্বাদশভুজ এবং আলীঢ় ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান। একহস্তে তিনি যে একটি বহুমুখী দেবতার মস্তক ধারণ করিয়া আছেন, সেটি সম্ভবতঃ ব্রহ্মা, কিন্তু বাঙ্গালার পর্ণশবরী যেমন গণেশকে পদদলিত করিতে স্বীকৃত হন নাই, বাঙ্গালার এই সম্বরও তেমনই ব্রহ্মাকে পদদলিত করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন।

হেবজ্রের যে তিনটি মূর্তি এযাবৎ বাঙ্গালায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার একটি পাহাড়পুরের ধ্বংসাবশেষ হইতে। অতএব হেবজ্রের

(৭৪) *ASI. Ann. Rep.*, 1934—35., p. 80, Pl. XXIV(c).



নাহার-সংগ্রহের হেবজ্র
শ্রীযুক্ত সরসীকুমার সরস্বতীর সৌজন্যে

পূজার উৎপত্তি একেবারে দ্বাদশ শতাব্দীতে গিয়া হয় নাই, এবং বাঙ্গালার বৌদ্ধ-সাহিত্য আলোচনা করিলেও এই জাতীয় ধারণার অসারতা ধরা পড়ে। অপর একটি মূর্তি ও উত্তর-বঙ্গে আবিষ্কৃত, এবং কলিকাতায় মুর্শিদাবাদ-আজিমগঞ্জের নাহার-সংগ্রহে সুরক্ষিত আছে। অষ্টশির, ষোড়শভুজ, কতগুলি মৃত শরের উপর প্রসারিত পদে দণ্ডায়মান, যুগনদ্ধ হেবজ্র এই অপূর্ব মূর্তিটিতে তাঁহার ক্রোড়স্থিত শক্তির (সম্ভবতঃ বজ্রবারাহীর) নাকে নাক রাখিয়া উভয়ে উভয়ের দুই বাহুতে দৃঢ়ালিঙ্গনাবদ্ধ (yab yum)। মূর্তিটির শিল্পনৈপুণ্য গর্বিত স্পর্ধায় ভাষার বর্ণনকে অতিক্রম করিয়া যায়। তৃতীয় হেবজ্র মূর্তিটি ঢাকা-চিত্রশালায় আছে, সেটি ধাতব, শক্তি-বিহীন, এবং একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর। দেবতা হিসাবে হেরুক ও হেবজ্র অনুরূপ। একক হেরুক বা হেবজ্রের অন্ততঃ ছয়টি, এবং যুগনদ্ধ হেরুক বা হেবজ্রের অন্ততঃ আঠারটি, প্রকারভেদের সন্ধান এ যাবৎ পাওয়া গিয়াছে।

ঢাকা-পশ্চিমপাড়ায় আবিষ্কৃত, রাজসাহী-চিত্রশালার ত্রিমুখ, চতুর্ভুজ, বিকটদর্শন ত্রৈলোক্য-ভস্মংকরের, হিন্দু ভৈরবের আদর্শে গঠিত, মূর্তিটি ব্যতীত আর ইঁহার কোনও মূর্তি পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানিনা। এতদ্ব্যতীত, দুইটি দেবী মূর্তি আছে উল্লেখযোগ্য, একটি মহাপ্রতিসরার, অপরটি চুণ্ডার। মহাপ্রতিসরা 'পঞ্চরক্ষা'র,—অর্থাৎ বুদ্ধ নাকি যে সকল যাদুমন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন যাহা সকলকে নানাবিধ অকল্যাণ ও শারীরিক বিপদ হইতে রক্ষা করে,—সেই

সকল মন্ত্রের মূর্তিমতী পঞ্চ-দেবীর, অন্যতম। এই মূর্তিটি একাদশ শতাব্দীর, শিল্পনিদর্শন হিসাবে মূল্যবান, এবং ঢাকা-চিত্রশালার সম্পত্তি। অষ্টাদশভুজা চুণ্ডাদেবীর আসন মূর্তিটি রাজসাহী-নিয়ামৎপুরে পাওয়া গিয়াছিল। মূর্তিটি বয়সে প্রাচীন, মুখটি ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, সম্ভবতঃ ইহা নবম শতাব্দীর। রাজসাহী-চিত্রশালায় ইহা রক্ষিত আছে। বৌদ্ধ অপর এক দেবীর, উষ্ণীষ-বিজয়ার, একটি বিক্ষত মূর্তি বীরভূম জেলায় আবিষ্কৃত হইয়াছে[১৫]। হয়ত আরও অনেকানেক দেব-দেবীর মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়া নানা সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে, সন্ধান রাখিনা।

মহাযান, বজ্রযান প্রভৃতির সাধনোল্লিখিত অসংখ্য দেব-দেবীর মধ্যে পাল-যুগে বাঙ্গালার সাধারণ বৌদ্ধ চিত্ত কোন্ কোন্ দেবতার প্রতি বেশী আকৃষ্ট হইয়াছিল, এই মূর্তিগুলির দ্বারা তাহার কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে, এবং আরও আভাস পাওয়া যাইত যদি না এই মূর্তিগুলি সমগ্র মূর্তি-সমূহের এক ভগ্নাংশ মাত্র হইত। মূর্তিতত্ত্বের বিশ্লেষণে যে সকল তথ্য পাওয়া গেল, পাল-যুগে রচিত বৌদ্ধ সাহিত্য দ্বারা তাহা কতদূর সমর্থিত হয়, বা না হয়, তাহা দেখা প্রয়োজন। কিন্তু তাহা দেখিতে হইলে আগে স্থির করিতে হইবে লেখকদিগের মধ্যে কে কে বাঙ্গালী।

মহাযান এবং মন্ত্রযানের তিন ধারার ভিতর দিয়া সারা ভারতবর্ষে

(১৫) *Ann. Rep. Arch Surv. Ind., Eastern Circle*, 1920—21, p. 27.

যে এক বিরাট ধর্ম-সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার মাত্র একাংশ তিব্বতীয়গণের রুচি অনুসারে, প্রধানতঃ একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে, কাশ্মীর, নেপাল, মগধ ও বাঙ্গালার নানা বিহারে এবং তিব্বতে অনুবাদিত হইয়াছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তিব্বতীয় লামা বু-তোন্ কর্তৃক সঙ্কলিত তিব্বতীয় জ্ঞানভাণ্ডার 'তেঙ্গুরে' এই সকল অনূদিত গ্রন্থগুলির অধিকাংশই রক্ষিত আছে, মূল সংস্কৃত ভাষায় কিছু পুস্তক নেপালে (এবং খানকয়েক অন্যত্রও) পাওয়া গিয়াছে। আর বাকী সব বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। তিব্বতীয় অনুবাদে 'তেঙ্গুরে' সংরক্ষিত গ্রন্থগুলির মধ্যে আবার এক ভগ্নাংশ মাত্র বাঙ্গালীর রচনা। কোনও কোনও গ্রন্থকার বা টীকাকার বাঙ্গালী কিনা তাহাও নিরূপণ করা অতীব দুরূহ। কাজেই 'তেঙ্গুরে'র গ্রন্থগুলি দেখিয়া বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্মের যে ধারণা লাভ করা যায়, তাহা মূর্তিতত্ত্ব হইতে লব্ধ ধারণার মতই আংশিক ও অসম্পূর্ণ। 'তেঙ্গুরে' অনুবাদিত গ্রন্থগুলিকে দুই সাধারণ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, 'বৌদ্ধতন্ত্র' (Rgyud), এবং 'বৌদ্ধসূত্র' (Mdo), এবং ইহাদের অধিকাংশই প্রথম ভাগের অন্তর্ভুক্ত। প্রকারান্তরে বলিতে গেলে, বেশীর ভাগ গ্রন্থই বজ্রযানীয়।

বজ্রযান প্রথমতঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে দক্ষিণ-ভারতে সম্মিতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্ভূত হইয়া পরে সরোহ প্রভৃতি আচার্যগণের উদ্যমে উত্তর-ভারতে প্রচারিত হইয়াছিল, কেহ কেহ এইরূপ মত প্রকাশ

করিয়াছেন[৭৬]। দক্ষিণ-ভারতে বজ্রযানের উৎপত্তি সম্বন্ধে বহু পরবর্তী কালের একটি বৌদ্ধ কিম্বদন্তীও আছে[৭৭]। পক্ষান্তরে, প্রবলতর এক কিম্বদন্তীতে বজ্রযানের উদ্ভব হইয়াছিল 'উড্ডিয়ানে'[৭৮]। এই কোনও কিম্বদন্তীই সত্য না হইতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালায় বজ্রযানের ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে সর্বপ্রথম এই উড্ডিয়ানের অবস্থান নির্ণয় করা প্রয়োজন। ইহার অবস্থান নির্ণয়ের জন্য কিছু কিছু চেষ্টাও হইয়াছে। কেহ বলিয়াছেন উড্ডিয়ান ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও হিন্দুকুশের মধ্যবর্তী সোয়াট্ উপত্যকা; কেহ বলিয়াছেন পূর্ব-তুর্কীস্থানের কাস্গর; কেহ বলিয়াছেন উড়িষ্যা; আবার কেহ বলিয়াছেন বাঙ্গালার পূর্বোত্তর সীমান্তে এবং শ্রীহট্ট ও কামাখ্যার নিকটে কোথাও। কিন্তু অনুমান হয়, এই উড্ডিয়ান বাঙ্গালার মধ্যেই কোনও স্থান বিশেষ। কারণ, একই গ্রন্থে যে পণ্ডিতকে 'বাঙ্গালী' বলা হইয়াছে, অপর এক গ্রন্থে তাঁহাকেই বর্ণিত দেখি 'উড্ডিয়ান-বিনির্গত' বলিয়া, অথবা এক গ্রন্থে যাঁহাকে দেখি 'উড্ডিয়ান-বিনির্গত', অপর গ্রন্থে কিংবা সেই গ্রন্থেরই অপর স্থানে তাঁহাকে দেখি 'বাঙ্গালী' বলিয়া। যথা, 'পগ্ সাম্ জোন্ জ্যঙ্গে' লুইপাদ উড্ডিয়ান-বিনির্গত,

(৭৬) *Journal Asiatique,* Tome CCXXV, No. 2, Buddhistic Researches, Rahula Sankrityana.

(৭৭) S. B. Das Gupta, *op. cit.,* p. 17.

(৭৮) *Ind. Hist. Quarterly* March, 1935, pp. 142—44, এই উড্ডিয়ান ও সাহোর প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

'তেঙ্গুরে'র একস্থানে এই লুইপাদই আবার বাঙ্গালার অধিবাসী। আবার 'তেঙ্গুরে' সরোহ বা সরহ উড্ডিয়ান-বিনির্গত, 'পগ্ সাম্ জোন্ জ্যঙ্গে' সরোহই আবার বঙ্গালের অধিবাসী। তেমনই আবার 'তেঙ্গুরে'র একস্থানে অবধূতপাদ-অদ্বয়বজ্র উড্ডিয়ান-বিনির্গত, আবার 'তেঙ্গুরে'রই অপরস্থানে অদ্বয়বজ্র বাঙ্গালী। এই কারণকে কিছুতেই উপেক্ষা করা চলে না। আর এক কথা, 'তেঙ্গুরে'র একস্থানে পাই, তৈলিকপাদ নামে এক বিখ্যাত পণ্ডিত উড্ডিয়ানের অধিবাসী ছিলেন, 'পগ্ সাম্ জোন্ জ্যঙ্গে'র বর্ণনায় এই তৈলিকপাদই চট্টগ্রামের এক ব্রাহ্মণ। এই হিসাবে মনে হয়, উড্ডিয়ান ছিল চট্টগ্রাম অঞ্চলের কোথাও। কিন্তু আবার দেখি, 'পগ্ সাম্ জোন্ জ্যঙ্গে'র সাক্ষ্যে নাগবোধি নামক পণ্ডিত জন্মিয়াছিলেন বরেন্দ্রের শিবসের নামক গ্রামে, কিন্তু নাগবোধির নিজের একখানি গ্রন্থে লিখিত আছে, তিনি উড্ডিয়ান-বিনির্গত। এই দিক দিয়া মনে হয়, উড্ডিয়ান উত্তর-বঙ্গের কোনও অংশে, সম্ভবতঃ গৌড়ের সন্নিহিত কোনও স্থানে। কিন্তু কোনও দিক দিয়াই মনে হয় না, এই উড্ডিয়ান ভারতের উত্তর-পশ্চিম বা উত্তর-পূর্ব সীমান্তের স্থান বিশেষ। উড্ডিয়ানে বজ্রযানের উৎপত্তির জনশ্রুতি সত্য হোক্ বা না হোক্, সোয়াট্ উপত্যকার 'উদ্যান' অপর এক 'উড্ডিয়ানে'র সহিত অভিন্ন হোক্ বা না হোক্, আলোচ্য উড্ডিয়ানকে বাঙ্গালার বাহিরে কোথাও কল্পনা করিলে, বাঙ্গালার তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস পঙ্গু হইয়া পড়ে। এই উড্ডিয়ানের সহিত আর একটি স্থান

সংশ্লিষ্ট, তাহার নাম 'সাহোর'। কিন্তু ইহারও অবস্থান নির্ণয় কম দুঃসাধ্য নয়। সিলভঁা লেভির মতে, সাহোর গোটা হিন্দুস্থানের নাম; ফ্রাঙ্ক সাহেব বলেন, পাঞ্জাবের মাণ্ডিই সাহোর; ইত্যাদি। অথচ 'পগ্ সাম্ জোন্ জ্যঙ্গে' শান্তরক্ষিতের প্রসঙ্গে পরিষ্কার দেখিতে পাই, এক স্থানে তিনি 'বাঙ্গালী', আর একস্থানে তিনি সাহোরের রাজবংশোদ্ভূত। অপর এক বিবরণে দেখিতে পাওয়া যায়, শান্তরক্ষিত গৌড়ের অধিবাসী[৭৯]। সাহোরও তাহা হইলে বাঙ্গালারই কোনও স্থান বিশেষ। সাহোর বা জাহোরের শান্তরক্ষিতের ভগিনীর সহিত উড্ডিয়ানের ইন্দ্রভূতির পুত্রের বিবাহের একটা কাহিনী আছে। এই কাহিনীর মূল্য কতখানি জানি না, কিন্তু কাহিনীতে বলে, উড্ডিয়ান-রাজ ইন্দ্রভূতির পুত্র পদ্মসম্ভব প্রজাদের উপর অত্যাচার করায় ইন্দ্রভূতি পুত্রকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিয়া দেন, এবং পদ্মসম্ভব নানাস্থানে ভ্রমণান্তর সাহোরে বা জাহোরে আসিয়া শান্ত (বা শান্তি-) রক্ষিতের ভগিনী মন্দরবাকে বিবাহ করেন। এই কাহিনী সত্য যদি বা হয়, ইহার দ্বারা সাহোর ও উড্ডিয়ান এই দুই স্থানের সান্নিধ্য প্রমাণ হয়না, কারণ ইহাতে পদ্মসম্ভবের "নানাস্থানে ভ্রমণের" কথা রহিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালী বা গৌড়ের অধিবাসী শান্তরক্ষিতই আবার সাহোরের রাজবংশোদ্ভূত হইলে, সাহোর নিঃসংশয়ে বাঙ্গালারই কোনও স্থান হইয়া পড়ে। কিন্তু স্থানটি কোথায়? কাহারও মতে, সাহোর

(৭৯) *J.B.T.S.*, Vol. I, 1893, Sarat Ch. Das, p. 1 f.

ঢাকা জেলার ‘সাভার’ এই দুই নামের সাদৃশ্য হেতু প্রস্তাব করিয়াছেন, সাভারই সাহোর। কিন্তু পক্ষান্তরে দেখা যায়, বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ স্মার্তদিগের অন্যতম রাঢ়ীয় শূলপাণি উপাধ্যায় (আনুঃ ১৪০০ খৃঃ) নিজের পরিচয় দিয়াছেন ‘সাহুরিয়ান’, অর্থাৎ সাহুরের অধিবাসী, বলিয়া। শূলপাণির এই আদি বাসস্থান ‘সাহুর’ বা জাহোর যশোর (যশোহর); কেহ আবার ‘সাহোর’ এবং রাঢ়ের অথবা বাঙ্গালার যে স্থানেই হোক্, উহা শান্তরক্ষিত প্রভৃতির ‘সাহোর’ হইলেও হইতে পারে, অন্ততঃ হওয়াটা বিচিত্র নয়। বিচিত্র যদি বা হয়, তবুও ‘সাহোর’ ‘হিন্দুস্থান’ নয়, ‘মাণ্ডি’ নয়,—উহা বাঙ্গালারই কোনও স্থান, কারণ তিব্বতীয় অপর এক জনশ্রুতিতে বাঙ্গালার নরপতি ধর্মপালকেও ‘সাহোরের রাজা’ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বাঙ্গালী অতীশ দীপঙ্করের প্রসঙ্গেও, তিনি সাহোরের রাজবংশোদ্ভূত বলিয়া একটা উল্লেখ পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন মহাশয় পাইয়াছেন বলিয়া বলিয়াছেন, যদিও সেই উল্লেখ দ্বারা তিনি সাহোরকে বিহার-প্রদেশের স্থান-বিশেষ কল্পনা করিয়া অতীশ দীপঙ্করকে অ-বাঙ্গালী প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

উড্ডিয়ান বাঙ্গালায় হইলে, ইন্দ্রভূতি, লুইপাদ, অনঙ্গবজ্র, থগন, তৈলিকপাদ, সরোহ অবধূতপাদ, নাগবোধি, জ্ঞানবজ্র, বুদ্ধজ্ঞানপাদ, অমোঘনাথ, ধর্মশ্রীমিত্র প্রভৃতি উড্ডিয়ান-বিনির্গত অনেক তান্ত্রিক বৌদ্ধ-পণ্ডিতই বাঙ্গালী ছিলেন, এবং সাহোরও বাঙ্গালায়

হইলে, শান্তিদেব, শান্তরক্ষিত, কর্মপাদ প্রভৃতি পণ্ডিতগণও বাঙ্গালী ছিলেন। কিন্তু উড্ডিয়ান ও সাহোরের অবস্থান সম্বন্ধে এই অনুমান, অথবা যে কোনও অনুমানই, ভুলের অতীত বা অনুমানের অধিক অন্য কিছু নয়, তাহা বলা বাহুল্য। নূতন আবিষ্কারের আলোক-সম্পাত না হওয়া পর্যন্ত এই সমস্যার সমাধান হওয়া অসম্ভব।

ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে তিব্বতের রাজা স্রং-সান্ গাম্-পো'র সময়েই বৌদ্ধধর্ম তিব্বতে প্রবেশ লাভ করে, কিন্তু অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্তও তিব্বতে ভূত-পেত্নী, পিশাচ-দানব, রাক্ষস-যক্ষ প্রভৃতির উপাসনা সম্বলিত 'বন্‌পা' ধর্মই প্রবল ছিল। স্রং-সান্ গাম্-পো'র বংশধর প্রবল পরাক্রমশালী খ্রি-স্রং-দি-ৎসান্ ছিলেন বৌদ্ধ, তাঁহাকে বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রীর অবতার বলিয়া মনে করা হয়। তাঁহার রাজ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রসারের জন্য তিনি শান্তরক্ষিতকে তিব্বতে আহ্বান করেন। শান্তরক্ষিত ছিলেন তখন নেপালে। তিব্বতে গিয়া তিনি মাস চারেক অবস্থান করিয়া বৌদ্ধ-ধর্ম প্রচার করিতে না করিতেই নাকি তিব্বতের দেবতা ও উপদেবতাগণ এমন রাগিয়া গেলেন যে, তিব্বতে নানারকম নৈসর্গিক বিপর্যয় ও উৎপাত ঘটিতে আরম্ভ করিল, এবং শান্তরক্ষিতকেও অগত্যা বাধ্য হইয়া নেপালে ফিরিয়া আসিতে হইল। কিছুকাল পরে রাজার অনুরোধে তিনি দ্বিতীয়বার গেলেন তিব্বতে, এবং সেবারেও তাঁহার ধর্মপ্রচারে উপদেবতাগণ ঐরূপ দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়া দিল। ইহাদের

সহিত আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া শান্তরক্ষিত তাঁহার ভগিনীপতি পদ্মসম্ভবকে তিব্বতে আনয়ন করিতে রাজাকে পরামর্শ দিলেন, কারণ এই সকল প্রেত, যোনি, পিশাচ প্রভৃতিকে যাদুমন্ত্র প্রভাবে কি করিয়া সায়েস্তা করিয়া দিতে হয়, তাহা পদ্মসম্ভবের জানা ছিল। পদ্মসম্ভব রাজার নিমন্ত্রণে তিব্বতে গিয়া অত্যল্পকালের মধ্যেই সেই সকল দুষ্ট অপদেবতাগণকে বশীভূত করিয়া দিলেন, এবং তিব্বতে যে 'লামা' সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিলেন তাহার ফলে 'বন্‌পা' ধর্ম দুর্বল হইয়া গেল, আর মাথাই তুলিতে পারিল না। খ্রি-স্রং-দি-ৎসান্ শান্তরক্ষিত ও পদ্মসম্ভবের উপর অত্যন্ত প্রীত হইয়া মগধের উদ্দণ্ডপুর বা ওদন্তপুরী মহাবিহারের আদর্শে 'স-য়ে' (Sma-ye) নামে তিব্বতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিহারটি নির্মাণ করিয়া দিলেন। পদ্মসম্ভব অন্যান্য দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের নিমিত্ত চলিয়া গেলেন, শান্তরক্ষিত তিব্বতেই রহিয়া গেলেন, এবং তের বৎসর কাল স-য়ে-বিহারের অধ্যক্ষতা করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে হোসাঙ্ মহাযান নামে চৈনের একজন প্রচারক তিব্বতে আসিয়া শান্তরক্ষিতের প্রচারিত বৌদ্ধধর্মের বিরোধী এক প্রকার বিকৃত বৌদ্ধধর্ম তিব্বতে প্রচারের জন্য সচেষ্ট হইলেন। তাঁহার সহিত তর্কে না পারিয়া শান্তরক্ষিত মগধ হইতে তাঁহার শিষ্য কমলশীলকে তিব্বতে আনাইবার জন্য রাজদূত পাঠাইলেন, কিন্তু কমলশীল তিব্বতে আসিয়া পৌঁছিবার পূর্বেই শান্তরক্ষিত দুর্ঘটনায় প্রাণত্যাগ করিলেন।

কমলশীল হোসাঙ্‌কে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করিয়া শান্তরক্ষিতের মতবাদের যাথার্থ্য প্রমাণ করিলেন।

তিব্বতের খ্রি-স্রং-দি-ৎসান্ ছিলেন বাঙ্গালার ধর্মপালের (আনুঃ ৭৬০-৮১৫ খৃঃ) সমসাময়িক, এবং নানা গ্রন্থাদিতে তাঁহার সম্বন্ধে যত তারিখ প্রদত্ত আছে, তন্মধ্যে 'লাডাখের কাহিনী' অনুসারে তাঁহার তারিখ ৭৫৫-৭৯৭ খৃষ্টাব্দই[৮০] সর্বাপেক্ষা সঙ্গত মনে হয়। নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে কমলশীল যখন তিব্বতে গিয়াছিলেন তখন তথাকার রাজা ছিলেন খ্রি-স্রং-দি-ৎসানের পৌত্র[৮১]। অষ্টম শতাব্দীর শেষ পাদ'কে শান্তরক্ষিত ও পদ্মসম্ভবের কাল ধরিলে, পদ্মসম্ভবের (তথাকথিত) পিতা ইন্দ্রভূতির সময় ঐ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে নির্দেশ করিতে হয়। 'তেঙ্গুরে'র প্রমাণানুসারে ইন্দ্রভূতির গুরু অনঙ্গবজ্র, ও অনঙ্গবজ্রের গুরু পদ্মবজ্র। অনঙ্গবজ্রের তারিখ তাহা হইলে মোটামুটি হিসাবে অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ, ও পদ্মবজ্রের তারিখ প্রথম পাদ নির্ধারণ করা উচিৎ। পদ্মবজ্রকে অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে লইয়া যাওয়া কঠিন[৮২]। পদ্মবজ্র ও সরোরুহবজ্র বা প্রথম সরোহকে

(৮০) 'Chronicles of Ladakh' (*Ladvags r Gyalrabs*), according to Schlagintweit's MS.,—*Antiquities of Indian Tibet*, A. H. Francke, Part II, 1926, p. 86.

(৮১) Francke, *op. cit.*

(৮২) Cf. *Sādhanamālā*, ed. Benoytosh Bhattacharyya, Vol. II, Intro., pp. xli ff, and সা-প-প, ১৩৩৫, পৃঃ ১৫৪—১৫৮।

পৃথক ব্যক্তি মনে করিয়া কেহ কেহ ভুল করিয়াছেন,—তাঁহারা অভিন্ন, অর্থাৎ একই ব্যক্তির দুই নাম। 'চুরাশী সিদ্ধার ইতিহাসে' কথিত আছে, অনঙ্গবজ্র প্রথম গোপালদেবের পুত্র, অর্থাৎ ধর্মপালের ভ্রাতা। ইহা সম্ভবতঃ একেবারেই কাহিনী, কিন্তু উহা যত মিথ্যাই হোক্, অনঙ্গবজ্র কোন্ যুগে বিদ্যমান ছিলেন তাহার মোটামুটি একটা আভাস কাহিনীটা দিতে পারে।

সরোরুহবজ্রকে তাঁহার 'ত্রৈলোক্য-বশংকর-সাধনে'র পুষ্পিকায় স্পষ্টই 'ওড্ডিয়ান-বিনির্গত' বলা হইয়াছে। এই কারণে তাঁহাকে বাঙ্গালী মনে করিতেছি। তাঁহাকে 'মহাব্রাহ্মণ', 'মহাযোগিন', 'মহাচার্য' প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত দেখিতে পাই। 'পগ্ সাম্ জোন্ জ্যঙ্গে' দেখি, তাঁহার অপর এক নাম ছিল 'রাহুলভদ্র'। 'রাহুল' নামে তিনি 'একবীর-সাধন' ও 'মহাকাল-সাধন' লিখিয়াছিলেন। শেষোক্ত গ্রন্থখানি তিব্বতীয়ে অনুবাদ করিয়াছিলেন গৌড়ের নির্বাণশ্রী। 'পগ্ সাম্ জোন্ জ্যঙ্' বোধ হয় তাঁহাকে পরবর্তী এক সরোহের সহিত একাকার করিয়া ফেলিয়াছে, কারণ উহার বিবরণে দেখা যায়, এক ব্রাহ্মণ ও এক ডাকিনীর পুত্র সরোহ প্রাচ্য ভারতের রজ্ঞ বা রজ্ঞী নগরে জন্মিয়াছিলেন, এবং চন্দনপাল নামক এক রাজার রাজত্বকালে বিদ্যমান থাকিয়া জনৈক রত্নপালকে তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, 'চন্দনপাল' ও 'রত্নপাল' দ্বারা 'পগ্ সাম্ জোন্ জ্যঙ্' বাঙ্গালার পাল-বংশের কোনও দুই প্রতিনিধিকেই উদ্দেশ করিতেছে, কিন্তু পাল-বংশের ইতিহাসে

এই দুই নামের কোনও রাজার অস্তিত্বের ঐতিহাসিক উপাদান অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই, এবং দ্বিতীয়তঃ সরোরুহবজ্র পাল-বংশের প্রতিষ্ঠার পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তবে সরোহ-রাহুলভদ্র ও সরোরুহবজ্র-পদ্মবজ্রকে কেন অভিন্ন না মনে করিব তাহার কোনই কারণ দেখি না। ইঁহাকে 'প্রথম সরোহ' আখ্যা দিতে পারা যায়। কিন্তু সরোহের দুরদৃষ্ট, তাই তাঁহার নাম দেখিয়া জনৈক আমেরিকান্ সাহেবের মনে হইয়াছে, নামটি ভারতীয় নয়। সুতরাং তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন, সরোহ কি একজন য়িহুদী, অথবা একজন প্রাচীন খৃষ্টান প্রচারক[৮৩] ?

তিব্বতীয় তারনাথের 'বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস' অনুসারে, সরোরুহ-বজ্রের সমসাময়িক ছিলেন কুকুরিপাদ, কম্বলপাদ ও ললিতবজ্র। ইহা সত্য হইলে, ইঁহারা তিন জনেই অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগে বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু 'পগ্ সাম্ জোন্ জ্যঙ্গ' 'ললীতবজ্র' তিলোপার শিষ্য[৮৪], অর্থাৎ একাদশ শতাব্দীর লোক। এই গ্রন্থানুসারে কুক্কুরিপাদ ছিলেন বাঙ্গালার এক ব্রাহ্মণ, পরে তান্ত্রিক বৌদ্ধ হইয়া ডাকিনীদের দেশ হইতে 'মহাযান তন্ত্র' উদ্ধার করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। 'মহাযান তন্ত্র' কথাটি বোধ হয় ভুলে 'মহামায়া তন্ত্রে'র পরিবর্তে বসিয়াছে। কুক্কুরিপাদ 'চুরাশী সিদ্ধা'র

---

(৮৩) *Epochs in Buddhist History*, K. J. Saunders, Illinois, 1924, p. 86, note.

(৮৪) Vol. I, Index, p. cxii.

অন্যতম, এবং 'তেঙ্গুরে' এক স্থানে তাঁহার 'গুরুরাজ' আখ্যা দেখা যায়।

ললিতবজ্র কোথাকার লোক জানা যায় না, কিন্তু কম্বলপাদ (কম্বলাম্বরপাদ), বা কম্ভলপাদকে একস্থানে দেখি, তিনি 'কঙ্করে'র, খুব সম্ভব 'কোঙ্কণে'র, এক ক্ষত্রিয়বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন[৮৫]। ইঁহার এক বংশধরের নামও আবার 'কঙ্কণ'। অথচ কম্বলের 'কম্বল-গীতিকা' নামে একখানি, এবং কঙ্কণের 'চর্যা-দোঁহা-কোষ-গীতিকা' নামে একখানি 'বাঙ্গালা' (?) গানের পুস্তক আছে। ইঁহাদের যে দুইটি চর্যা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে এমন কতকগুলি শব্দ আছে যাহা অধুনা বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত, একাদশ শতাব্দীর নাড়পাদেরও তিনখানি পদাবলী আছে, দুইখানির নাম 'বজ্রগীতিকা' ও অপর খানির নাম 'নাড়পণ্ডিত-গীতিকা'[৮৬]। কিন্তু নাড়পাদও বাঙ্গালী ছিলেন না, ছিলেন কাশ্মীরী। তদ্রূপ, ডোম্বি হেরুকও বাঙ্গালী ছিলেন না, তাঁহার 'গুহ্য রাজ-তন্ত্ররাজবৃত্তি'তে তাঁহাকে স্পষ্ট 'মগধের রাজা' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, অথচ তাঁহারই 'ডোম্বি-গীতিকা' নামে একটি 'সঙ্কীর্তনের পদাবলী' আছে, এবং তাঁহার যে একটি চর্যা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে নাকি ৪০টি পুরাণো বাঙ্গালা এবং ৯টি চলিত

(৮৫) *J.A.S.B.*, 1908, p. 595.
(৮৬) বৌদ্ধ গান ও দোহা, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মুখবন্ধ, পৃঃ ৩৩।

বাঙ্গালা কথা আছে[৮৭]। আরও কারণ বিদ্যমান আছে যে জন্য বলিতে হয় যে, কেবলমাত্র চর্যা বা দোঁহার ভাষা অবলম্বন করিয়া কোনও গ্রন্থকর্তার বা পদকর্তার দেশগত জাতি নির্ণয়ে প্রলুব্ধ না হওয়াই নিরাপদ। পরবর্তীকালের 'ব্রজভাখা' নামক কৃত্রিম এক ভাষায় যেরূপ মৈথিল, মাগধী, বাঙ্গালী, উড়িয়া প্রভৃতি নানা দেশীয় পদকর্তাগণ গান রচনা করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের ব্যক্তিগত ইতিহাস না জানা থাকিলে যেমন কেবলমাত্র ভাষা দিয়া তাঁহাদের দেশ বিচার করা যায় না, তেমনই চর্যা প্রভৃতি কৃত্রিম ('সন্ধা') ভাষায় যাঁহারা গান রচনা করিয়াছিলেন, কেবল ভাষার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাদের দেশ বিচার করা চলে কিনা, ভাষাবিদ্‌গণের তাহা বিচার্য।

'তেঙ্গুরে'র প্রমাণে, পদ্মবজ্র-সরোহের শিষ্য ছিলেন অনঙ্গবজ্র, যাঁহার শিষ্য ছিলেন আবার উড্ডিয়ান-রাজ ইন্দ্রভূতি[৮৮]। শুভাকরের শিষ্য অনঙ্গবজ্র বলিয়া যে একটি অনুমান করা হইয়াছে, তাহা সত্য হইতে পারে না, কারণ কাশ্মীরী শাক্যশ্রীভদ্রের গুরু শুভাকর অনেক পরের, দ্বাদশ শতাব্দীর, লোক। 'চুরাশীসিদ্ধার ইতিহাসে' অনঙ্গবজ্র পাল-নৃপতি প্রথম গোপালের পুত্র, কিন্তু ইহাও সত্য হইতে পারে না, কারণ প্রথম সরোহের শিষ্য প্রথম

(৮৭) ঐ, পৃঃ ৩১।

(৮৮) *Descriptive Cat. of Sans. MSS. in the Govt. Collection under the care of the As. Soc. of Bengal*, H. P. Śāstri, Vol. I (Buddhist MSS), p. 110.

গোপালের অন্ততঃ কিছু পূর্ববর্তী অবশ্যই ছিলেন। তবে অনঙ্গবজ্র বাঙ্গালার রাজা প্রথম গোপালের পুত্র হওয়ার কিম্বদন্তী হয়ত বা এটুকু সূচিত করে, বা করিতে পারে, যে অনঙ্গবজ্র বাঙ্গালী ছিলেন। এই অনঙ্গবজ্র অবশ্যই একাদশ শতাব্দীর নাথ-গুরু গোরাক্ষনাথও হইতে পারেন না, যদিও এই ধরণের একটা কথা প্রচলিত আছে[৮৯]।

তিব্বতীয় জনশ্রুতি অনুসারে সরোহের আর এক শিষ্য নাগার্জুন। বলা বাহুল্য, এই তান্ত্রিক রসায়নাচার্য নাগার্জুন আর শূন্যবাদী নাগার্জুন এক নহেন, যদিও কেহ কেহ এই দুইজনকে এক ভিন্ন ভাবিতে পারেন নাই। 'পগ্-সাম্ জোন্ জ্যঙ্গ'-এ দেখা যায়, (দ্বিতীয়) নাগার্জুনের শিষ্য ছিলেন নাগবোধি, এবং যখন নাগার্জুন পুণ্ড্রবর্ধনে রসায়ন ও ধাতু লইয়া গবেষণা করিতেছিলেন, তখন এই নাগবোধিই তাঁহার সাহায্যকারী ছিলেন। নাগবোধি অবশ্যই বাঙ্গালী ছিলেন। 'পগ্ সাম্ জোন্ জ্যঙ্গ্'-অনুসারে তিনি বরেন্দ্রের শিবসের নামক গ্রামে জন্মিয়াছিলেন, এবং তাঁহার 'যমারিসিদ্ধ চক্রসাধন' গ্রন্থে তাঁহাকে 'উড্ডিয়ান বিনির্গত' বলিয়া দেখিতে পাই। একজন তৃতীয় নাগার্জুনও দ্বাদশ শতাব্দীর কোনও সময়ে ছিলেন।

(দ্বিতীয়) নাগার্জুন যখন বঙ্গালদেশে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন (দ্বিতীয়) সরহ বা শাবরীপাদ নামে বঙ্গালের পার্বত্য ভূমির একজন ব্যাধের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হয় বলিয়া 'পগ্ সাম্

(৮৯) Cf. *HBDU*, p. 344, note 2.

জোন্ জ্যঙ্'-এ উল্লিখিত আছে। এই 'বঙ্গাল' শব্দ সমগ্র বাঙ্গালা অথবা বাঙ্গালার দক্ষিণ-পূর্বের বঙ্গালদেশ [২০] কোন্‌টি সূচিত করিতেছে তাহা বুঝা যায় না, কিন্তু যাহাই হোক্, 'তেঙ্গুরে'র একস্থানে সরহ-শাবরীপাদ মগধের ছোট-কৃষ্ণের বংশধর রূপে বর্ণিত। সুতরাং তিনি বাঙ্গালায় বাস করিলেও, জাতিতে মাগধী।

অনঙ্গবজ্রের শিষ্য ইন্দ্রভূতি ছিলেন উড্ডিয়ানের রাজা। তাঁহার 'সিদ্ধ বজ্রযোগিনী সাধনে' তিনি স্পষ্টই 'শ্রীওড্ডিয়ান-নরেন্দ্র ইন্দ্রভূতি' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। তাঁহার এক উপাধি ছিল 'মহাচার্য' এবং তাঁহার রচিত 'জ্ঞানসিদ্ধি' মূল সংস্কৃতে পাওয়া গিয়াছে এবং প্রকাশিত হইয়াছে[২১]। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থগুলি তিব্বতীয় অনুবাদে রহিয়াছে। ইন্দ্রভূতি অষ্টম শতাব্দীর তৃতীয় পাদে বিদ্যমান থাকিলে তিনি ধর্মপালের সমসাময়িক ছিলেন। আপাততঃ কোনও কারণ নির্দেশ করিতে পারিতেছিনা, কিন্তু কেন যেন সন্দেহ হইতেছে, 'ইন্দ্রভূতি' হয়ত কাহারও ছদ্মনাম।

ইন্দ্রভূতির শিষ্যা ছিলেন তাঁহার ভগিনী অথবা কন্যা রাজকুমারী লক্ষ্মীঙ্করা। লক্ষ্মীঙ্করাও তাহা হইলে ইন্দ্রভূতির ন্যায় বাঙ্গালী। তাঁহারও রচনাবলীর মধ্যে 'অদ্বয়সিদ্ধি' মূল সংস্কৃতে পাওয়া গিয়াছে।

লক্ষ্মীঙ্করার শিষ্য ছিলেন লীলাবজ্র, কিন্তু লীলাবজ্র ছিলেন সৌরি-রত্নদ্বীপের অধিবাসী। এই সৌরি-রত্নদ্বীপ সম্ভবতঃ

---

(২০) *Ind. Hist. Quarterly*, 1946, pp. 280-81.

(২১) *Two Vajrayāna Works*, Baroda, 1929.

নেপালের রত্নদ্বীপ[৯২]। 'আচার্য', 'অবধূত', 'মহাপণ্ডিত' ইত্যাদি উপাধিধারী কুমারচন্দ্র (পূর্ব-বঙ্গের) বিক্রমপুরী-বিহারে বসিয়া 'রত্নাবলী' নামে 'কৃষ্ণযমারি-তন্ত্রে'র যে টীকা লিখিয়াছিলেন তাহার তিব্বতীয়ে অনুবাদকদিগের অন্যতম এই লীলাবজ্র। সম্ভবতঃ কুমারচন্দ্র ধর্মপালের সমসাময়িক ছিলেন, এবং লীলাবজ্র কুমারচন্দ্রের কিঞ্চিৎ পরবর্তী।

ধর্মপালের সমসাময়িক শান্তরক্ষিতের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ধর্মপালের 'বৃদ্ধ কায়স্থ', অর্থাৎ প্রধান লিপিকর, টঙ্কদাস 'সুবিদ-সম্পুট' নামে 'হেবজ্রতন্ত্রে'র একখানি টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

সরোরুহবজ্র হইতে টঙ্কদাস পর্যন্ত এই যে কতিপয় লেখক যাঁহারা মোটামুটি হিসাবে অষ্টম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন, ইঁহারা সকলেই বজ্রযানের নানা দেব-দেবী সম্বন্ধে গ্রন্থ, টীকা, স্তোত্রাদি রচনা করিয়াছিলেন। সরোরুহবজ্রের 'শ্রীবজ্রযোগিনী সাধন', 'ত্রৈলোক্যবশংকরলোকেশ্বর-সাধন', 'সম্বর চক্রেশ্বরালিকালি-মহাযোগ -ভাবনা নাম', 'হেবজ্রসাধন', 'হেবজ্রমণ্ডলবিধি', 'হেবজ্রভট্টারক স্তোত্র' ইত্যাদি; কুক্কুরিপাদের 'মহামায়াতন্ত্রানুসারিনী হেরুক-সাধনোপায়িকা', 'বজ্রসত্ত্ব-সাধন', 'মহামায়ামণ্ডলদেব স্তোত্র' ইত্যাদি; অনঙ্গবজ্রের 'শ্রীহেবজ্রসাধন', শ্রীহেবজ্রনামসাধনোপায়িকা' ইত্যাদি;

(৯২) *Lé Nepal*, Sylvain-Lévi, Vol. II, p. 149.

নাগবোধির 'যমারসিদ্ধচক্রসাধন', 'আর্য-নীলাম্বরধর-বজ্রপাণি-সাধনোপায়িকা' ইত্যাদি; ইন্দ্রভূতির 'শ্রীচক্রসম্বর তন্ত্ররাজ সম্বর সমুচ্চয় নাম বৃত্তি', 'শ্রীচক্রসম্বরস্তোত্র', 'সিদ্ধবজ্রযোগিনী-সাধন', 'মহামায়া সাধন', 'বজ্রসত্ত্বোপায়িকা', 'কুরুকুল্লাসাধন' ইত্যাদি; লক্ষীঙ্করার 'বজ্রযোগিনীসাধন' ইত্যাদি, কুমারচন্দ্রের 'কৃষ্ণযমারিতন্ত্রস্য পঞ্জিকা রত্নাবলী নাম', 'শ্রীবজ্রভৈরবতন্ত্র পঞ্জিকা' ইত্যাদি; শান্তরক্ষিতের 'বজ্রধর সঙ্গীত ভগবৎস্তোত্রটীকা', 'হেবজ্রোদ্ভব কুরুকুল্যায়াঃ পঞ্চমহোপদেশ', 'সম্বরবিংশকবৃত্তি' ইত্যাদি, এবং টঙ্কদাসের 'হেবজ্রতন্ত্ররাজটীকা-সুবিদ-সম্পুট নাম'—এতদসম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। ইহা ব্যতীত, ইঁহাদের চক্র, মণ্ডল, মুদ্রা, ধারণী ইত্যাদি সম্বন্ধেও অনেকগুলি রচনা আছে।

এই সকল গ্রন্থাদির উদ্দিষ্ট দেব-দেবীর নামগুলি দেখিলে এবং উপরোক্ত লেখকদের দেশ-নির্ণয় ও কাল-নির্ণয় মোটামুটি ঠিক হইলে, প্রতীয়মান হইবে, অষ্টম শতাব্দীতে পাল-বংশের প্রতিষ্ঠার পূর্বেও বজ্রযান অথবা তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম বাঙ্গালাদেশে কেমন শিকর প্রবেশ করাইয়াছিল এবং কত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। ইহারই কিছু পূর্বে, সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে, বাঙ্গালী চন্দ্রগোমী 'সিংহনাদ সাধন', 'হয়গ্রীব সাধন', 'আর্য সিতাতপত্রাপরাজিতা নামোপায়িকা', 'আর্য তথাগতোষ্ণীষসিতাতপত্রাপরাজিতাপ্রত্যঙ্গিরানামধারণী সাধন', 'ভগবত্যুষ্ণীষবিজয়াস্তোত্র', 'শ্রীজম্ভলস্থসংক্ষিপ্তসাধন', 'বোধিসত্ত্ব সম্বর বিংশক' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এত পূর্বে

বজ্রযানের উদ্ভব হইতে পারেনা মনে করিয়া এই সকল গ্রন্থের জন্য কেহ কেহ পরবর্তী কালের দ্বিতীয় একজন চন্দ্রগোমী সৃষ্টি করার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু বস্তুত: তাহা অহেতুক, এবং একই চন্দ্রগোমীর পক্ষে এই তান্ত্রিক গ্রন্থগুলি রচনা করা কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। চন্দ্রগোমীর নিজের 'শ্রীজম্ভলস্য-সংক্ষিপ্ত সাধন' নামা ছোট গ্রন্থখানিতে তাঁহাকে স্পষ্টই বলা হইয়াছে 'বজ্র চন্দ্রগোমিন্'। চক্রসম্বর কালচক্রযানের দেবতা, এবং কালচক্রযান সম্পর্কে ইন্দ্রভূতির 'শ্রীচক্রসম্বর স্তোত্র' ও 'চক্রসম্বরানুবন্ধ-সংগ্রহ' এবং কুমারবজ্রের 'চক্রসম্বর-মণ্ডলবিধি-তত্ত্বাবতার' এস্থলে উল্লেখযোগ্য। কুমারবজ্র 'শ্রীচক্রসম্বরসাধনতন্ত্র-সংগ্রহ' তিব্বতীয়ে অনুবাদ করিয়াছিলেন, এবং 'চক্রসম্বরস্তোত্র-সর্বার্থ সিদ্ধি বিশুদ্ধ চূড়ামণি নাম' গ্রন্থখানি সংশোধন করিয়াছিলেন। সহজযান সম্বন্ধেও এস্থানে লক্ষ্মীঙ্করার 'সহজসিদ্ধি পদ্ধতি' নামে গ্রন্থখানি উল্লেখনীয়। এই যানগুলি কখন হইতে বাঙ্গালাদেশে ক্রিয়া করিতেছিল এগুলি তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শক।

এই সকল বিভিন্ন যানের উৎপত্তি যখনই হোক্ না কেন, সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে অষ্টম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত সময়ে বাঙ্গালী বলিয়া নির্ণীত বৌদ্ধ লেখকগণের তিব্বতীয় অনুবাদে সংরক্ষিত রচনাবলী মিলাইলে দেখা যায় যে, ইঁহারা হেবজ্র, নীলাম্বরধর-বজ্রপাণি, চক্রসম্বর, ত্রৈলোক্য-বশংকর, যমারি, কৃষ্ণযমারি, জম্ভল, হয়গ্রীব, বজ্রসত্ত্ব, বজ্রভৈরব, বজ্রধর, হেবজ্রোদ্ভব কুরুকুল্যা, বজ্রযোগিনী,

মহামায়া, সিতাতপত্রা-অপরাজিতা, উষ্ণীষ-বিজয়া প্রভৃতি দেব-দেবীর অর্চনা ও স্তুতিমূলক গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই তথ্যের সহিত এই সময়ের মূর্তিতত্ত্বের সঙ্গতি রক্ষা হইতেছে না। অর্থাৎ, এই যুগে এই সকল দেব-দেবীর মূর্তি বাঙ্গালাদেশে (এবং অন্যত্রও) সংখ্যায় অত্যল্প। এই যানগুলি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আরও সুপরিস্ফুট ও সমৃদ্ধ না হইলে, এবং এই যুগের আরও মূর্তি আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত, এই অসঙ্গতিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা বৃথা।

'তেঙ্গুরে' লীলাবজ্রের শিষ্য দারিকপাদ। দারিকপাদ আবার তাঁহার একটি গানে লুইপাদকেও গুরু-হিসাবে প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছেন[৯৩]। অতএব তাঁহার দুই গুরু, লীলাবজ্র ও লুইপাদ, সমসাময়িক। লুই যে দারিকপাদের গুরু ছিলেন একথা 'পগ্ সাম্ জোন জ্যঙ্গ'ও সমর্থন করে[৯৪]। দারিকপাদের প্রায় বারখানি পুস্তকের অনুবাদ 'তেঙ্গুরে' আছে, কিন্তু তিনি বাঙ্গালী কিনা জানা যায়না, কিন্তু লুই ছিলেন অবশ্যই বাঙ্গালী। 'চর্যা-চর্য-বিনিশ্চয়' অনুসারে তিনি ছিলেন প্রথম সিদ্ধাচার্য। তান্ত্রিক ক্রিয়ানুষ্ঠান সম্বন্ধে তিনি দুইখানি বই লিখিয়াছিলেন, 'বজ্রসত্ত্ব-সাধন' ও 'বুদ্ধোদয়'। তাঁহার বংশধর কিলপাদের একখানি গানের পুস্তক আছে।

---

(৯৩) *Sādhanamālā*, II, Intro., p. lvii; বৌদ্ধ গান ও দোহা, পৃঃ ৫৩; সা-প--প, ১৩২২, পৃঃ ১৩১।

(৯৪) Index, p. cxliv.

দারিকপাদের প্রায় সমসময়ে, অথবা পরে, ছিলেন কুমারবজ্র, তিনি বাঙ্গালী। দারিকের 'চক্রসম্বরসাধনতত্ত্বসংগ্রহ' তিনি অনুবাদ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারই 'চক্রসম্বরস্তোত্রসর্বার্থ-বিশুদ্ধচূড়ামণি' খানি তিনি সংশোধন করিয়াছিলেন। এই কুমারচন্দ্র কিন্তু বিক্রমপুরী-বিহারের কুমারচন্দ্র হইতে ভিন্ন। দারিকপাদের শিষ্যা ছিলেন সহজ-যোগিনী চিন্তা, কিন্তু তিনি কোন্ দেশী রমণী তাহা বলা যায়না। নবম ও দশম শতাব্দীর প্রথমার্ধের আর কোনও গ্রন্থকারের সন্ধানও পাওয়া যায় না, যাঁহাদের এই সময়ের বাঙ্গালী বলিয়া চিহ্নিত করিতে পারা যায়। কেহ কেহ থাকিলেও এই সময়টা সাহিত্যের দিক দিয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। ইহার পরবর্তী যুগে, অর্থাৎ দশম শতাব্দীর তৃতীয় পাদ হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ে, অনেক প্রখ্যাত বাঙ্গালী বৌদ্ধাচার্যের আবির্ভাব হইয়াছিল।

ইঁহাদের মধ্যে প্রথম নাম করিতে হয় তৈলিকপাদ বা তিলপাদের। 'পগ্ সাম্ জোন্ জ্যঙ্গে'র বিবরণে আছে, তিনি আদিতে ছিলেন চট্টগ্রামের একজন ব্রাহ্মণ; যে নারীর সহিত একত্র তিনি যোগাভ্যাস করিতেন, সেই নারী প্রথম জীবনে তিল পিষিয়া জীবন ধারণ করিতেন, বলিয়া তাঁহার নাম হয় তিলপাদ, এবং তিলপাদ যখন বৌদ্ধ তান্ত্রিকধর্মে দীক্ষিত হইলেন তখন তাঁহার নাম হইল প্রজ্ঞাভদ্র। তিলপাদের যে অপর এক নাম ছিল প্রজ্ঞাভদ্র, সেকথা 'তেঙ্গুর' হইতেও প্রমাণ হয়। 'তেঙ্গুরে' তাঁহার 'শ্রীসহজসম্বরস্বাধিষ্ঠান'

নামে যে গ্রন্থের অনুবাদ আছে তাহাতে তাঁহার তৈলিকপাদ ও প্রজ্ঞাভদ্র এই দুই নামই আছে। 'পগ্ সাম্ জোন্ জ্যঙ্গে' দেখা যায়, তিনি ছিলেন চট্টলের বা চাটিগ্রামের নিকটবর্তী পণ্ডিত-বিহারের অধিবাসী। 'তেঙ্গুরে'র ক্যাটালগে পণ্ডিত-বিহারের নাম নাই, কিন্তু 'তত্ত্বচতুরোপদেশপ্রসন্নদীপ' নামে তাঁহার পুস্তকে রহিয়াছে তিনি উড্ডিয়ানের লোক, 'উড্ডিয়ান-বিনির্গত'। 'অচিন্ত্য-মহামুদ্রানাম' বলিয়া একখানি গ্রন্থ তিনি লিখিয়াছিলেন 'যশঃপালপুর' নামে একস্থানে। এই স্থানটির অবস্থান নির্ণয় করা আজিকার জ্ঞানে সম্ভবপর নয়। 'মহামুদ্রোপদেশ' নামে তাঁহার আর একখানি বই আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, পুস্তকে বর্ণিত (মুদ্রা সম্বন্ধে) উপদেশ তিলপাদ দিয়াছিলেন তাঁহার শিষ্য নাড়পাদকে গঙ্গার তীরে। 'গঙ্গার তীরে'র উল্লেখে বুঝিতে হইবে স্থানটি চট্টগ্রাম অঞ্চল নয়; অর্থাৎ পণ্ডিত-বিহার ছাড়াও অন্যত্র তিলপাদ কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। নাড়পাদ একজন সিদ্ধাচার্য, সিদ্ধ হইয়া তাঁহার নাম হয় জ্ঞানসিদ্ধি ও যশোভদ্র। 'বজ্রপদসার-সংগ্রহ-পঞ্জিকা' নামে তাঁহার লিখিত এক পুস্তকে নাড়পাদ ও যশোভদ্র এই দুই নামই আছে, এবং ইহাতে যশোভদ্রকে স্পষ্ট বলা হইয়াছে, তিনি কাশ্মীরের লোক। কিন্তু কাশ্মীরীয় হইলেও তিনি কিছুকাল পট্টিকেরকের কনকস্তূপ-বিহারে ছিলেন, কারণ এই পুস্তকখানিই তিনি রচনা করিয়াছিলেন ঐ বিহারে বসিয়া। 'পগ্ সাম্ জোন্ জ্যঙ্গে'র উক্তি অনুসারে, নাড়পাদ আচার্য জেতারির

পর মগধের বিক্রমশীল-বিহারের উত্তর দ্বারের পণ্ডিতের আসন লাভ করিয়াছিলেন এবং তাহার পরে তিনি বজ্রাসনের (বোধ্‌গয়ার) মহাচার্যের পদে বৃত হইয়াছিলেন। ইহার অপেক্ষাও বড় পরিচয় নাড়পাদের আছে, যদি তাঁহার অতীশ দীপঙ্করের গুরু হওয়ার কথা সত্য হয়। নাড়পাদ পাল-বংশীয় প্রথম মহীপালের সমসাময়িক ছিলেন, কাজেই তাঁহার গুরু তিলপাদ খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষার্ধে জীবিত ছিলেন।

জেতারিও জনশ্রুতিতে অতীশ দীপঙ্করের বাল্যগুরু। 'পগ্ সাম্ জোন্ জ্যঙ্গ' দেখা যায়, বরেন্দ্রের রাজা সনাতনের ঔরসে ও জনৈকা যোগিনী উপপত্নীর গর্ভে জেতারি বা জেতকর্ণের জন্ম হয়। অন্যত্র দেখা যায়, পাল-নরপতিগণের সামন্তরাজ সনাতনের গর্ভপাদ নামে এক সভাসদের ঔরসে বরেন্দ্রের এক ব্রাহ্মণ-পরিবারে জেতারির জন্ম হইয়াছিল[৯৫]। এই উভয় বিবরণের কোনওটিই প্রকৃত নয়, কারণ জেতারির নিজের রচিত একখানি তান্ত্রিক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, তিনি গগনঘোষ নামক জনৈক ব্রাহ্মণের পুত্র ছিলেন[৯৬]। জেতারির গুরু ছিলেন ধর্মকীর্তি নামে এক পণ্ডিত। জেতারি যে কয়খানি তান্ত্রিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে তাঁহার 'সুগত-মত-বিভঙ্গ-কারিকা'য় তিনি স্পষ্ট

(৯৫) *History of the Mediæval School of Indian Logic*, S. C. Vidyābhūṣaṇa, 1909, p. 136.

(৯৬) Cordier, II, p. 299.

'বাঙ্গালা'র লোক বলিয়া উল্লিখিত। তাঁহার উত্তর-বঙ্গের অধিবাসী হওয়ার কথা সত্য হওয়া বিচিত্র নয়।

জেতারির সমসাময়িক রত্নাকর-শান্তি দশম শতাব্দীর শেষ এবং একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বিদ্যমান ছিলেন। তিনিও অতীশের একজন শিক্ষাগুরু ছিলেন[৯৭]। তাঁহার 'রাজাচার্য, মহাপণ্ডিত' উপাধি দেখিয়া মনে হয়, তিনি তাঁহার সমসাময়িক পাল-রাজ প্রথম মহীপালের আচার্য বা গুরু ছিলেন। কখনও কখনও তিনি শুধু 'শান্তি-পাদ' নামেও পরিচিত, এবং তিনি বাঙ্গালী হইলেও হইতে পারেন[৯৮]। তাঁহার 'সহজরতিসংযোগ' নামে পুস্তকের টীকা রচনা করিয়াছিলেন কাশেরিনের বংশধর থগন বা স্থগন, যিনি ছিলেন 'উড্ডিয়ান বিনির্গত'।

প্রথম মহীপালের যুগে আর একজন প্রথিতযশা পণ্ডিত ছিলেন অদ্বয়বজ্র। তাঁহার উপাধি 'অবধূতপাদ' দ্বারাও তিনি অনেক ক্ষেত্রে পরিচিত, এবং 'অদ্বয়গুপ্ত' ও 'অতুল্যবজ্র' তাঁহারই দুই নামান্তর। তিনি যে বাঙ্গালী একথা তাঁহারই 'প্রজ্ঞারস্তাবধি-পরিকথা' সাক্ষ্য দেয়। অধিকন্তু জানি, তিনি উত্তর-বঙ্গের 'দেবীকোটে' বাস করিতেন। তাঁহার আরও এক নাম বা উপাধি ছিল মৈত্রীপাদ। তিনি সরোহের 'অধিষ্ঠান মহাকাল সাধনে'র তিব্বতীয় অনুবাদ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার 'চিত্তমাত্রদৃষ্টি'তে

(৯৭) *Ibid*, p. 282.

(৯৮) সা-প-প, ১৩২২, পৃঃ ১২৯।

তিনি সরোহের বংশধর বলিয়া কথিত। কিন্তু মধ্য-ভারতের শ্রীশৈল প্রদেশের মৈত্রীপাদ হইতে তিনি ভিন্ন[৯৯], এবং মিত্রযোগী বা জগন্মিত্রানন্দ বা ললিতবজ্রের সহিত তাঁহাকে একাকার করিলেও চলিবেনা[১০০]। তাঁহার একুশখানি ছোট ছোট বইয়ের সংগ্রহ মূল সংস্কৃতে আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং প্রকাশিত হইয়াছে[১০১]। এতদ্ব্যতীত, তিনি তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে আরও অনেকগুলি গ্রন্থ নিজে রচনা করিয়াছিলেন, এবং অনেকগুলি তিব্বতীয়ে অনুবাদ করিয়াছিলেন।

অদ্বয়বজ্রের এক বংশধর ছিলেন ললিতগুপ্ত। তাঁহার 'শুক্লৈক-জটাসাধন' নামক গ্রন্থখানি অনুবাদ করিয়াছিলেন জগদ্দলের দানশীল।

'পগ্ সাম্ জোন্ জ্যঙ্গে'র উক্তি অনুসারে মৈত্রীপের (অদ্বয়বজ্রের) এক শিষ্য ছিলেন দিবাকরচন্দ্র, এবং তিনি নয়পালের রাজত্বকালে বাস করিতেন। দিবাকরচন্দ্রও বাঙ্গালী ছিলেন, 'তেঙ্গুরে'র সাক্ষ্যেই সেকথা পাওয়া যায়[১০২]। তাঁহার একখানি গ্রন্থে তাঁহাকে 'মহাব্রাহ্মণ' বলিয়া বর্ণিত দেখা যায়। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে তাঁহারও খানকয়েক পুস্তক তিব্বতীয় অনুবাদে 'তেঙ্গুরে' রহিয়াছে।

---

(৯৯)Cordier, II, p. 355.

(১০০)Cordier, III, pp. 230 and 334.

(১০১) *Advayavajrasaṃgraha*, Gaekwad's Oriental Series, No. XL, ed. H. P. Śāstrī, 1927.

(১০২) Cordier, II, p. 319.

মহীপাল-নয়পাল যুগের সর্বাপেক্ষা গৌরবান্বিত নাম যাঁহার, তিনি নিঃসন্দেহে প্রাচীন বাঙ্গালার পণ্ডিতমণ্ডলীর উজ্জ্বলতম মুকুটমণি, ধর্মজগতের সর্বাধিক বরেণ্য আচার্য। বাণীর এই বরপুত্রকে ঘটনাস্রোতে ধর্মগুরুর আসনে বসিয়া দেবতার মর্যাদায় অভিসিঞ্চিত হইতে হইয়াছিল, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বাঙ্গালী ইতিহাসের মধ্যে ইহার যথার্থ উপমা খুঁজিতেছে, পায়না। —এই না-পাওয়ার মধ্যে যত গৌরব, যতখানি অহঙ্কার লুকানো আছে তাহার সবটুকুই একান্তভাবে প্রাপ্য বাঙ্গালী জাতির। উপমা যদি থাকে, তবে তাহা একমাত্র চৈতন্যদেবই দাবী করিতে পারেন, তিনিও বাঙ্গালী।

তিব্বতীয় এক বিবরণ অনুসারে[১০৩] অতীশ দীপঙ্কর (বা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান) ৯৮০ খৃষ্টাব্দে "বজ্রাসনের পূর্বে বাঙ্গালাদেশে বিক্রমণিপুরে গৌড়ের রাজবংশে" জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 'পগ্ সাম্ জোন্ জ্যঙ্গে'র সাক্ষ্যেও তিনি "পূর্বভারতের বাঙ্গালায় বিক্রমপুরে" জন্মিয়াছিলেন। অধুনা কেহ কেহ এই 'বিক্রমণিপুর'কে বিহার প্রদেশে অবস্থিত ছিল বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন[১০৪], কিন্তু ইহা সর্বৈব অহেতুক। 'তেঙ্গুরে' অতীশের স্ব-প্রণীত 'বোধিমার্গ-পঞ্জিকা'র যে তর্জমা আছে তাহাতেও অতীশের

(১০৩) অতীশ দীপঙ্করের জন্য 'বঙ্গীয় মহাকোষ', ২য় খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা, পৃঃ ৮৬-৮৯ দ্রষ্টব্য।

(১০৪) *University of Nalanda*, H. D. Sankalia, 1934, p. 183; প্রবাসী, ১৩৪৪, বৈশাখ, পৃঃ ১০৪।

পরিচয় সম্বন্ধে স্পষ্ট লেখা আছে, তিনি বাঙ্গালার কোনও রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। 'একবীরসাধন' নামে তাঁহার অপর একখানি গ্রন্থের অনুবাদও 'তেঙ্গুরে' আছে, তাহাতেও তাঁহাকে 'বাঙ্গালী' (du Bengale) বলিয়াই বিশেষিত করা হইয়াছে। অতীশ দীপঙ্কর অ-বাঙ্গালী হইতে যাইবেন কেন? কোনও গ্রন্থে অতীশের জন্মস্থান সাহোর বলিয়া লেখা থাকিলে, উহার দ্বারা আরও প্রমাণিত হইবে যে, সাহোর বাঙ্গালারই স্থানবিশেষ।

'পগ্ সাম্ জোন্ জ্যঙ্' অনুসারে শান্তরক্ষিত যে রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, অতীশ সেই রাজ-বংশেই জন্মিয়াছিলেন। কিন্তু এই উক্তির মূলে কোনও ঐতিহাসিক সত্য আছে কিনা তাহা অতীব সংশয়জনক। ঐ গ্রন্থে আরও দেখা যায়, 'সুবর্ণধ্বজ' নামক মধ্যস্থলে অবস্থিত এক রাজপ্রাসাদে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল, এবং তাঁহার মাতা-পিতার নাম পদ্মপ্রভা ও কল্যাণশ্রী। ইঁহাদের তিন পুত্রের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। অল্প বয়সেই তিনি পাঁচটি বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পুণ্যশ্রী প্রমুখ তাঁহার নয়টি পুত্র হইয়াছিল।

অপর বিবরণ অনুসারে, তাঁহার মাতার নাম ছিল প্রভাবতী, পিতার নাম কমলশ্রী, ও তাঁহার নিজের পূর্বনাম চন্দ্রগর্ভ। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে অতীশের মাতা তাঁহাকে শিক্ষালাভের জন্য গুরুগৃহে পাঠাইয়া দেন; এই গুরুর নামই জেতারি। কিন্তু জেতারির উত্তর-বঙ্গের অধিবাসী হওয়ার বৃত্তান্ত সত্য হইলে

বুঝিতে হইবে, অতীশ প্রাথমিক শিক্ষালাভের জন্য অত্যল্প বয়সে পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুর হইতে বরেন্দ্রের জেতারি-গৃহে গমন করিয়াছিলেন। এই তথ্যে সন্দেহের অবকাশ আছে।

'পগ্ সাম্ জোন্ জ্যঙ্গ' বলে, অতীশ বাল্যকাল হইতেই তারাদেবীর পরম ভক্ত ছিলেন, এবং আধ্যাত্মিক ও লৌকিক উভয় বিদ্যায়ই পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। একবিংশতি বৎসর বয়সের পূর্বেই তিনি নানা কলাবিদ্যায় ও ভৈষজ্য, শিল্প প্রভৃতি শাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়াছিলেন। পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়সে তিনি এক ব্রাহ্মণ তার্কিকের সহিত দর্শন-শাস্ত্র সম্বন্ধীয় তর্কে জয়লাভ করেন। কিন্তু ঐহিক সুখ ও রাজকীয় আমোদ প্রমোদ তাঁহার আর মনঃপূত হইল না, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সন্ধানে তিনি গৃহত্যাগ করিলেন। প্রথমে গেলেন তিনি কৃষ্ণগিরি-বিহারের রাহুলগুপ্তের নিকট। সেই স্থানে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে তিনি দীক্ষিত হইলেন, তখন তাঁহাকে 'গুহ্য জ্ঞানবজ্র' এই গুহ্য নাম দেওয়া হইল। এই স্থানে তিনি 'মন্ত্রে'ও জ্ঞানলাভ করিলেন। ঊনত্রিংশ বৎসর বয়সে তাঁহার গুরুর তত্ত্বাবধানে তিনি মগধের ওদন্তপুরী-বিহারে গমন করিলেন। সেখানে মহাসাঙ্ঘিক ভিক্ষু শীলরক্ষিতের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া তাঁহার নূতন নাম হইল 'দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান'। একত্রিংশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি ধর্মরক্ষিত এবং অন্যান্য উপাধ্যায়ের নিকট ধর্ম ও দর্শন সংক্রান্ত অনেক বিদ্যায় অধিগত হইলেন।

নানা বিদ্যায় পারদর্শী হওয়াও এবং ভিক্ষুসঙ্ঘের শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করিয়াও, অতীশের জ্ঞানপিপাসা মিটিলনা, মনও স্থির হইল না। একত্রিশ বৎসর বয়সে, অর্থাৎ ১০১১ খৃষ্টাব্দে, তিনি সুবর্ণদ্বীপে (হয় পেগুর সুধর্মপুর, বর্তমান থাটোন্ (Thaton), না হয় সুমাত্রা দ্বীপ) মহাচার্য চন্দ্রকীর্তির ('পগ্ সাম্ জোন্ জ্যঙ্গে' ধর্মকীর্তির) নিকট চলিয়া যান। দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর সেস্থানে অতিবাহিত করিয়া প্রণিধি (অর্থাৎ প্রার্থনায় মনের একাগ্রতা সাধন) অভ্যাস করিয়া, এবং পথে সিংহল ও আরও কয়েকটি দ্বীপ পরিদর্শন করিয়া তিনি মগধে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

মগধে ফিরিয়া অসিয়াও তিনি (রত্নাকর-) শান্তি, নাড়পাদ, কুশল, অবধূত (অদ্বয়বজ্র ?) প্রভৃতি পণ্ডিতগণের নিকট আরও জ্ঞান আহরণ করিতে লাগিলেন। 'প্রজ্ঞাপারমিতা পিণ্ডার্থ প্রদীপ' নামে অতীশের যে গ্রন্থের অনুবাদ 'তেঙ্গুরে' আছে, তাহাতে তাঁহাকে স্পষ্টই রত্নাকর-শান্তির শিষ্য বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার জ্ঞানতৃষ্ণা এইরূপে অনেকটা প্রশমিত হইল। মগধের বৌদ্ধগণ তাঁহাকে তাঁহাদের প্রধানের স্থান দেন, এবং তাঁহাকে 'ধর্মপাল' উপাধি দেন। ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিতগণের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। বজ্রাসনে বাসকালে তাঁহার নিকট তীর্থ-ধর্মাবলম্বী (হিন্দু) পণ্ডিতগণ বার-ত্রয় ধর্ম-বিষয়ক বিতণ্ডায় পরাজিত হন। বজ্রাসনে বাসকালেই বাঙ্গালার পাল-বংশীয় নরপতি প্রথম মহীপাল (১০২৬ খৃষ্টাব্দের পরে কোনও

সময়ে) তাঁহাকে বিক্রমশীল-বিহারে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। পরে তিনি ঐ বিহারের প্রধান আচার্যের পদ গ্রহণ করেন। 'রত্ন-করণ্ডোদ্‌ঘাট নাম মধ্যমকোপদেশ' নামে অতীশের একখানি পুস্তকের অনুবাদ 'তেঙ্গুরে' আছে, তাহার পুষ্পিকায় দেখা যায়, দেবপালের (?) প্রতিষ্ঠিত বিক্রমশীল-বিহারে এই গ্রন্থখানি অতীশ কর্তৃক তাঁহার শিষ্য জয়শীলের নিকট ব্যক্ত হইয়াছিল। এই বিহারের প্রধান তোরণের দুইপার্শ্বে দক্ষিণে নাগার্জুন ও বামে অতীশের মূর্তি অঙ্কিত ছিল। অতীশ উত্তর-বঙ্গের সোমপুরী-বিহারেও কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন।

এই সময়ে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে অত্যন্ত কলুষিত হইয়া উঠে। এ কলুষ এক দিনে সঞ্জাত নয়, বহুদিনের পুঞ্জীভূত। তিব্বতের তৎকালীন রাজা লা লামা জে-সে হোডের মনে তাঁহার রাজ্যের ধর্ম সংস্কারের বাসনা জাগিল। সেই উদ্দেশ্যে তিনি অতীশকে তিব্বতে লইয়া যাইবার জন্য দূত পাঠাইলেন, দূতের সঙ্গে অতীশকে উপহার দিবার উদ্দেশ্যে বহু স্বর্ণও প্রেরিত হইল। অবোধ রাজা, বুঝিলেন না যে, উপহারের নামে কাহাকে বশীভূত করার জন্য এই স্বর্ণ তিনি পাঠাইতেছেন। স্বর্ণের দিকে অতীশ অবশ্যই চাহিয়াও দেখিলেন না। তিব্বতেও তিনি যাইবেন না, ধর্মপ্রচার করিয়া খ্যাতিলাভের লোভও তাঁহার নাই। দূত বহু চেষ্টার পর ব্যর্থকাম হইয়া তিব্বতে ফিরিয়া গেলেন।

ভুলটা কোথায় হইল জে-সে হোড্ তাহা বুঝিতে পারিলেন না, তিনি মগধের দ্বিতীয় আচার্যকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য আবার দূত প্রেরণ করিলেন, এবং ধর্ম সংস্কারের জন্য যে প্রভূত অর্থের প্রয়োজন হইবে তাহা সংগ্রহের জন্য নিজে তাঁহার রাজ্যের সীমান্তে স্বর্ণের সন্ধানে গেলেন। এই উপলক্ষ্যে গার্‌লোগের (তুর্কীস্থানের) মুসলমান রাজার সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয়। গার্‌লোগের রাজা তাঁহাকে বন্দী করেন এবং বন্দী অবস্থাতেই ১০৩৮ খৃষ্টাব্দে জে-সে হোড্ প্রাণত্যাগ করেন। তখন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র চান্-চুব্ তিব্বতের রাজা হন।

চান্-চুব্ রাজা হইয়া আবার নূতন করিয়া অতীশকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইবার জন্য নাগ্ছো নামক এক যুবককে বিক্রমশীলে দূতরূপে পাঠাইলেন। চান্-চুব্ অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান রাজা ছিলেন, অতীশকে স্বর্ণের প্রলোভন দেখাইতে দূতকে বলিলেন না,—বলিয়া দিলেন যে পর্যন্ত তাঁহার মতের পরিবর্তন না ঘটে সেই পর্যন্ত তাঁহার সন্নিধানে অপেক্ষা করিতে। ১০৩৯ খৃষ্টাব্দে মগধে উপস্থিত হইয়া নাগ্ছো তথায় অতীশের মত পরিবর্তিত হওয়ার অপেক্ষায় প্রায় তিনটি বছর অতিবাহিত করিলেন। তিব্বতের বৌদ্ধধর্মের শোচনীয় দুরবস্থার বৃত্তান্ত শুনিয়া অতীশের মন বিগলিত হইল, তিনি তিব্বতে যাইতে স্বীকার করিলেন। প্রথম মহীপালের তখন মৃত্যু হইয়াছে, গৌড়-মগধের রাজা তখন তাঁহার পুত্র নয়পাল। ১০৪০-৪২ খৃষ্টাব্দে নয়পালের সহিত কলচুরি-বংশীয় নূতন রাজা

কর্ণদেবের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। অতীশের মধ্যস্থতায় সেই সংঘর্ষের অবসান ঘটে। ইহার অল্পদিন পরেই অতীশ তিব্বত যাত্রা করেন। পূর্বে লোকের ধারণা ছিল অতীশ ১০৩৮ খৃষ্টাব্দে অথবা তাহারও পূর্বে তিব্বত যাত্রা করেন, কিন্তু কলচুরি কর্ণের সিংহাসনারোহণের তারিখটা (১০৩৯ বা ১০৪১ খৃঃ)[১০৫] প্রমাণ করে, ১০৪০-৪২ খৃষ্টাব্দের পূর্বে কর্ণ-নয়পালের সংঘর্ষ উপস্থিত হইতে পারেনা, এবং সেই সংঘর্ষের মধ্যস্থতা করিয়া এই সময়ের পূর্বে অতীশও তিব্বত যাত্রা করিতে পারেন না[১০৬]।

তিব্বতে যাইতে অতীশ স্বীকৃত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ভয় হইল পাছে ভারতীয় অন্যান্য বৌদ্ধগণ তাঁহার প্রতি অনুরক্তিতে তাঁহার গমনে বাধা দেন। এই আশঙ্কায় তাঁহাকে বৌদ্ধদের অষ্ট-পুণ্যস্থানে তীর্থযাত্রা করিবার ছল করিয়া বাহির হইতে হয়। যাত্রাপথে তিনি প্রথম নেপালে উপস্থিত হন। নেপালের রাজা অনন্তকীর্তি বা অনন্তযশঃ তাঁহাকে বিপুল সমাদরে অভ্যর্থনা করেন। নেপালে তিনি ন্যূনাধিক এক বৎসর ছিলেন। সেখানে তিনি সমথ (সমস্থ)-বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। নেপাল হইতে তিনি ধর্মোপদেশ দিয়া রাজা নয়পালকে একখানি লিপি লেখেন, তাহার নাম 'বিমল রত্নলেখ'; ইহার পুষ্পিকায় লেখা আছে, "স্থবির মহাপণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানেন রাজ-নয়পালায় প্রেষিত বিমলরত্নলেখ নাম"।

---

(১০৫) *Ep. Ind.*, XXI, p. 297 f., এবং *Ind. Cult.*, I, pp. 289-90.
(১০৬) সা-প-প, ১৩৩৩, পৃঃ ৫৩

নেপাল ত্যাগ করিয়া অতীশ ও তাঁহার পথ-প্রদর্শকগণ যখন তিব্বতের গু জে (Gu-ge) প্রদেশে পৌছিলেন, তখন দেখা গেল রাজা চান্-চুবের প্রেরিত একশত অশ্বারোহী পুরুষ শ্বেত-পরিচ্ছদে আচ্ছাদিত হইয়া তাঁহাকে সম্বর্ধনা করিতে আসিয়াছে। সঙ্গে তাহাদের ছিল ছোট ছোট পতাকা, কুড়িটি সাদা রঙ্গের সাটিনের ছত্র, এবং নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র। সুললিত উদাত্তসুরে গান গাহিয়া এবং "ওঁ মণিপদ্মে হুম্" মন্ত্র উদ্গীর্ণ করিয়া তাহারা অতীশের নিকট অগ্রসর হইয়া তাহাদের রাজার নামে তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইল। তৎকালীন তিব্বতীয় এক মঠের প্রাচীর-গাত্রে এই অভ্যর্থনারই দৃশ্য অঙ্কিত আছে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। অতীশ ইতিপূর্বে চা পান করেন নাই, এইখানে তাঁহাকে চা প্রদত্ত হইলে তাহা তিনি পান করিয়াছিলেন। পরে গু-জে'র রাজধানী থে-ডিং নগরাভিমুখে তিনি গমন করিলেন। পথিমধ্যে মানস-সরোবর তাঁহার এত ভাল লাগিয়াছিল যে, তথায় তিনি সাত দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। থে-ডিঙ্গে চান্-চুব্ স্বয়ং তাঁহাকে মহাসমাদরে সম্মানিত করিলেন। যাবতীয় যত লামা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ছিলেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইলেন। গাত্রোত্থান করিলেন না শুধু রিং-চেন্-জং-পো নামক এক বৃদ্ধ লামা, কতকটা ঈর্ষাবশতঃ এবং কতকটা বার্ধক্যের ভারে। কিন্তু এমনই সুন্দর ও সুষ্ঠুরূপে অতীশ তাঁহার জ্ঞানের ও বিদ্যা-বত্তার পরিচয় দিলেন যে ঐ বৃদ্ধ লামারও পরাভব স্বীকারে বাধ্য

হইতে দেরী হইল না; স্পিতির (Spiti) তাবো মঠের একখানি খোদিত লিপিতে এই ঘটনার উল্লেখ আছে। গু-জে প্রদেশে অতীশ ছিলেন দুই বৎসর, এবং তথাকার নিরাভোগ-মহাবিহারে বসিয়া রচনা করেন তাঁহার 'লোকাতীত-সপ্তাঙ্গ বিধি' নামক পুস্তকখানি। তারপর তিনি মধ্য-তিব্বতে উ এবং সাং প্রদেশে গমন করেন। পরে তিনি ম-য়ে-বিহার পরিদর্শন করেন। ম-য়ে হইতে আরও দুই এক স্থানে গমন করিয়া তিনি পুনরায় ম-য়েতে ফিরিয়া আসেন। ইহার পর তিনি গমন করেন ন্থে-থঙ্ নামক স্থানে। এই ন্থে-থঙ্গেই তিনি তাঁহার জীবনের শেষ দিনগুলি অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ন্থে-থঙ্ হইতে একবার তিনি যান লাসায়, এবং লাসা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ন্থে-থঙ্গে ১০৫৩ খৃষ্টাব্দে ৭৩ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ন্থে-থঙ্গেও তিনি একটি বিহার স্থাপন করিয়াছিলেন।

অতীশের সমাধি মন্দিরের নাম গ্রো-ম (Sgro-ma)। যে কক্ষের মধ্যে তাঁহার দেহাবশেষ রক্ষিত আছে, তাহা দেখিতে একটা গোলাঘরের ন্যায়, বহির্ভাগ হরিদ্রারঙ্গে রঞ্জিত। এখন তাহা প্রায় ধ্বংসোন্মুখ। চারিদিকে তাহার কতগুলি উইলো গাছ ঝোপ করিয়া আছে। সমাধি-মন্দিরের বহির্দেশে বুদ্ধদিগের এবং তাঁহার নিজেরও কতগুলি চিত্র অপটু হস্তে অঙ্কিত। অধুনা উহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছয়জন অশিক্ষিত লামার হস্তে ন্যস্ত। তাহারা নিকটেই বাস করে।

বজ্রযান ও কালচক্রযানের উপর বহু সংখ্যক পুস্তক ও টীকা-টিপ্পনী অতীশ রচনা করিয়াছিলেন। মহাযানের উপরেও তাঁহার কয়েকটি পুস্তক আছে। তা ছাড়া, অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করিতে তিনি সাহায্য করিয়াছিলেন। ফলে, 'তেঙ্গুরের ক্যাটালগে'র প্রতি তিন-চারি পৃষ্ঠার মধ্যেই তাঁহার নাম দেখা যায় বলিলে সম্ভবতঃ অত্যুক্তি করা হয় না।

কথিত আছে, বৌদ্ধ-দেবতামণ্ডলীর মধ্যে তিন মস্তক, চারি হস্ত ও চারি পদবিশিষ্ট হয়গ্রীব-ধর্মপালের যে এক রূপ আছে, ঐ রূপ নাকি অতীশেরই প্রার্থনায় প্রকাশ পাইয়াছিল। তিব্বতের কলুষিত ও বিকৃত বৌদ্ধধর্মের তিনি অনেকটা সংস্কার করিতে সমর্থ হন। তথাকার সংস্কৃত ক-দং-প (bka-gdams-pa) নামক বৌদ্ধ সম্প্রদায় তাঁহারই সৃষ্টি। তিব্বতীয়গণ দেবতাজ্ঞানে তাঁহাকে আজিও পূজা করেন। তাঁহাদের মতে তিনি মঞ্জুশ্রীর অবতার। তিব্বতে তাঁহার কত খাতির ছিল, লোকে তাঁহাকে কত ভক্তি করিত, একটি ছোট গল্পেই তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যাইবে। কথিত আছে, অতীশ যখন লাসার সমীপবর্তী হইতেছিলেন, এক বালিকা তাহার মস্তকে যে অলঙ্কার ছিল, তাহা খুলিয়া ভক্তিভরে অতীশকে সমর্পণ করিয়াছিল। দুঃখের বিষয়, বালিকাটির নাম অজ্ঞাত, কিন্তু এক বালিকা, তাহারও গোপন অন্তরে অতীশের প্রতি কতখানি ভক্তিই না পুঞ্জিত ছিল! সম্ভবতঃ সাংসারিক সম্পদ বলিতে বালিকার ঐ অলঙ্কার ব্যতীত আর কিছুই ছিল না, এবং তাহাই

সে অপরকে দিয়া দিয়াছে শুনিয়া বালিকার মাতাপিতা তাহাকে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিলেন। গরীবের মেয়ের আবার অত কেন? এই তিরস্কারে অভিমানিনী আর সহ্য করিতে না পারিয়া মনের দুঃখে নদীর জলে ঝাঁপ দিয়া মাতাপিতার উপর, দারিদ্র্যের উপর, সংসারের উপর, চূড়ান্ত প্রতিশোধ লইল। তাহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন অতীশ নিজে; এবং তারপর তিনি ব্যক্ত করিলেন যে, স্বর্গলোকে বালিকাটির পুনর্জন্ম হইয়াছে।

ফরাসী দেশের 'মুজে গীমে' (Musee Guimet)-র ফাকো (Facot)-সংগ্রহে একখানি পুরাতন চিত্র আছে; তাহাতে অতীশের, তাঁহার একজন শিষ্যের (নাম Rta-nag-gos-lo-tsa-va-khug-Lhsirtis), শক্তি-সহ বজ্রসত্ত্বের এবং যমের ছবি অঙ্কিত আছে। আরও নানাস্থানে অতীশের চিত্র ও মূর্তি আছে, সে সকলই এই বাঙ্গালী বিবুধের প্রতি অসীম সম্মাননার ও অনুরাগের সাক্ষ্য দেয়।

অতীশের পর তান্ত্রিক বৌদ্ধ-ধর্ম সম্বন্ধে আর একজন যে বহু-পুস্তক-রচনাকারীর আবির্ভাব হইয়াছিল তাঁহার নাম অভয়াকর-গুপ্ত[১০৭]। তিব্বতীয় ভাষায় তাঁহার প্রগাঢ় পারদর্শিতা ছিল, এবং অনেকগুলি সংস্কৃত পুস্তক ঐ ভাষায় তর্জমা করিয়াছিলেন বা করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। অভয়াকরের উপদেশ লাভ করিয়া আচার্য আর্য নাগার্জুন নামে যে পণ্ডিত 'বজ্রমহাকালাভিচার হোম'

---

(১০৭) অভয়াকরগুপ্তের জন্য *Ind. Cult.*, III, pp. 369—72 দ্রষ্টব্য।

নামে পুস্তক লিখিয়াছিলেন, তাঁহাকে তৃতীয় নাগার্জুন আখ্যা দেওয়া যায়। রামপালের রাজত্বকালে, একাদশ শতাব্দীর শেষ-পাদে ও দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে, অভয়াকরের নেতৃত্বেই বৌদ্ধধর্ম যেন আবার নব জীবন লাভ করিল। ইহা অবশ্য নিভিবার পূর্বের উজ্জ্বল দীপশিখা ব্যতীত আর কিছুই নয়। কিন্তু অভয়াকরগুপ্ত কোন্ প্রদেশের লোক? পরলোকগত শরৎচন্দ্র দাশ মহাশয় তিব্বত-প্রবাসী কয়েকজন ভারতীয় পণ্ডিতের লেখা হইতে মহাপণ্ডিত অভয়াকরের যে জীবন-কাহিনী সঙ্কলন করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে আছে, তিনি পূর্ব-ভারতের গৌড়-নগরীর নিকটে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার তাঁহারই সম্পাদিত 'পগ্ সাম্ জোন্ জ্যঙ্গে' দেখা যায়, তিনি উড়িষ্যাদেশের জারিখণ্ডে (ঝাড়িখণ্ডে) এক ক্ষত্রিয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব, অভয়াকর বাঙ্গালী ছিলেন কি উড়িয়া ছিলেন, এরূপ একটা প্রশ্ন উঠিতেছে। এবং এ প্রশ্নের সমাধান নিরতিশয় কঠিন হইত, যদি না 'শ্রীসম্পূট-তন্ত্ররাজ' নামে একখানি বৌদ্ধতন্ত্রের 'আম্নায় মঞ্জরী' নামে অভয়া-করের নিজের লেখা টীকায় স্পষ্ট লেখা থাকিত 'মগধের অভয়াকর-গুপ্ত'। 'বজ্রযানাপত্তি মঞ্জরী' নামে অভয়াকরের লেখা আর একখানি গ্রন্থেও দেখা যায় 'মগধের অভয়াকরগুপ্ত'। কাজেই আপাততঃ অভয়াকরকে মাগধ বা বিহারী বলিয়া মনে করিয়া লওয়াই যুক্তিসঙ্গত। বস্তুতঃ তাঁহার অন্যান্য কোনও কোনও গ্রন্থেও তাঁহাকে, বিক্রমশীল ও নালন্দা, মগধের এই দুই শ্রেষ্ঠ বিহারের

সহিত সংশ্লিষ্ট দেখিতে পাই। জগদ্দল-বিহার রামপালের নিজের সৃষ্ট হইলেও, উহার সহিত রামপালের সমসাময়িক অভয়কারের নাম কোথাও জড়িত দেখা যায় না।

জগদ্দলের সর্বাপেক্ষা দুই প্রখ্যাত পণ্ডিতের নাম বিভূতিচন্দ্র ও দানশীল[১০৮]। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের সভাপতিরূপে পরলোকগত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যখন 'বাঙ্গালার গৌরব'-কথা বিবৃত করিয়াছিলেন, তখন বাঙ্গালীজাতি উৎকর্ণ হইয়া বৌদ্ধ মহাপণ্ডিত বিভূতিচন্দ্রের কথাও শ্রবণ করিয়াছিল। একে বাঙ্গালার অতীত গৌরবের কাহিনী, তদুপরি শাস্ত্রী মহাশয়ের বিশিষ্ট প্রকাশভঙ্গী, কাজেই সে কাহিনী এই 'আত্ম-বিস্মৃত' জাতির মন যুগপৎ বিমুগ্ধ ও পুলকচঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। বেণ্ডাল সাহেব প্রণীত 'কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথির ক্যাটালগে' উল্লিখিত শান্তিদেবের 'শিক্ষা-সমুচ্চয়ে'র একখানি পুঁথির পুষ্পিকায় "দেয়ধর্মোয়ং প্রবরমহাযানযায়িনো জগদ্দল পণ্ডিত বিভূতিচন্দ্রস্য"—লেখা দেখিয়া শাস্ত্রী মহাশয়ই সর্ব-প্রথম বিভূতিচন্দ্রকে বাঙ্গালী অনুমান করিয়াছিলেন, কারণ মহাযান-পন্থী বিভূতিচন্দ্র জগদ্দল নামে যে বিহারে থাকিতেন তাহা বাঙ্গালাদেশে অবস্থিত ছিল। বিভূতিচন্দ্র সম্বন্ধে বলিতে গিয়া শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছিলেন, "এই (জগদ্দল) বিহারে অনেক বড় বড় ভিক্ষু থাকিতেন, তাঁহাদের মধ্যে বিভূতিচন্দ্র প্রধান। বিভূতিচন্দ্র অনেকগুলি সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থের টীকা-টিপ্পনী

[১০৮] বিভূতিচন্দ্র সম্বন্ধে 'বিচিত্রা', ১৩৪৫, চৈত্র, পৃঃ ২৯৩-২৯৬ দ্রষ্টব্য।

লিখিয়াছিলেন। যখন তিব্বতদেশে এই সকল বৌদ্ধগ্রন্থ তর্জমা হইতেছে, তখন তিনি অনেক পুস্তকের তর্জমায় সাহায্য করিয়াছেন, এবং নিজেও দুইচারিখানি পুস্তক তর্জমা করিয়াছেন।"

কিন্তু বিভূতিচন্দ্রের আসল বা আদি পরিচয়টা কি? সে সম্বন্ধে সেদিন কোনও কথা শাস্ত্রী মহাশয়ের পক্ষে উদ্ধার করা সম্ভবপর হয় নাই, এখনও প্রায় তাই। তবে, বিভূতিচন্দ্র নগণ্য বংশের ছেলে নয়, তিনি ছিলেন রাজপুত্র। শ্রীধরের 'বজ্রচর্চিকা-কর্মসাধন' নামে পুস্তকখানির যে তিব্বতীয় অনুবাদ করিয়াছিলেন বিভূতিচন্দ্র ও তিব্বতদেশীয় প্রজ্ঞারত্ন, তাহাতে স্পষ্ট ভাষায় বিভূতিচন্দ্রকে 'রাজপুত্র' বলা হইয়াছে। ঐ রাজাটি কে, নাম কি তাঁহার, কোন্ বংশ, তাহা জানা যায় না, তিনি কোন্ স্থানে রাজত্ব করিতেন তাহাও অজ্ঞাত,—কেবল জানি তাঁহার আত্মজ বিভূতিচন্দ্রের চিত্ত, শীলভদ্র, শান্তরক্ষিত, অতীশ দীপঙ্করের মতই, একদা ভোগ-লালসার প্রতি, বিষয়-বৈভবের প্রতি, সংসারের প্রতি নিদারুণ বীতস্পৃহ হইয়া উঠিয়াছিল, এবং তিনি অজানা কোনও আলোকের সন্ধানে, দীর্ঘদিন পূর্বের আর এক রাজোপম ঐশ্বর্যশালীর পুত্রের পুণ্য নাম স্মরণ করিতে করিতে, কাষায় বস্ত্র ধারণ করিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘে যোগদান করিয়াছিলেন। রাজপ্রাসাদের সকল বিলাস-সম্ভোগ, দাস দাসী, সৈন্য-সামন্ত, সিংহাসন, সবই পশ্চাতে পড়িয়া রহিল, জীবনপথের সঙ্গী যাঁহারা তাঁহাদের দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না,—বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করিয়া তিনি গিয়া বিহারে প্রবেশ করিলেন।

গ্রন্থকার, টীকাকার, অনুবাদক ও সংশোধক হিসাবে 'তেঙ্গুরে' যে বহু-সংখ্যক পুস্তকের সহিত বিভূতিচন্দ্রের নাম জড়িত আছে, তাহাতে তাঁহার নামের সহিত কতগুলি বিশেষণ দেখা যায়, যথা 'পণ্ডিত', 'মহাপণ্ডিত', 'উপাধ্যায়', 'আচার্য', 'ভারতবাসী', 'জগদ্দলবাসী' ইত্যাদি। 'লুহিপাদাভিসময়বৃত্তি', 'ষড়ঙ্গযোগটীকা', 'জ্ঞানচক্ষুসাধন' প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তকে আবার 'পূর্ব-ভারতে জগদ্দল বিহারস্থ' বলিয়া কথাটা পাওয়া যায়। জগদ্দল ছিল উত্তর-বঙ্গের রামাবতী নগরে। একদা পূর্ব-বঙ্গের বিক্রমপুরের অন্তর্গত রামপাল নামক স্থানকে রামাবতী মনে করিয়া যে ভুলের সৃষ্টি হইয়াছিল, সে ভুল কিছুদিনের মধ্যে আবার সংশোধিতও হইয়াছিল।

আশ্চর্য, 'তেঙ্গুরে' উল্লিখিত বিভূতিচন্দ্রের নামের সহিত সংশ্লিষ্ট এতগুলি পুস্তকের মধ্যে যেখানে যেখানে বিহারের উল্লেখ আছে সেখানে প্রায় সর্বত্রই এক জগদ্দল-বিহারের কথাই রহিয়াছে। ততোধিক আশ্চর্য, ইহা সত্ত্বেও, বিভূতিচন্দ্র সম্বন্ধে প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করিতে গিয়া এক প্রবন্ধে পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন মহাশয় বলিয়াছেন, বিভূতিচন্দ্র ছিলেন বিক্রমশীল-বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অল্পবয়স্ক পণ্ডিত[১০৯]! পণ্ডিত রাহুল এই তথ্যটি কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা ব্যক্ত করেন নাই, কিন্তু এই উক্তির

(১০৯) *Journal of the Bihar and Orissa Research Society*, 1937. March, p. 11.

নিগূঢ়ার্থ হইতেছে যে, বিভূতিচন্দ্র ছিলেন বিহার প্রদেশের গৌরব। পণ্ডিতপ্রবর রাহুল সাংকৃত্যায়ন মহোদয় অতীশ দীপঙ্করের জন্মস্থানও 'ভাগলপুরে' লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই প্রচেষ্টার উত্তর যথাসময়ে দেওয়া হইয়াছে[১১০]। অবশ্য এমন হইতেই পারে যে, দুই-একখানি বা ততোধিক গ্রন্থে বিভূতিচন্দ্রের নামের সহিত বিক্রমশীল-বিহারের যোগাযোগ লক্ষিত হয়, অর্থাৎ বিভূতিচন্দ্র কিছুদিন বিক্রমশীলেও ছিলেন, কিন্তু তাহা হইলেও, তাহার উপর নির্ভর করিয়া এত বড় কথা বলা যায়না যে, "বিভূতিচন্দ্র বিক্রমশীল-বিহারের পণ্ডিত"। তাঁহার এই পরিচয় মিথ্যা। বিভূতিচন্দ্র জাতিতে হয়ত বাঙ্গালী না-ও হইতে পারেন, কিন্তু তিনি বরেন্দ্রীর জগদ্দলের গৌরব ছিলেন, একথা অস্বীকার করিলে চলিবে কেন?

পণ্ডিত রাহুল আরও বলেন, "বিক্রমশীল যখন মুসলমানগণ কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল, তখন বিভূতিচন্দ্র তাঁহার গুরু,—বিক্রমশীলের শেষ প্রধানাচার্য—শাক্যশ্রীভদ্রের সহিত দেশত্যাগে অনুগমন করিয়াছিলেন। প্রথমে তাঁহারা পূর্ববঙ্গের জগত্তালে গেলেন, তারপর সম্ভবতঃ উহার ধ্বংসের পর তাঁহারা গেলেন নেপালে, এবং তথা হইতে (তিব্বতের) শক্য-বিহারের প্রধানাচার্য তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। এইরূপে ১২০৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা তিব্বতে গেলেন। বিভূতিচন্দ্র ব্যতীত দানশীল প্রভৃতি আরও

(১১০) প্রবাসী, ১৩৪৪, আশ্বিন, পৃঃ ৮২০।

কয়েক জন পণ্ডিত শাক্যশ্রীভদ্রের সঙ্গে গিয়াছিলেন।” সেই ‘পূর্ববঙ্গের জগত্তাল’! জগদ্দলের অবস্থান সম্বন্ধে যিনি সঠিক বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, তিনি এই সকল নূতন তথ্য জানিলেন কোন্ গ্রন্থ হইতে, এবং সেই মূলগ্রন্থের নাম কি? শাক্যশ্রীভদ্র বিভূতিচন্দ্রের গুরু ছিলেন, এই তথ্য কোথায় আছে? ‘পগ্ সাম্ জোন্ জ্যঙ্গ’ অনুসারে, উদ্দণ্ডপুর বা ওদন্তপুরী-বিহারের শাক্যশ্রীভদ্র কাশ্মীরের অধিবাসী ছিলেন, এবং ‘তুরস্কগণ’ কর্তৃক উহার ধ্বংসের পর তিনি পলাইয়া ‘ওডিবিষে’র (উড়িষ্যার) জগদ্দলে আশ্রয় লইয়াছিলেন। জানিনা, এই গ্রন্থের সাক্ষ্যের উপরেই পণ্ডিত রাহুল নির্ভর করিয়াছেন কিনা,—করিয়া থাকিলে ‘ওডিবিষে’র স্থানে ‘পূর্ববঙ্গ’ কথাটি তিনি নিজে বসাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু ‘জগত্তাল’ বা জগদ্দল পূর্ব-বঙ্গেও নয়, উত্তর-বঙ্গে। বিক্রমশীল (অথবা উদ্দণ্ডপুর)-বিহার মুসলমানগণ ধ্বংস করিয়াছিল ১১৯৮ বা ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে। শাক্যশ্রীভদ্র, বিভূতিচন্দ্র প্রভৃতি তিব্বতে গিয়া থাকিলে পণ্ডিত রাহুলের মতানুসারে স্বীকার করিতে হয় ঐ বিহার ধ্বংসের পর দুই-তিন বৎসরের মধ্যেই জগদ্দলও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, অর্থাৎ বিভূতিচন্দ্র জগদ্দলে ছিলেন অত্যল্পকাল। কিন্তু অতগুলি বিভিন্ন গ্রন্থে যে বিভূতিচন্দ্রকে ‘জগদ্দল-বাসী’, ‘জগদ্দল-পণ্ডিত’ প্রভৃতি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা এইরূপ অনুমানের পরিপন্থী। আর এক কথা। মনোরথ নন্দীর ‘প্রমাণ-বার্তিক-ভাষ্যে’র যে একখানি পুঁথি বিভূতিচন্দ্র স্বহস্তে লিখিয়াছিলেন, তাহার শেষে

নিবদ্ধ কতিপয় শ্লোকের মধ্যে একটি হইতে জানা যায়, বিভূতিচন্দ্রের (অজ্ঞাতনামা) গুরু কাশ্মীর দেশীয় ছিলেন। পণ্ডিত রাহুলের যুক্তিটা হয়ত এই,—বিভূতিচন্দ্রের গুরু কাশ্মীরী এবং শাক্য-শ্রীভদ্রও কাশ্মীরী, অতএব শাক্যশ্রীভদ্রই বিভূতিচন্দ্রের গুরু। এই যুক্তি মানিয়া লইলেও, বিভূতিচন্দ্রকে বিক্রমশীলে পাঠাইতে হইবে কেন? বরঞ্চ শাক্যশ্রীভদ্রকেই বরেন্দ্রীর জগদ্দলে আনিলে ক্ষতি কি? জগদ্দলের অপর গৌরব দানশীলের তারিখ বিভূতি-চন্দ্রের একটু পরে বলিয়াই ধারণা হইতেছে। এই ধারণা সত্য হইলে, শাক্যশ্রীভদ্রও বিভূতিচন্দ্রের কিছু পরবর্তী ছিলেন বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে, কারণ দানশীল ও শাক্যশ্রীভদ্র দুইজনে একত্র হইয়া অভয়াকরগুপ্তের 'শ্রীমঞ্জুবজ্রাদি-ক্রমাভিসময়-সমুচ্চয়-নিষ্পন্ন (যোগাবলী নাম)' গ্রন্থখানি তিব্বতীয়ে অনুবাদ করিয়াছিলেন। এক্ষেত্রে শাক্যশ্রীভদ্রের পক্ষে বিভূতিচন্দ্রের গুরু হওয়ার কথাটা বিলক্ষণ সন্দেহজনক হইয়া পরে।

বিভূতিচন্দ্র একদা তিব্বতে গিয়া কিছুদিন ছিলেন, এবং তিব্বত হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া আবার কিছুকাল নেপালে বাস করিয়াছিলেন ও সেই সময়ে জনৈক ব্যক্তিকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, একথা বিহার ও উড়িষ্যার রিসার্চ সোসাইটির লাইব্রেরীতে রক্ষিত একখানি তালপত্রে লিখিত আছে,—"ভোটং গত্বা ততঃ স্থিত্বা সর্বম···নং। পশ্চান্নেপালতঃ স্থিত্বা পত্রীয়ং প্রহিতা ময়া" ইত্যাদি। বিভূতিচন্দ্র যে কিছুকাল নেপালে অবস্থান

করিয়াছিলেন একথা সত্য, কারণ 'আর্য-অমোঘ পাশ-সাধন' নামক একখানি পুস্তকের অনুবাদ তিনি ও তিব্বতীয় প্রজ্ঞাবর্মণ করিয়াছিলেন নেপালের সমস্থ-বিহারে বসিয়া। অতএব তাঁহার তিব্বতে গমনের কথাও অসম্ভব বা অবিশ্বাস্য নয়। তিব্বতীয় বিহারে বিভূতিচন্দ্রের স্বহস্ত লিখিত পুঁথি আবিষ্কারও তাঁহার তিব্বত গমনের কথা সমর্থনই করে। তাঁহার তিব্বত গমনের প্রসঙ্গে অতীশ দীপঙ্করের সে দেশে গমনের কথা স্বভাবতঃই মনে জাগে। বিভূতিচন্দ্র তিব্বতে গিয়া পুনরায় ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু অতীশ সেই যে গিয়াছিলেন আর ফিরেন নাই। বিভূতিচন্দ্রকে কেন ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল জানা যায় না, কিন্তু একথা নিশ্চিত যে অতীশের ন্যায় সম্মান তিনি বা অপর কেহ তথায় পান নাই।

রাজপুত্র বিভূতিচন্দ্রের সময় সম্বন্ধে এই টুকুই জানিতে পারি যে, তিনি পণ্ডিত অভয়াকরগুপ্তের হয় সমসাময়িক, না হয় কিছু পরবর্তী ছিলেন, কারণ অভয়কারের দুই বা ততোধিক গ্রন্থের অনুবাদ তিনি করিয়াছিলেন অথবা করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। আপাততঃ বোধ হয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁহার কালনির্ণয় করাই যুক্তিসঙ্গত হইবে।

দানশীলও অভয়াকরগুপ্তের এবং শুভাকরগুপ্তের খানকয়েক পুস্তক অনুবাদ করিয়াছিলেন। 'পগ্ সাম্ জোন্ জ্যঙ্গ' অনুসারে শুভাকর ছিলেন অভয়াকরের অধীনে মগধের একজন বৌদ্ধাচার্য। এই তথ্যের সহিত শুভাকরগুপ্তের শাক্যশ্রীভদ্রের (১২০০ খৃঃ) গুরু

হওয়ার কথার[১১১] সঙ্গতি রক্ষাই হয়। দানশীল, তাহা হইলে, শুভাকরগুপ্তের পরবর্তী এবং শাক্যশ্রীভদ্রের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে আর অধিক কোনও তথ্য জানা যায়না।

এই সকল পণ্ডিত ব্যতীত, পাল-যুগের আরও কয়েকজন অপেক্ষাকৃত কম খ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিতের সন্ধানও পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একজন বাঙ্গালার কাপট্য-বিহারের প্রজ্ঞাবর্মণ, যিনি 'সূত্রপিটকে'র 'ক্ষুদ্রক নিকায়ে'র 'উদানবগ্গে'র উপর ধর্মত্রাতের অসমাপ্ত টীকাখানি সমাপ্ত করিয়াছিলেন, এবং ধর্মকীর্তির 'হেতু-বিন্দু-প্রকরণ' নামা ন্যায়ের পুস্তকখানি তিব্বতীয়ে অনুবাদ করিয়াছিলেন। তন্ত্রশাস্ত্রের উপরেও তাঁহার দুইখানি টীকা আছে,—'বিশেষ-স্তব-টীকা' এবং 'দেবাতিশয়-স্তোত্র-টীকা'। প্রজ্ঞাবর্মণকে পাল-যুগের বলার কারণ, তাঁহার গুরু বোধিভদ্র ছিলেন সোমপুরী-বিহারের অধিবাসী। বোধিভদ্র 'রহস্যানন্দ-তিলক', 'সমাধি-সম্ভার-পরিবর্ত', 'বোধিসত্ত্ব-সম্বর-বিধি', 'যোগলক্ষণ-সত্য', 'বোধিসত্ত্ব-সম্বর-বিংশক-পঞ্জিকা', 'কালচক্র-গণিত-মুখাদেশ' প্রভৃতি কতগুলি তান্ত্রিক পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। বোধিভদ্রের গুরু, মহামতি, 'বুদ্ধানুস্মৃত্যনুত্তর-ভাবনা' লিখিয়াছিলেন। (সাহোরের) শান্তিদেবের বংশধর বলিয়া কথিত মেকল লিখিয়াছিলেন 'চিত্তচৈতন্য-শমনোপায়'। 'রোসন-নীলাম্বরধর-বজ্রপাণি-নাম-সাধনে'র লেখক উড্ডিয়ানের অমোঘনাথ। উড্ডিয়ানের আর একজন গ্রন্থকার ছিলেন

(১১১) Cordier, II, p. 93.

পুণ্ডরীক[১১২]। তাঁহার একটা বিশেষ পরিচয়ও আছে, তিনি ছিলেন রাজা। তিনি আবার অবলোকিতেশ্বরের অবতার বলিয়াও কথিত। তাঁহার আরও খানিকটা পরিচয় উদ্ধার হইলে হয়ত দেখা যাইবে, তিনি বিভূতিচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায়ই প্রাচীন বাঙ্গালার একজন গৌরব। 'আর্য-মঞ্জু-নাম সংগীতি-টীকা'র উপর 'বিমল প্রভা' নামে একখানি টীকা তিনি রচনা করিয়াছিলেন। পূর্ব-বঙ্গের রাজা হরিবর্মদেবের ৩৯ রাজ্যাঙ্কে লিখিত এই টীকার একখানি পুঁথি নেপাল হইতে পাওয়া গিয়াছে। পুণ্ডরীকের নামান্তর ছিল জ্ঞানবজ্র।

এ যাবৎ এই যে সকল পণ্ডিতদিগকে বাঙ্গালী বলিয়া অনুমান বা নির্ধারণ করা গেল, 'তেঙ্গুরে' সংরক্ষিত ইঁহাদের গ্রন্থগুলির নামের তালিকা সকল ক্ষেত্রে, নিষ্প্রয়োজন বোধেই, উদ্ধৃত করা হইল না, কিন্তু ইঁহাদের রচনাবলী যত্ন ও আয়াস সহকারে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, সম্বর (চক্রসম্বর, সহজ সম্বর) নীলাম্বরধর-বজ্রপাণি, হেবজ্র ও যমারি (রক্তযমারি ও কৃষ্ণযমারি) ইঁহারাই ছিলেন এই সুধী-সমাজের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় দেবতা, কারণ এই সকল সুধিবর্গের অধিকাংশই এই কয়টি দেবতা সম্বন্ধে স্তব-স্তুতিমূলক গ্রন্থ বা গ্রন্থের টীকা লিখিয়াছিলেন। ইঁহাদের পরই নাম করিতে হয় মঞ্জুশ্রী, হেরুক, মহাকাল, বজ্রভৈরব, তারা (বজ্রতারা, সিততারা, জাঙ্গুলীতারা, ধনদাতারা ও তারোদ্ভব কুরুকুল্লা), মহামায়া ও বজ্রযোগিনী,—এই কয়টি দেব-দেবীর। বজ্রবারাহী, একজটা

(১১২) Cordier, II, p. 112.

মারীচী, চুন্দা, জাঙ্গুলী, জম্ভল, সরস্বতী, বজ্রচর্চিকা, মহামায়ূরী মহাপ্রতিসরা ও জ্ঞানডাকিনী সম্বন্ধেও কেহ কেহ লিখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অল্প। এই তথ্যের সহিত মূর্তি-তত্ত্ব হইতে লব্ধ প্রমাণের কি করিয়া সঙ্গতি ও সমন্বয় সাধন করা যায়, তাহা অনুসন্ধিৎসুগণের বিচার্য বস্তু হইয়া রহিল।

পাল-যুগে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন যানকে কেন্দ্র করিয়া যে বিপুল সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তদ্দারা একথা অনুমান করিতে হইবে না যে, বাঙ্গালার তৎকালীন বৌদ্ধগণ কেবল তান্ত্রিকতারই অনুশীলন করিতেন। পরন্তু ইহা এখন বলিতে পারি, সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত কম হইলেও বিশুদ্ধ মহাযানের, এমন কি বিজ্ঞানবাদের উপরেও কতকগুলি গ্রন্থ এই সময়েই রচিত হইয়াছিল। অর্থাৎ, তান্ত্রিকতার চাপে পড়িয়া মহাযান ও বিজ্ঞানবাদ এই যুগে বাঙ্গালা-দেশ হইতে অন্তর্ধান করে নাই।

ধর্মপালের সমসাময়িক আচার্য হরিভদ্র 'অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞা-পারমিতা'র উপর 'অভিসময়ালঙ্কারাবলোক' নামে বিখ্যাত টীকা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে মধ্যমক ও যোগাচার সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিরোধ চলিতেছিল তাহারই নিরসনের উদ্দেশ্যে নাগার্জুন ও মৈত্রেয়নাথের মতবাদের একটা সমন্বয়ের সাধু চেষ্টা আছে। টীকা-খানি লেখা হইয়াছিল ত্রৈকূটক-বিহারে, এবং শুধু ধর্মপালের পৃষ্ঠপোষকতায় নয়, সম্ভবতঃ আদেশেও। ইহার একখানি পুঁথি নেপালে পাওয়া গিয়াছে। তিব্বতের রাজা খ্রি-স্রং-লিদ্-হোড়্-দি-

স্তান্-এর আদেশে ভারতীয় আচার্য সুভাষিত ও তিব্বতীয় লোচাব রত্নভদ্র (৯৫৮-১০৫৫খৃঃ) কর্তৃক ইহা তিব্বতীয়ে অনূদিত হইয়াছিল। এই টীকা ব্যতীত, হরিভদ্র যে আরও কতগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বু-তোন্ নামক তিব্বতীয় গ্রন্থকারের 'বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে' হরিভদ্রের জীবনী সম্বন্ধে যে সকল উপাখ্যান ও তাঁহার গ্রন্থাবলীর যে তালিকা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়। তন্মধ্যে 'স্ফুটার্থ' নামক টীকা, 'সঞ্চয়'-টীকা 'সুবোধিনী', 'প্রজ্ঞাপারমিতা ভাবনা' এবং অষ্টাধ্যায়ে 'পঞ্চবিংশতি-সাহস্রিকা'র একটি সংক্ষিপ্তসার উল্লেখযোগ্য। পূর্ববর্তী চারিখানি প্রধান টীকা হইতে তিনি তাঁহার গ্রন্থগুলির উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এবং অসঙ্গ ও বিমুক্তসেন নামক ধর্মাচার্যদ্বয়ের গ্রন্থাদি আশ্রয় করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন বলিয়াও কথিত আছে[১১৩]।

'তেঙ্গুরে'র সাক্ষ্যে দেখিতে পাই, ধর্মপাল-নরেশ্বরের আনুকূল্যে জিনমিত্র ও তিব্বতীয় জ্ঞানসেন জিনপুত্রের 'অভিধর্ম সমুচ্চয় ব্যাখ্যা' তিব্বতীয়ে অনুবাদ করিয়াছিলেন[১১৪]। এই জিনমিত্র আবার ভারতীয় দানশীল ও শীলেন্দ্রবোধির সহিত একত্রে নাগার্জুনের 'প্রতীত্য সমুৎপাদ হৃদয় কারিকা' অনুবাদ করিয়াছিলেন। অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এস্থানে বলা যায় যে, তিব্বতীয় রাজা খ্রি-দি-

(১১৩) *Ind. Cult.*, VI, pp. 327—28.
(১১৪) *Ibid*, p, 328.

স্রং-ৎসান্-এর আদেশে ধর্মপালের সমসাময়িক জিনমিত্র, দানশীল ও শীলেন্দ্রবোধি প্রভৃতি মিলিয়া একখানি সংস্কৃত-তিব্বতীয় অভিধান রচনা করিয়াছিলেন।

বুদ্ধশ্রী-জ্ঞান অথবা বুদ্ধজ্ঞানপাদের 'সঞ্চয়-গাথা-পঞ্জিকা'য় তিনি হরিভদ্রের প্রধান শিষ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তিব্বতীয় জনশ্রুতিতে তিনি ধর্মপালের সময় বিক্রমশীল-মহাবিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন। 'প্রজ্ঞাপ্রদীপাবলী' নামে তিনি 'অভিসময়ালঙ্কারে'র (বিজ্ঞানবাদ) বৃত্তি লিখিয়াছিলেন। তাঁহার অপর একখানি গ্রন্থের নাম 'মহাযানলক্ষণসমুচ্চয়'। এই বুদ্ধশ্রীজ্ঞান ছিলেন উড্ডিয়ান বিনির্গত।

শান্তরক্ষিত 'মধ্যমকালঙ্কার-কারিকা' রচনা করিয়াছিলেন এবং নিজেই উহার একখানি বৃত্তি লিখিয়াছিলেন। শান্তরক্ষিতের 'সত্যদ্বয় বিভঙ্গ পঞ্জিকা'ও সম্ভবতঃ একখানি মহাযানীয় গ্রন্থ।

লুইপাদের 'শ্রীভগবদ্-অভিসময়' এবং 'অভিসময় বিভঙ্গ' নামক পুস্তকদ্বয়ে যে দার্শনিক আলোচনা আছে তাহা ঠিক মহাযান-মতানুযায়ী নয়, তাহা প্রধানতঃ তাঁহার নিজস্ব দার্শনিক মতবাদ অনুসারে। 'ত্যেঙ্গুরের ক্যাটালগে' 'অভিসময়বিভঙ্গে'র বর্ণনা দেখিয়া মনে হয় বুঝি গ্রন্থখানি লূহিপাদ এবং মহাপণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান একত্র রচনা করিয়াছিলেন এবং দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান উহার তিব্বতীয় অনুবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঘটনাটা তাহা নয়। কারণ,

নবম শতাব্দীর শেষে[১১৫] নৈয়ায়িক রত্নকীর্তি 'অভিসময় বিভঙ্গে'র একখানি টীকা লিখিয়াছিলেন,[১১৬] কাজেই ঐ পুস্তক রচনায় একাদশ শতাব্দীতে অতীশ দীপঙ্করের কোনও হাত থাকিতে পারেনা[১১৭]। সুতরাং রত্নকীর্তির পূর্ববর্তী ও রাঢ়ের লুইপাদ এবং দশম শতাব্দীর শেষে বিদ্যমান চন্দ্রদ্বীপের মৎস্যেন্দ্রনাথকে অভিন্ন বলিয়া যে মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে[১১৮] তাহা ভুল। তিব্বতীয় ভাষায় 'লুই' মানে মৎস্যোদর বা মৎস্যান্ত্রাদ, এবং, দুঃখের বিষয়, মৎস্যান্ত্রাদ মীন(নাথে)র বংশধর বা সন্তান মৎস্যেন্দ্রনাথ হইতে ভিন্ন ইহা স্পষ্টভাবে কথিত থাকা সত্ত্বেও[১১৯] মতবাদটি প্রচার করা হইয়াছে।

যোগাচার সম্প্রদায়ের 'পঞ্চবিংশতি-সাহস্রিকা' ব্যাখ্যান করিয়া মৈত্রেয়নাথ যে 'অভিসময়ালঙ্কার' লিখিয়াছিলেন, তাহার উপর 'শুদ্ধিমতী' নামে একখানি টীকা লিখিয়াছিলেন দশম শতাব্দীর শেষে বা একাদশ শতাব্দীর প্রথমে রত্নাকর-শান্তি। তিনি আট হাজার শ্লোকে 'সারোত্তমা' নামক গ্রন্থে 'অষ্টসাহাস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা'ও (মহাযান) ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। 'প্রজ্ঞাপারমিতা'র দার্শনিক তত্ত্বের উপর

---

(১১৫) Keith's *Buddhist Philosophy in India and Ceylon*, p. 233.

(১১৬) Cordier, II. p. 50.

(১১৭) সা-প-প, ১৩৩৫, পৃঃ ১৫৭ এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

(১১৮) *HBDU*, pp. 342—43.

(১১৯) Cordier, II, p. 33.

'প্রজ্ঞাপারমিতা ভাবনোপদেশ' এবং 'প্রজ্ঞাপারমিতো(প)দেশ' নামে আরও দুইখানি বই রচনা কবিয়াছিলেন।

অতীশ দীপঙ্করের তথাকথিত অপর গুরু জেতারি মহাযানের উপর অন্ততঃ দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, 'বোধিচিত্তোৎপাদ-সমাদান-বিধি', এবং 'বোধ্যাপত্তি-দেশনা'র টীকা 'বোধিসত্ত্ব শিক্ষা-ক্রম'।

অতীশ দীপঙ্কর যে 'প্রজ্ঞাপারমিতা-পিণ্ডার্থ-প্রদীপ' লিখিয়াছিলেন, তাহা সম্ভবতঃ 'পঞ্চবিংশতি-সাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা'র নয়, 'অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা'র একখানি বৃত্তি। তাঁহার সম্বন্ধে কথিত আছে, তিনি মহাযানের উপর এক শতাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন[১২০]। তন্মধ্যে 'মধ্যমোপদেশ সত্যদ্বয়বতার', 'সংগ্রহ গর্ভ', 'বোধিসত্ত্ব-মণ্যাবলী', 'মহাযান-পথ-সাধন বর্ণ সংগ্রহ', 'সূত্রার্থ সমুচ্চয়োপদেশ' এবং 'শিক্ষাসমুচ্চয় অভিসময়' উল্লেখযোগ্য। তাঁহার 'বোধিমার্গ প্রদীপ'ও এতদ্‌সম্পর্কে উল্লেখ করা যাইতে পারে। শান্তিদেবের বোধিচিত্তের স্তুতিমূলক, মহাযান-মতের সারসংগ্রহ, 'বোধিচর্যাবতারে'র দুইখানি টীকা দুই বাঙ্গালী লিখিয়াছিলেন, অতীশ দীপঙ্কর ও তাঁহার পরে জগদ্দলের বিভূতিচন্দ্র।

'শ্রীরাজ-জগদ্দল-নিবাসিন্' কর্তৃক রচিত 'অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা'র 'আম্নায়নুসারিনী' নামে যে টিপ্পনী আছে, তাহা মহীপালের সপ্তম রাজ্যাঙ্কে শ্রীমহাবোধি মন্দিরে সংশোধিত

(১২০) *J. A. S. B*, 1891, p. 51.

হইয়াছিল[১২১]। কে এই রাজা-জগদ্দল নিবাসী? কর্দিয়ার সাহেব বলেন, গ্রন্থের পুষ্পিকায় ইঁহাকে নৃপতি রামপালে'র সহিত একাকার করা হইয়াছে। রাজা হইবার পর রামপাল রামাবতী নামক নূতন রাজধানীতে জগদ্দল-মহাবিহারের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাঁহার রাজত্বের পূর্বে জগদ্দল ছিল না। কিন্তু ইহার মধ্যে 'মহীপালের সপ্তম রাজ্যাঙ্কে'র প্রসঙ্গ আসিল কিরূপে তাহা ঠিক বুঝা যাইতেছেনা। তবে হয়ত এরূপ হইতে পারে যে, কুমার রামপাল তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা দ্বিতীয় মহীপালের সপ্তম রাজ্যাঙ্কে টিপ্পনীটি রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রেও ধরিয়া লইতে হইবে, টিপ্পনীতে 'শ্রীরাজ-জগদ্দল-নিবসিন্' কথাটি পরবর্তী সংযোজনা।

রামপালের রাজত্বকালে অভয়াকরগুপ্ত 'যোগাবলী' নামে অভিসময়ের উপর একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। ইহা ছাড়াও অভয়াকরের মহাযান সম্পর্কে অন্ততঃ আরও দুইখানি গ্রন্থ আছে, একখানি বত্রিশ পরিবর্তে বা অধ্যায়ে 'মর্মকৌমুদী' নামে 'অষ্ট-সাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা'র টীকা, অপরখানি 'বোধিপদ্ধতি'।

এতদ্ব্যতীত সোমপুরী-বিহারের বোধিভদ্র 'জ্ঞানসারসমুচ্চয়' নামে যে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন তাহা সম্ভবতঃ মহাযান-গ্রন্থ। মহাযানের ক্রিয়ানুষ্ঠান সম্বন্ধে 'ক্রিয়াসংগ্রহ-পঞ্জিকা' নামে যে বিস্তারিত ভাষ্য আছে [১২২], তাহার লেখক কুলদত্তও হয়ত বাঙ্গালীই।

(১২১) Cordier, III p. 285.
(১২২) *Descriptive Catalogue of Sans. Mss. in Govt. Collection under the care of the As. Soc. of Bengal*, H. P. Sāstrī, Vol. I, pp. 119-26.

বাঙ্গালার বৌদ্ধ বিহার

জীবনোপায়ের ভাবনা, নিন্দাভাজন হওয়া, মৃত্যু, পশুযোনিতে জন্মগ্রহণ এবং সাংসারিক ক্লেশ—এই পঞ্চ-ভাবনার পথ হইতে দূরে থাকিয়া অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞানোৎপত্তি প্রভৃতি দুঃখস্কন্ধ নিরোধ করিয়া কিরূপে নির্বাণ লাভ করা যায়, এতদুদ্দেশ্যে অনেক বৌদ্ধ সংসার ত্যাগ করিয়া আসিতেন। গৃহীও নির্বাণ লাভ করিতে পারেন; কিন্তু গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিলে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে চিত্ত অধিকতর স্থির ও অবহিত হয়, এই কারণে ভগবান বুদ্ধ সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী বা ভিক্ষু হইতে উৎসাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু মহাভিনিষ্ক্রমণের পর নানা স্থানে সুদীর্ঘ ছয় বৎসর ধরিয়া কঠোর তপশ্চর্যা করিয়াও ইন্দ্রিয়নিরোধ, পাপচিন্তার অবসান ও মানসিক স্থৈর্য সাধিত হইল না দেখিয়া তিনি হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে কঠোর তপশ্চর্যায় দেহকে নিগ্রহ করা নিতান্তই নিরর্থক। অতএব বিলাসিতা ও কঠোরতা এই দুইয়ের 'মধ্যপথ' অবলম্বন করিয়া ধর্মসাধন করিতে শিষ্যমণ্ডলীকে তিনি উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের উদারতায় কাহারও যেমন গৃহত্যাগ করার পক্ষে বাধ্যবাধকতা ছিলনা, অতি-বিরক্তের পক্ষে তেমনই অরণ্যবাসেরও নিষেধ ছিলনা। গৃহে অনেকেই উপাসক ভাবে থাকিতেন, গৃহত্যাগ করিয়া অনেকে অরণ্যেও চলিয়া যাইতেন। কিন্তু বাকী গৃহত্যাগী যে ভিক্ষুগণ—তাঁহারা কোথায় থাকিতেন, কি করিতেন?

তাঁহারা সাধারণতঃ থাকিতেন 'বিহারে'। 'বিহার' ব্যতীত তাঁহাদের জন্য আর চারি প্রকার বাসস্থানও বুদ্ধদেব অনুমোদন করিয়াছিলেন,—অদ্ধযোগ, পাসাদ, হম্মিয় ও গুহা ('বিনয়পিটক', চুল্লবগ্‌গ, ৬।১।২)। এই পাঁচটির সমষ্টিগত নাম 'পঞ্চলেনানি'। অশ্বঘোষ শেষ চারিটির স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা দিয়াছেন। "অদ্ধযোগো তি সুবণ্ণ বঙ্গগেহম্", সুবর্ণ-রঞ্জিত দেশীয় গৃহের অনুরূপ গৃহের নাম 'অদ্ধযোগ' (অর্দ্ধযোগ)। "পাসাদো তি দীঘপাসাদো", (তলযুক্ত) দীর্ঘ প্রাসাদের নাম 'পাসাদ' (প্রাসাদ)। "হম্মিয়ন তি উপরি আকাশতলে পতিথিত কূটাগারো পাসাদ এব", যে প্রাসাদের সর্বোচ্চ তলায় একটি কূটাগার (গৃহ) থাকে, তাহার নাম 'হম্মিয়' (হর্ম্য)। আর "গুহা তি ইথকগুহা শিলাগুহা দারুগুহা পংশুগুহা", 'গুহা' ইষ্টকনির্মিত, পাহাড়ে খোদিত বা কাষ্ঠে রচিত কুটির।

'অদ্ধযোগ' শব্দের উপরোক্ত ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করিলে বুঝিতে হয় মহারাজ কণিষ্কের সমসাময়িক অশ্বঘোষের সময়, অর্থাৎ খৃষ্টীয় প্রথম কিংবা দ্বিতীয় শতাব্দীতে, বঙ্গদেশে সুবর্ণরঞ্জিত এক প্রকার বাড়ী তৈয়ার হইত এবং বাঙ্গালার বাহিরেও তাহার খ্যাতি ছিল। কিন্তু এই অর্থ সমীচীন নয়। কার্ণ সাহেব অর্থ করিয়াছেন, "সুবর্ণ ও টিন (বঙ্গ) দ্বারা প্রস্তুত বাড়ী"। এই অর্থ আরও কম গ্রহণযোগ্য। ব্যাখ্যার পাঠই অশুদ্ধ, উহার প্রকৃত পাঠ, "সুপণ্ণ বঙ্ক গেহ", গরুড় পক্ষীর বক্র ডানার ন্যায় গৃহ, অর্থাৎ যে গৃহের ছাদ একদিকে ঢালু।

বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বাসস্থান হিসাবে অদ্ধযোগ, পাসাদ ও হম্মিয়ের কথা বড় বেশী শুনা যায়না। গুহায় কতক কতক ভিক্ষু থাকিতেন বটে, কিন্তু বেশীর ভাগই থাকিতেন 'বিহারে'। কিন্তু 'বিহার' কি? 'বিহার' বলিতে পরবর্তীকালে বা অধুনা আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি, বৌদ্ধদের প্রাচীন পালি-সাহিত্যে তাহা বুঝাইত না। উহাতে 'বিহার' অর্থ,—এক এক জন ভিক্ষুর বাসের জন্য নির্দিষ্ট এক একটি স্বতন্ত্র কক্ষ। এই অর্থে 'বিহার' শব্দ 'বিনয় পিটকে'র অন্তর্গত মহাবগ্‌গে (যথা, ১,২৫,১৪) ও চুল্লবগ্‌গে (যথা, ২, ১, ২) এবং পালি-সাহিত্যের অন্যত্র স্থানে স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু পরে 'বিহার' বলিতে সাধারণতঃ বুঝাইত যেখানে কতকগুলি ভিক্ষু বাস করিতেন সেই সমগ্র নিকেতনটা বা মঠটা। অথচ দেখা যায়, শ্রাবস্তী নগরের অনতিদূরে যে জেতবনে বুদ্ধদেব পঞ্চবিংশতি বৎসর যাপন করিয়াছিলেন, সেই জেতবন সুদত্ত অনাথপিণ্ডদ-নামা বণিক বুদ্ধদেবের বাসার্থ, সমগ্র উদ্যানটি স্বর্ণমুদ্রায় আবৃত করিয়া সেই অগ্নিমূল্যে শ্রাবস্তীর কোনও রাজকুমারের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া, তন্মধ্যে একটি 'সপ্ততল বিহার' নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। অতএব প্রাচীন পালি-সাহিত্যের 'বিহার'-এর সহিত এই 'বিহার'-এর অর্থসঙ্গতি থাকিতেছেনা। তবে স্বয়ং বুদ্ধদেবের জন্য নির্মিত হইয়াছিল বলিয়াই, বোধ করি, অনাথপিণ্ডদের বিহার সপ্ততল হইয়াছিল, নচেৎ আদিতে সাধারণ ভিক্ষুর জন্য বিহার ঐ একটি স্বতন্ত্র কক্ষমাত্রই ছিল।

এইরূপ আর একটা শব্দ, 'পরিবেণ'। আদিতে ইহার অর্থ ছিল, কতকগুলি বিহারের অর্থাৎ কক্ষের সমষ্টি। পরে ইহার অর্থ দাঁড়াইয়াছিল প্রকোষ্ঠ। আবার 'পরিবেণ' অর্থে বিদ্যা-মন্দিরও দেখা যায়। যথা, সিংহলের কলম্বো নগরের 'বিদ্যোদয় পরিবেণ'। অথবা 'মিলিন্দ পঞ্‌হো' গ্রন্থে বর্ণিত 'সংখেয্য পরিবেণ'।

আর একটা শব্দও আছে, 'আরাম'। সাধারণতঃ যে উদ্যানে বা উপবনে বিহার নির্মিত হইত, সেই উদ্যান বা উপবনকেই 'আরাম' বলে। কিন্তু প্রাচীনকালে 'আরাম' ঐ উদ্যানসহ বিহারকেও বুঝাইত। মহারাজ অশোক পাটলিপুত্রের দক্ষিণ-পূর্বদিকে এক হাজার ভিক্ষুর বাসোপযোগী যে বিহার নির্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহার নাম 'অশোকারাম' বা 'কুক্কুটারাম'।

'চেতিয়' বা 'চৈত্য' অনেক ক্ষেত্রে বিহারের সংশ্লিষ্ট থাকিলেও[১] 'চেতিয়' ও 'বিহার' এক পদার্থ নয়। কিন্তু ভোজনগরের আনন্দ-চেতিয়, বৈশালীর সারন্দদ-চেতিয় ও বহুপুত্ত-চেতিয় প্রভৃতি কতগুলি প্রাচীন চেতিয় 'বিহার' ছিল বলিয়া শ্রীযুক্ত ডক্টর বিমলাচরণ লাহা মহাশয় মত প্রকাশ করিয়াছেন[২]।

ভিক্ষুদের বাসের নিমিত্ত কক্ষগুলি ব্যতীত বৌদ্ধ মঠের অত্যাবশ্যক

---

(১) *Buddhist Art in India*, Grunwedel and Burgess, 1910, p.21.

(২) *'Cetiya' in Buddhist Literature*: Sonderdruck Aus Studia Indo-Iranica. Ehrengabe Fur Wilhelm Geiger, 1931, pp. 42 ff. কিন্তু শ্রীযুক্ত ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়া মহাশয়ের ব্যাখ্যা অন্যবিধ, *Ind, Cult.*, I, Pt. I. pp.125-26. দ্রষ্টব্য।

অংশগুলির নাম 'জন্তাগার' (স্নানকক্ষ), 'উপস্থান-শালা' (সভাগৃহ, যেখানে প্রভাতে ও সায়াহ্নে ভিক্ষুগণ সমবেত হইয়া ধর্মপ্রসঙ্গ করিতেন), 'উপহার-শালা' (ভোজনাগার), 'অগ্নিশালা' (রান্নাঘর), 'কোষ্ঠক' (ভাণ্ডার-ঘর), 'বর্চ্চঃকুটি' (পায়খানা) ও দীর্ঘিকা ; এই সমস্তগুলির একত্র নাম 'সঙ্ঘারাম'। কিন্তু অন্ততঃ খৃষ্টীয় চতুর্থ শতক হইতে অনেক ক্ষেত্রে 'সঙ্ঘারাম' স্থলে 'বিহার' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। বুদ্ধদেব বারাণসীক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যে স্থানে অবস্থান করিয়া ধর্মচক্র-প্রবর্তন করেন, তাহার নাম 'মৃগদাব' (বর্তমান সারনাথ)। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে চীনা পরিব্রাজক হুয়েন সাং-এর এই স্থানের বর্ণনায় পাই, "এখানে একটি সঙ্ঘারাম আছে। তাহার প্রকাণ্ড অট্টালিকা আটটি বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত, কিন্তু সমগ্র চত্বরকে প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া বিভিন্ন খণ্ডগুলির সংযোগ সাধন করা হইয়াছে।…ঐ প্রাচীরের অভ্যন্তরে দুইশত ফিট উচ্চ বিহার বিদ্যমান আছে।" এই বর্ণনায় সঙ্ঘারাম ও বিহারের পার্থক্য স্পষ্ট বুঝা যায়। অথচ হুয়েন সাং-ই আবার কতগুলি সঙ্ঘারামকে বিহার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

বিহার বলিতে যখন একজন ভিক্ষুর বাসের জন্য স্বতন্ত্র একটি কক্ষ বুঝাইত, তখন এক জায়গায় কম-বেশী অনেকগুলি বিহার কাছাকাছি থাকিত। ঐগুলি পাথর, ইট বা কাঠ দিয়া নির্মিত হইত। বন হইতে কাঠ-খড়ি ও তৃণ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া ভিক্ষুদের নিজেদের পক্ষে এইরূপ একটি ছোট-খাটো বিহার তৈয়ার

করিয়া লওয়া বেশী আয়াসসাধ্য ছিল না; অনেক সময় করিতেনও তাহাই, আর গৃহিগণ ও গ্রামবাসিগণ ঐ নির্মাণ-কার্যে অনেক সময় যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। কিন্তু বলা বাহুল্য, বৃহদায়তন বিহারগুলি এইভাবে নির্মিত হইতে পারিত না। সেগুলি বৌদ্ধ-ধর্মানুরাগী নৃপতিবৃন্দ, ধনাঢ্য গৃহস্থ ও বণিকগণ নিজেরা অর্থব্যয় করিয়া, অথবা নাগরিকগণ চাঁদা তুলিয়া নির্মাণ করিয়া দিতেন।

এই সকল বিহার নগরের বা গ্রামের ভিতর নির্মিত হইত না, হইত নগর বা গ্রাম হইতে দূরে। বেশী দূরেও নয়, কারণ ভিক্ষুদের নিত্য নগরে বা গ্রামে গিয়া ভিক্ষা করিতে হইত, এবং সেই ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যে জীবিকা নির্বাহ করিতে হইত। কাজেই নগর বা গ্রাম হইতে বেশী দূরে বিহার অবস্থিত হইলে ভিক্ষুদের অসুবিধার সীমা থাকে না। বনে, জঙ্গলে বা পর্বতগুহায় যে সকল ভিক্ষু আশ্রয় গ্রহণ করিতেন, তাঁহারাও লোকালয় হইতে বড় বেশী দূরে থাকিতেন না, কারণ প্রত্যহ আসিয়া ভিক্ষা ত করিতে হইবে।

ভিক্ষুদের বাসের জন্য বিহার নির্ম্মাণ করাইয়া দেওয়া অতীব পুণ্যজনক বলিয়া বিবেচিত হইত। অশোক যেরূপ তাঁহার অনুশাসনে বলিয়াছেন, 'ধম্ম'-দানের মত দান আর নাই, চুল্লবগ্‌গে তেমনই আছে, বৌদ্ধ সঙ্ঘকে 'বিহার'-দানের মত দান আর নাই; অতএব যাঁহারা সমর্থ, তাঁহারা ইচ্ছানুযায়ী রমণীয় বিহার নির্মাণ করিয়া প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে প্রতিষ্ঠা করুন এবং তাঁহাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করুন, তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহাদের নিকট 'সত্যে'র বাণী

প্রচার করিতে সমর্থ হইবেন (৬,১,৫)। 'মিলিন্দ পঞ্‌হো' গ্রন্থেও (৬,৫৩) দেখা যায়, "সমস্ত বুদ্ধগণই বিহার দানের প্রশংসা, অনুমোদন, সমাদর ও গুণকীর্তন করিয়াছেন। যাঁহারা এরূপ দান করেন, তাঁহারা পুনর্জন্ম, বার্দ্ধক্য ও মৃত্যুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন।"

তক্ষশিলা খননের পর সার জন্ মার্শাল সাহেব মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বিহারগুলির অভ্যন্তর পলস্তারা দ্বারা লিপ্ত হইত, এবং তদ্ব্যতীত তথায় সম্ভবতঃ কোনও রূপ কারুকার্য্য (বা চিত্র) থাকিত না; কিন্তু বারান্দার প্রাচীর রঙ্গে রঞ্জিত হইত; আর যেখানে যেখানে কাঠের কাজ থাকিত, সেই সকল কাঠ কারু-কার্যে শোভিত এবং চিত্রাঙ্কিত হইত। পক্ষান্তরে হুয়েন সাং বলেন, বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের বাসগৃহের অভ্যন্তর কারুকার্যখচিত কিন্তু বহির্ভাগ অনলঙ্কৃত হইত। 'চুল্লবগ্‌গে' দেখা যায়, 'ছব্বগ্‌গিয়' নামা ভিক্ষু-গণ পুরুষ ও নারীর কল্পিত চিত্র বিহারের ভিত্তিগাত্রে অঙ্কিত করিতেন, এবং একথা বুদ্ধের শ্রুতিগোচর হইলে তিনি ঐরূপ চিত্র অঙ্কন করিতে নিষেধ করিয়া কেবল মাল্য, লতা প্রভৃতি সাধারণ বস্তুর চিত্র অঙ্কনের বিধান দিয়াছিলেন।

আদিতে যাহা একান্তভাবে ভিক্ষুগণের বাসোদ্দেশ্যে নির্মিত হইত, বৌদ্ধধর্মের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে কালক্রমে সেই বিহারগুলি বিদ্যায়তনে পরিণত হইয়া উঠিয়াছিল। পেশোয়ারের কণিষ্ক-বিহার, মগধের নালন্দা, বিক্রমশীল, উদ্দণ্ডপুর, বাঙ্গালার

সোমপুরী, জগদ্দল, সিংহলের দীপদত্তম প্রভৃতি বিহার (বা সঙ্ঘারাম)-গুলি বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া আর কিছুই নয়। 'মিলিন্দ-পঞ্‌হো' পাঠেই দেখা যায়, বিহারগুলি পরিবেণ বা বিদ্যা-নিকেতনে পরিণত হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রকার যখন অবস্থা, এবং যখন একই বিহারে (বা সঙ্ঘারামে) বহু শত বা বহু সহস্র ভিক্ষু অবস্থান করিতেন, তখন প্রাত্যহিক ভিক্ষালব্ধ সামগ্রীতে যে বিহারের ব্যয় সঙ্কুলান হইত না, ইহা বলাই বাহুল্য। কাজেই ঐ উদ্দেশ্যে বিহারের সংলগ্ন ভূমি ও উদ্যান থাকিত। ফা-হিয়েন বলেন, "এই দেশের রাজন্যবৃন্দ, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিসকল ও নাগরিকগণ বুদ্ধদেবের নির্বাণপ্রাপ্তির পর হইতে শ্রমণবর্গের জন্য বিহার নির্মাণ ও তাঁহাদের ভরণ-পোষণের জন্য ভূমি, গৃহ ও উদ্যান দান করিয়া আসিতেছেন। এক রাজার পর আর এক রাজা তজ্জন্য তাম্র-শাসন দান করিয়া থাকেন। এই কারণে কেহ সে সমুদয় বাজেয়াপ্ত করিতে সমর্থ হয় না।"

ই-ৎসিং-এর বর্ণনা আরও বিশদ,—"মহাবুদ্ধ ভিক্ষুগণকে কর্ষণ করিতে নিষেধ করায় তাঁহারা তাঁহাদের ভূমি বিনা করে অপরকে কর্ষণ করিতে অনুমতি প্রদান করেন এবং উৎপাদিত দ্রব্যের অংশ-বিশেষ মাত্র গ্রহণ করেন। এবম্প্রকারে তাহারা সদাচারে জীবনাতিপাত করেন এবং সাংসারিক চিন্তা হইতে বিরত থাকিয়া হলচালনা ও জলসেচনের দ্বারা প্রাণিহত্যার অপরাধ হইতে মুক্তি পাইয়া থাকেন।...সকল ভারতীয় বিহারেই ভিক্ষুর পরিচ্ছদের ব্যয়

সঙ্ঘের সাধারণ সম্পত্তি হইতে বহন করা হইয়া থাকে। উদ্যান ও ক্ষেত্রের উৎপাদিত শস্য এবং বৃক্ষ ও ফলজাত আয় পরিচ্ছদের ব্যয় নির্বাহার্থ প্রতি বৎসর বিতরিত হইয়া থাকে।...ভারতীয় বিহারগুলি বিশেষ নিষ্কর ভূমি ভোগ করে, এবং এই সকল ভূমির উৎপাদিত দ্রব্য দ্বারা শ্রমণগণের বস্ত্রের ব্যয় নির্বাহ করা হয়।...আহার গ্রহণ করিলেও কেহই নিন্দনীয় হইবেন না। যদি আহার্য ও পরিচ্ছদের চিন্তা না করিতে হয় তবে অধিকতর স্বচ্ছন্দচিত্তে ধ্যান ও পূজায় বিহারে সময়াতিপাত করিতে পারেন।" খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের প্রথম ভাগে সিরিয়া দেশের বারদি সানেস্ নামা পণ্ডিত সিরিয়ায় প্রেরিত ভারতবর্ষীয় কয়েকজন দূতের মুখে ভারত-তথ্য শুনিয়া যে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে বর্ণিত বৌদ্ধ শ্রমণদের বিবরণের সারাংশ এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে,—"যদি কেহ শ্রমণ-শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাকে গ্রাম্য বা নাগরিক কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থিত হইতে হয়। এই স্থানে তিনি সমস্ত সম্পত্তি পরিত্যাগ করেন। তাহার পর তিনি মস্তক মুণ্ডন ও শ্রমণ-কুল-সুলভ পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া শ্রমণগণের সহিত বাস করিতে প্রবৃত্ত হন। এই সময় হইতে তিনি পুত্র-কলত্রাদির সহিত সকল প্রকার সম্পর্ক পরিত্যাগ করেন এবং তাহাদের চিন্তা হইতে বিরত হন। দেশাধিপতি ঈদৃশ গৃহত্যাগী ব্যক্তির ভরণ-পোষণের ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন। পত্নীর সমস্ত ভার আত্মীয় স্বজনের উপর অর্পিত হয়। শ্রমণগণ নগরের বহির্ভাগে বাস করেন। ধর্মের আলোচনায়

তাঁহাদের অহোরাত্র অতিবাহিত হয়। তাঁহারা রাজব্যয়ে নির্মিত মঠে ও মন্দিরে বাস করেন। এই সকল মঠে কর্মচারিবর্গ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা আশ্রমের জন্ত আহার্যবস্তু সমুদয় রাজভাণ্ডার হইতে প্রাপ্ত হন। এই সকল আশ্রমে ঘণ্টাধ্বনি হইলে আগন্তুকগণ প্রস্থান করেন, এবং শ্রমণগণ উপস্থিত হইয়া ধ্যানে নিরত হন। তাঁহাদের ধ্যান পরিসমাপ্ত হইলে দ্বিতীয়বার ঘণ্টাধ্বনি হয়। তখন তাঁহারা আহারে উপবেশন করেন। এই সময়ে ভৃত্যগণ অন্ন পরিবেশন করে। যদি কোনও শ্রমণ একাধিক বস্তু আহার করিতে ইচ্ছা করেন তবে তাঁহাকে শাক-সব্জী অথবা ফল দেওয়া হয়। ভোজনক্রিয়া সমাপ্ত হইবামাত্র তাঁহারা পুনর্বার শাস্ত্রের আলোচনায় নিযুক্ত হন। শ্রমণগণের পক্ষে বিবাহ বা ধনার্জন নিষিদ্ধ"৩।

এই সকল শ্রমণগণ যে সকল বিহারে বা বিত্থাপীঠে বিত্থাভ্যাস করিতেন, তাঁহাদের শিক্ষাপদ্ধতি ছিল নানাবিধ বিত্থার উপযোগী, এবং একান্তভাবে মনোবৃত্তি বিকাশের সহায়ক। রাজনীতির দূষিত হাওয়া তখন শিক্ষামন্দিরের পবিত্রতাকে কলুষিত করিত না,—সে দিনের শিক্ষাপ্রণালী ছিল চরিত্র-গঠনের ও ধর্মনিষ্ঠ করার উদ্দেশ্যে ধর্মনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কোনও দেশেই, কোনও কালেই, সকল বিত্থার্থী সমান হয় না, সকলের জ্ঞানস্পৃহা সমান থাকে না। কেহ শত চেষ্টাতেও কিছুই প্রণিধান

(৩) এই সমগ্র অংশের জন্য 'ভারতবর্ষ', ১৩৪৪, পৌষ, পৃঃ ৫৫-৫৯ দ্রষ্টব্য। পরবর্তী অংশের জন্য *Ind. Cult.*, I, pp. 227-33 দ্রষ্টব্য।

করিতে পারে না, কেহ পারে কিন্তু তাহার অর্থবোধের উদয় পুনঃ পুনঃ ব্যাখ্যাসাপেক্ষ, আবার কেহ বা বুঝিয়া ফেলিতে পারে সামান্য মাত্র আভাসেই। জ্ঞান এবং পরিজ্ঞানেরও কতকগুলি স্তর আছে, কিন্তু তাহার শেষ স্তরে শিক্ষার্থীকে উন্নীত করিয়া দিতে পারিলেই আচার্যের দায়িত্ব শেষ হইয়া যায় না,—শিষ্যের চরিত্রগঠনও তাঁহারই কর্ত্তব্যের অঙ্গীভূত। তিনি পিতৃহৃদয় দিয়া—শিষ্যের দোষ ও অপপ্রবৃত্তি-সমূহ বিদূরিত করিয়া—তাহার চরিত্রের উৎকর্ষতার প্রতি যত্নবান হইবেন, এবং যে প্রবাহ দিয়াই শিষ্যের ভবিষ্য জীবনের গতি বহমান হোক্ না কেন, তাহা যেন সর্বতোভাবে জয়-দীপ্ত ও শুভান্বিত হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ করিবেন,—এই ছিল সেদিনের আদর্শ। হয়ত এই আদর্শ অবস্থা-বিপর্যয়ে সময়ে সময়ে ক্ষুণ্ণ হইত, কিন্তু সাধারণতঃ এই আদর্শ রক্ষার জন্য তাঁহারা অবহিত হইতেন, ইহাতে সংশয় নাই।

পাল-বংশপ্রতিষ্ঠার পূর্বেও বাঙ্গালাদেশে বৌদ্ধ শিক্ষার্থী ও উপাধ্যায়দিগের জন্য অনেকগুলি বিহার বা সঙ্ঘারাম ছিল, তাহার উল্লেখ পাওয়া যায় ফা-হিয়েন্, হুয়েন সাং, ই-ৎসিং প্রভৃতি বৈদেশিকদিগের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে ও বাঙ্গালায় আবিষ্কৃত একাধিক তাম্রশাসনে। পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে ফা-হিয়েন্ তাম্রলিপ্তিতে বাইশটি সঙ্ঘারামে বহু-সংখ্যক স্থবির ও আচার্য দর্শনে প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। ৫০৭ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ বৈন্যগুপ্তের গুনাইঘর-তাম্রশাসনে রুদ্রদত্তের 'আশ্রম-বিহার' ব্যতীত 'রাজ-বিহার' ও

'জিনসেন-নির্মিত বিহার'—এই বিহারদ্বয়েরও উল্লেখ দেখা যায়। 'রাজ-বিহার' যে হয় রুদ্রদেব স্বয়ং অথবা পূর্ব-বঙ্গের অন্য কোনও রাজা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। জিনসেন কে, তাহা অজ্ঞাত। হুয়েন সাং পুণ্ড্রবর্ধনে কুড়িটি, সমতটে ত্রিশটি, তাম্রলিপ্তিতে দশটি এবং কর্ণসুবর্ণে দশটি,—এই সর্বসমেত সত্তরটি সঙ্ঘারাম বাঙ্গালা দেশে দেখিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে বিদ্যানিকেতন হিসাবে দুইটি ছিল শ্রেষ্ঠ, একটি পুণ্ড্রবর্ধনে অপরটি কর্ণসুবর্ণে। প্রথমটি ছিল পুণ্ড্রবর্ধনের রাজধানীর ২০ লি (চার মাইল) দক্ষিণে, উহার নাম 'পো-চি-পো', বা 'বাশিভা'-সঙ্ঘারাম। ইহার প্রাঙ্গন বা চত্বরগুলি ছিল আলোকময় এবং সুবৃহৎ, আর মণ্ডপ ও চূড়াগুলি ছিল উচ্ছ্রিত। সাত শত মহাযান-যায়ী শ্রমণ, তন্মধ্যে প্রাচ্য-ভারতের বহু সংখ্যক খ্যাতনামা আচার্য, অবস্থান করিতেন এই সঙ্ঘারামে। বগুড়া জেলার মহাস্থানের চারি মাইল পশ্চিমে যে 'বিহার' বা ভাসু-'বিহারে'র ধ্বংশাবশেষ রহিয়াছে তাহাই হুয়েন সাং বর্ণিত 'পো-চি-পো'-বিহার বলিয়া কানিংহাম সাহেব স্থির করিয়াছিলেন, এবং উহাই যথার্থ বলিয়া মনে হয়। কর্ণসুবর্ণের সঙ্ঘারামের নাম ছিল 'রক্তবিটি' বা 'রক্তভিত্তি'। ইহারও দালানঘরগুলি ছিল প্রবাত ও প্রশস্ত, এবং তল-যুক্ত সৌধগুলি সমুন্নত। রাজ্যের সকল প্রখ্যাত ও স্থিতপ্রজ্ঞ বৌদ্ধাচার্যগণ এই সঙ্ঘারামে সমুপেত হইয়া, পরস্পর আলাপ-আলোচনার দ্বারা চরিত্রের উৎকর্ষতার চেষ্টায় রত থাকিতেন।

তাম্রলিপ্তিতে ই-ৎসিং 'ভারাহা' বা 'বরাহ' নামে যে সঙ্ঘারামটি দেখিয়াছিলেন, তাহার এক বিশদ ও মনোরম বিবরণও তিনি দিয়া গিয়াছেন। উহার অভ্যন্তরস্থ জীবন, উহার পরিচালনা, উহার নিয়মানুবর্তিতা, উহার বৈভব ও খ্যাতি, বিশেষতঃ উহার অন্তেবাসী ভিক্ষু ও ভিক্ষুনীদের সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রণের নিয়মাবলী,—এ সকল কথারই বিস্তৃত আলোচনা করিয়া তিনি তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই বিদ্যা-মন্দিরটির উল্লেখ আর কোথাও পাওয়া যায়না, আগেও নয়, পরেও নয়। দেবখড়্গের অস্রফ্‌পুর-তাম্রশাসনদ্বয়ে পূর্ব-বঙ্গের একটি বিহারের উল্লেখ পাওয়া যায়, এই বিহারটিকে বলিতে পারি শালিবর্দ্দ(র্দ্ধ)কস্থিত আচার্য-বন্দ্য সঙ্ঘমিত্রের বিহার, কিন্তু শালিবর্দ্ধক কুমিল্লার অদূরে কর্মান্তনগরে ছিল, অথবা অন্য কোথাও ছিল তাহা নির্ণীত হয় নাই। ইহার পরই উত্তর-বঙ্গের সোমপুরী-মহাবিহারের কথা বলিতে হয়। প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের উদ্যোগে রাজসাহী জেলার পাহাড়পুরের স্তূপ খননের ফলে যে ত্রিতলবিশিষ্ট মন্দিরটি আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহাই সোমপুরী-মহাবিহার সন্দেহ নাই। মন্দিরটি বর্তমানে যেরূপ রহিয়াছে, তাহাতে উহা উত্তর-দক্ষিণে ৩৬১ ফিট্ লম্বা এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৩১৮ ফিট্ চওড়া ছিল দেখা যায়। তিনটি ক্রম-হ্রস্বায়মান তলে মন্দিরটি সম্পূর্ণ, উত্তর দিকের প্রশস্ত সিঁড়ি দিয়া উপরের তলগুলিতে উঠা যায়। প্রথম ও দ্বিতীয় তল নিরেট, দ্বিতীয় তলের উপর মূল মন্দিরটি অবস্থিত ছিল।

চতুষ্ক মন্দিরটির প্রতি দিকে প্রায় ৪৫টি করিয়া সর্বশুদ্ধ ১৭৭টি প্রকোষ্ঠ আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং উহার প্রত্যেক কোণে এক একটি মণ্ডপ ছিল। পাহাড়পুর মন্দিরের নক্সা, উহার ক্রম-হ্রস্বায়মান তল এবং অপরাপর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখিয়া কৌতূহলী পণ্ডিতেরা অনুমান করিতেছেন যে, জাভার বরবুদুর, কাম্বোজের আঙ্কোরভাট, এবং ব্রহ্মের ক্রম-হ্রস্বায়মান প্যাগোডাগুলির স্থাপত্যপ্রথার সহিত পাহাড়পুরের মন্দিরের স্থাপত্যপ্রথার সাদৃশ্য আকস্মিক নহে, উহাদের মূল আদর্শ ছিল পূর্ব-ভারতেই।

মন্দিরটি প্রথমে একটি হিন্দু দেবালয় ছিল, পরে উহা ধর্মপালের সময়, অথবা তৎপূর্বেই, বৌদ্ধ বিহারে পরিণত হয়। খননের ফলে উহার মধ্যে যে মাটির 'সিল্' পাওয়া গিয়াছে তাহাতে স্পষ্টই সোমপুরী ধর্মপাল কর্তৃক নির্মিত ("শ্রীসোমপুরে শ্রীধর্মপালদেব-মহাবিহারে") বলিয়া লিখিত আছে। কিন্তু তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারনাথ (১৬০৮ খৃঃ) এবং 'পগ্ সাম্ জোন্ জ্যাঙ্গ'-এর রচয়িতা সুম্‌প খন্-পো-যেশে পল্ জোর (১৭৪৭ খৃঃ) উভয়েই বলেন, বিহারটি ধর্মপালের পুত্র দেবপালের নির্মাণ। এই দুই আপাত-বিরোধী তথ্যের সামঞ্জস্য বিধান কঠিন নয়। এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি একদিনে হয় নাই। ইহার উদ্‌গ্রন্থন কার্য আরম্ভ হইয়াছিল ধর্মপালের রাজত্বে, সমাপ্ত হইয়াছিল দেবপালের সময়। অথবা, দেবপালের যুগে উহা কতগুলি নূতন সংযোজনায় সমৃদ্ধ হইয়া পরবর্তী জনশ্রুতিতে নির্মায়িতা হিসাবে উহা দেবপালেরই নাম

বহন করিতেছিল। মগধের বিক্রমশীল-মহাবিহার যে ধর্মপালেরই কীর্তি, একথা কাম্পিল্যের কাহিনীর মধ্য দিয়া তারনাথও বলিয়াছেন। কবি অভিনন্দের 'রামচরিতে' দেখা যায় ধর্মপালের এক নামান্তরই ছিল 'বিক্রমশীলদেব'। কাশ্মীরীয় সর্বজ্ঞমিত্রের 'স্রগ্ধরা-স্তোত্রে'র জিনরক্ষিত-প্রণীত টীকার পুষ্পিকায় 'শ্রীমদ্বিক্রমশীলদেব-মহাবিহারীয়' উল্লেখ দ্বারা শ্রীমদ্বিক্রমশীলদেব (ধর্মপাল) নির্মিত মহাবিহার, এই অর্থই ধ্বনিত হইতেছে। দ্বিতীয় গোপালদেবের পঞ্চদশ রাজ্যাঙ্কে লিখিত একখানি 'অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা'র পুষ্পিকায়ও বিহারটিকে 'শ্রীমদ্বিক্রমশীলদেব-বিহার' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। অথচ মধ্যমক-দর্শন সংক্রান্ত 'রত্ন-করণ্ডোদঘাট' নামে অতীশ দীপঙ্করের এক গ্রন্থের পুষ্পিকা অনুসারে বিক্রমশীল-বিহার দেবপাল কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। ইহারও মূলে ঐ একই কারণ[৪]।

একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই বিক্রমশীল-মহাবিহার নালন্দার শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া পুঞ্জীভূত খ্যাতিকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল। আর উত্তর-বঙ্গের সোমপুরীকে স্বচ্ছন্দে বলা যায় 'বাঙ্গালার বিক্রমশীল'। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদেও ইহার নাম পর্যন্ত ধ্বংসস্তূপের তলে চাপা পড়িয়া অহর্নিশি গোঙাইতেছিল। তারপরেই বা উহার কতটুকু ইতিহাস উদ্ধার হইয়াছে? সারস্বত-কুঞ্জের কত প্রথিতযশা ও নিষ্ণাত কোবিদের পদরেণুতে বাঙ্গালার এই প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ ধন্য হইয়াছিল, তাঁহাদের অধ্যয়ন-

(৪) ভারতবর্ষ, ১৩৪১, জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ৯৬৭-৬৮

অধ্যাপনার কলস্বরে প্রতিনিয়ত ইহার কক্ষগুলি কেমন মুখর হইয়া উঠিত, কে বলিতে পারে? কত সমৃদ্ধি, কত গৌরব ও খ্যাতির ভার ইহার ছিল, তাহা আজিকার দিনে আন্দাজও করা যায় না। জ্ঞানের কত আলো, ধর্মের কত উৎসব পাণ্ডিত্যের কত সমারোহের স্রোত দিনে দিনে ইহার মধ্যে বহিয়া গিয়াছে, তাহার ক্ষীণ স্মৃতিটুকুও এখন আর নাই। শুধু জানি, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান করিতেন 'আচার্য' ও 'মহাপণ্ডিত' উপাধিধারী বোধিভদ্র, যাঁহার একখানি গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় আনুমানিক ১০০০ খৃষ্টাব্দে অনূদিত করিয়াছিলেন অতুল্য-পাদ বা অদ্বয়বজ্র। বোধিভদ্র আরও দুই নামে খ্যাত ছিলেন, ভিক্ষু-আরণ্যক এবং কালম্বলপাদ, এবং এই শেষোক্ত আখ্যা দেখিয়া মনে হয় তিনি সোমপুরীর কালপাদ বা কালমহাপাদ বলিয়া উল্লিখিত পণ্ডিতের সহিত অভিন্ন। বোধিভদ্রের আরও কতকগুলি পুস্তক তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। আর জানি, বাঙ্গালার বিদ্বজ্জনসমাজের মুকুটমণি অতীশ দীপঙ্কর কিছুকাল এই মহাবিহারে অবস্থান করিয়া ঐ সময়ের মধ্যে ভাববিবেকের 'মধ্যমক-রত্নপ্রদীপ' নামক গ্রন্থখানি অপর কয়েকজনের সাহচর্যে তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। আরও জানা যায়, সমতট-বাসী ও সোমপুরের অন্তেবাসী মহাযান-যায়ী ও বিনয়ে পারদর্শী বীর্যেন্দ্র নামক এক স্থবিরবৃদ্ধ তাঁহার আচার্য, উপাধ্যায়, মাতা-পিতা ও সমগ্র জীবজগতের পুণ্য অভিবৃদ্ধির কামনায় খৃষ্টীয় দশম শতকে বোধগয়ায় এক মনুষ্যাকার, স্থানক, বুদ্ধপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা

করিয়াছিলেন। পাহাড়পুরের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে একটি শিলাখণ্ড আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর অক্ষরে উৎকীর্ণ লেখ হইতে জানা যায়, স্তম্ভটি সমস্ত জীবের কল্যাণার্থ শ্রীদশবলগর্ভ নামক জনৈক ব্যক্তি স্থাপনা করিয়াছিলেন। তর্কবিদ্ কনকশ্রী-রচিত 'বিপুল-বিমল-কীর্তি, সজ্জন-আনন্দকন্দ' বিপুলশ্রীমিত্র নামা যতির খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী বা দ্বাদশ শতকের প্রথমার্ধে উৎকীর্ণ নালন্দায় প্রাপ্ত প্রশস্তিতে পাই যে, সোমপুরে বিপুলশ্রীমিত্রের পরমগুরুর গুরু করুণাশ্রীমিত্র নামক যতি অবস্থান করিতেন, কিন্তু বঙ্গাল-সৈন্য আসিয়া সোমপুরে অগ্নিসংযোগ করায় সেই জলন্ত আলয়ে অগ্নিদগ্ধ হইয়া তিনি প্রাণত্যাগ করেন। জগতের 'অষ্টমহাভয়' উন্মূলিত করিবার বাসনায় বিপুলশ্রীমিত্র সোমপুরে শাল ও হ্রদ দ্বারা অলঙ্কৃত এক তারা-মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন, এবং অগ্নিদাহে নষ্ট মহাবিহারের প্রকোষ্ঠগুলির সুচারু সংস্কার করাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত, তিনি সোমপুরীর বুদ্ধমূর্তিকে 'বিচিত্র-হেম-আভরণ' প্রদান করিয়াছিলেন, এবং এইরূপ পুণ্যক্রিয়া দ্বারা তিনি দীর্ঘকাল সেই সোমপুরীতে বশী বা সন্ন্যাসীর মত বাস করিয়াছিলেন। তাহা হইলে, অন্ততঃ একাদশ বা দ্বাদশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত সোমপুরী বাঁচিয়া ছিল। পাহাড়পুরের ২৮ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে দীপগঞ্জে 'হলুদ-বিহার' নামক একটি স্তূপ আছে। সম্ভবতঃ ইহা অষ্টম-নবম শতাব্দীতে একটি বৌদ্ধ-বিহার ছিল।

বাঙ্গালায় ছিল আর একটি বিহার, বিক্রমপুরী-বিহার। নাম-সাদৃশ্য হেতু অনুমান হয়, ইহা ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে কোথাও অবস্থিত ছিল। বাঙ্গালা দেশের জ্ঞাত রাজাদিগের মধ্যে 'বিক্রম' দিয়া নাম একমাত্র এই বিক্রমশীল-ধর্মপালেরই ছিল, আর পূর্ব-বঙ্গও খুব সম্ভবতঃ ধর্মপালের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল, কাজেই এই অনুমান অসঙ্গত নয় যে, বিক্রমশীল রাজার নাম হইতেই বিক্রমপুরী বিহার ও বিক্রম-পুর স্থান, এই উভয়েরই নামকরণ করা হইয়াছে[৫]। দ্রষ্টব্য, 'বিক্রমপুরী' নামের মধ্যে বিক্রমশীলের 'বিক্রম' ও সোমপুরীর 'পুরী' রহিয়াছে। এই অনুমান সত্য না-ও হইতে পারে, হয়ত বা বিক্রমপুরী-বিহার ধর্মপালের আগেও বিদ্যমান ছিল, কিন্তু সত্য হইলে বুঝিতে হইবে, ধর্মপাল তাঁহার সধর্মিগণের জ্ঞান ও ধর্ম সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে মগধের ও উত্তর-বঙ্গের ন্যায় পূর্ব-বঙ্গেও একটি মহাবিহার স্থাপন করিয়াছিলেন। বিক্রমপুরী-বিহারে 'অবধূত-আচার্য' উপাধিধারী কুমার-চন্দ্র একখানি তান্ত্রিক টীকা রচনা করিয়াছিলেন, এবং ইন্দ্রভূতির কন্যা লক্ষীঙ্করার শিষ্য লীলাবজ্র এবং লোচাব পুণ্যধ্বজ ঐ টীকা তিব্বতীয়ে অনুবাদ করিয়াছিলেন।

ধর্মপালের সময় বাঙ্গালা দেশে আরও একটি বিহার ছিল, যেখানে তাঁহার সমসাময়িক আচার্য হরিভদ্র 'অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞা-পারমিতা'র উপর তাঁহার বিখ্যাত টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

---

(৫) ভারতবর্ষ, ১৩৪১, জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ৯৬৭-৬৮

এই বিহারটির নাম ত্রৈকূটক-বিহার। এই বিহার বাঙ্গালার কোন্‌খানে অবস্থিত ছিল জানা যায় না।

বাঙ্গালী প্রজ্ঞাবর্মণ ও তাঁহার গুরু বোধিবর্মণ 'কাপট্যনিবাসী' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, এবং তাঁহাদের দুই-চারিখানা গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। এই 'কাপট্য' হয় একটি বিহারের নাম, না হয় এমন এক স্থানের নাম যেখানে একটি বিহার ছিল।

উত্তর-বঙ্গে দেবীকোট নামে যে বিহারটি ছিল তাহা বোধ হয় বৃহদায়তনই ছিল। অদ্বয়বজ্র (নামান্তর অতুল্যবজ্র), উধিলিপা, মেখলা নাম্নী ভিক্ষুণী প্রভৃতির নাম এই বিহারের সহিত সংযুক্ত।

চট্টগ্রাম অঞ্চলের কোথাও যে 'পণ্ডিত-বিহার' ছিল, সেটিও খুব বিখ্যাত ও বিরাট বিহার ছিল। স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র দাস মহাশয় বহু অনুসন্ধান করিয়াও এই বিহারটির স্থান নির্ণয় করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, বৌদ্ধ তন্ত্র ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির একটি প্রধান পীঠভূমি ছিল এই পণ্ডিত-বিহার। নাড়পাদের গুরু প্রসিদ্ধ তন্ত্রাচার্য তৈলপাদ এই বিহারেই থাকিতেন। নাড়পাদ ছিলেন কাশ্মীরীয়, এবং তাঁহার নামান্তর ছিল যশোভদ্র বা যশভদ্র। বিনয়শ্রীমিত্র এবং অপর কয়েকজন কাশ্মীরীয় ভিক্ষু থাকিতেন পট্টিকেরকের বা পাটিকারার কনকস্তূপ-বিহারে, এবং তাঁহাদেরই অনুরোধে নাড়পাদ তাঁহার 'বজ্রপদ-সারসংগ্রহ' বলিয়া বজ্রযানীয় পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন, এই কনকস্তূপ-বিহারটি কাশ্মীরে ছিলনা, ছিল কুমিল্লা জেলার পট্টিকেরকে। পট্টিকেরকের

অবস্থান লইয়া অনেক জল্পনা-কল্পনা হইয়া গিয়াছে। পূর্ব-বঙ্গের লোক-গীতিকায় গোপীচাঁদ (গোবিন্দচন্দ্র) রাজার যে সকল অদ্ভুত কাহিনী প্রচলিত আছে তন্মধ্যে পাটিকারা সহরের উল্লেখও আছে, এবং এই পাটিকারা 'বিক্রমপুরে', অথবা 'চট্টগ্রামের সন্নিকটে', অথবা 'মণিপুরের দক্ষিণে', অথবা 'আরাকানে' ছিল বলিয়া যে সকল ভ্রান্ত মত ছিল তাহার নিরসন হইয়াছে। বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কুমিল্লা সহরের ছয় মাইল পশ্চিমে ময়নামতী নামক স্থানে মিত্র-পক্ষীয় সেনাবাহিনীর পরিখা ইত্যাদি খননের ফলে যে সকল ইষ্টকনির্মিত সৌধাদির ধ্বংশাবশেষ ও মূর্তি-সমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছে[৬], তাহা সকলেরই বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে, এবং ভবিষ্যতে বিজ্ঞানসম্মত খননের ব্যবস্থা হইলে আশা করা যায় ঐ স্থানের আবিষ্কারসমূহ ময়নামতী ও তৎসংলগ্ন পাটিকারা পরগণার তথা পূর্ব-বঙ্গের, ইতিহাসের উপর পর্যাপ্ত আলোক সম্পাত করিবে। বলা বাহুল্য, এই পাটিকারা বা পাটিকেরাই প্রাচীন পট্টিকেরক, যাহা রাজ্যেরও নাম, রাজধানীরও নাম। ময়নামতীতে 'আনন্দরাজার প্রাসাদ' নামে খ্যাত যে স্তূপটি রহিয়াছে তাহার উদ্বাস্তুর মধ্যে ৬৩টি লালুক রৌপ্যমুদ্রাও আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং ঐ সকল মুদ্রায় 'পট্টিকেরয়' নাম মুদ্রিত আছে। অনুমিত হইয়াছে যে, ময়নামতীর এই 'আনন্দরাজার প্রাসাদে'র স্তূপটি একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল, এবং সম্ভবতঃ ইহাই ছিল পাল-যুগীয় প্রসিদ্ধ পট্টিকেরক-মহাবিহার।

(৬) *B. C. Law Volume*, II, pp. 213 ff.

১২২০ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ পট্টিকেরক-রাজ হরিকালদেব রণবঙ্কমল্লের ময়নামতী-তাম্রশাসনে দুর্গোত্তারার নামে উৎসর্গীকৃত একটি বিহারের উল্লেখ আছে। এই বিহারটি ছিল পট্টিকেরক-নগরীতে এবং বেজখণ্ড নামক গ্রামের সন্নিকটে[৭]। কিন্তু এই বিহারটি কনকস্তূপ-বিহারের সহিত অভিন্ন কিনা, তাহা নিরূপণ করা দুরূহ। এ স্থানে একটা কথা উল্লেখযোগ্য, পূর্ব-বঙ্গের চন্দ্র-বংশীয় নৃপতিগণের রাজত্বকালে এই পট্টিকেরক-রাজ্যের সহিত ব্রহ্ম ও আরাকানের রাজাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। আরও এক কথা, 'ময়নামতীর গানে' একস্থানে 'কামলাক নগর' (কমলাঙ্ক বা কুমিল্লা), 'কণিকানগর' ও 'মেহারকুল সহর' একত্র উল্লেখ আছে[৮]। এই কণিকানগরেই কি কনকস্তূপ ছিল?

কিন্তু বাঙ্গালার বিহারগুলির মধ্যে সোমপুরীর পরেই যে বিহারটির নাম সমধিক খ্যাত, সেটি হইতেছে একাদশ শতাব্দীর শেষে অথবা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রামপালের নির্মিত জগদ্দল-মহা-বিহার। গঙ্গা ও করতোয়া সঙ্গমে রামপাল নিজের নামানুসারে

Varendra Research Society's Monograph, No. 5, 1934, pp. 14-15.

(৮) "বাপের মিরাশ রাখি যাইনু গৌরর সহর
দাদার মিরাশ যাবেক কামলাক নগর।
তুন্মি মাএর যত বাড়ী কণিকানগর
আমি বাড়ী রাখিয়াছি মেহারকুল সহর॥"

রামাবতী নামক যে নূতন রাজধানী নির্মাণ করিয়াছিলেন, জগদ্দল-মহাবিহারটি ছিল তাহারই একাংশে, এবং তন্মধ্যে স্থাপিত হইয়াছিল অবলোকিতেশ্বর ও মহত্তারার বিগ্রহ। জগদ্দলের পরমায়ু স্বল্প হইলেও প্রারম্ভ হইতেই ইহার নাম বহুল যশে বিরাজিত। নানা-দিক হইতে সমাগত লোক-বাধে ইহা তৎকালীন বাঙ্গালার বৌদ্ধ সংস্কৃতির এক শ্রেষ্ঠ পীঠ হইয়া উঠিল,—শুধু ভারতীয় পণ্ডিতগণ নহেন, তিব্বতীয় লোচারগণও দলে দলে আসিয়া জগদ্দলে ভীড় করিতেন। রাজপুত্র-বিভূতিচন্দ্র ও দানশীল জগদ্দলের এই দুই শ্রেষ্ঠ কীর্তিমান ব্যতীত মোক্ষাকরগুপ্ত, শুভাকরগুপ্ত, ধর্মাকর প্রভৃতি অন্যান্য মনীষীর নামও এই বিহারের সহিত সংশ্লিষ্ট। রামাবতীর জগদ্দল-নিবাসী দানশীল কখনই ধর্মপালের সমসাময়িক দানশীল হইতে পারেন না, কিন্তু এই দুই দানশীলের ভিন্নতা উপলব্ধি না হওয়ায় কাহারও কাহারও মনে হইয়াছিল, জগদ্দল রামপালের পূর্বেও ছিল। 'পগ্ সাম্ জোন্ জ্যঙ্গ'-এ দেখিতে পাই, রামপালের মহিষী 'এতপুরী' নামক স্থানে 'এতপুরী'-দেবালয় স্থাপিত করিয়াছিলেন[৯]। 'এতপুরী' কোথায়, রামাবতীর কত দূরে বা কাছে, তাহা অজ্ঞাত।

এতদ্ব্যতীত বাঙ্গালার আরও কয়েকটি বিহারের উল্লেখ ও বিবরণ পাওয়া যায়। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের নিকট সুবর্ণ-বিহার-

(৯) Index, p. cxli.

স্তূপ [১০] এবং বগুড়ার সন্নিহিত শীলবর্ষে একটি বৌদ্ধ বিহারের বিবরণ [১১] প্রকাশিত হইয়াছে। স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, রালাণ্ডা-পরগণায় একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল,[১২] বালাণ্ডার একখানি 'অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা' এখনও নেপাল দরবার-লাইব্রেরীতে আছে। কিন্তু 'বালাণ্ডা' পরগণাটি আবার কোন্ স্থানে?

---

(১০) সা-প-প, ১৩২১ পৃঃ ২০৫-২০৮

(১১) সা-প-প, ১৩১৪, পৃঃ ২৬৯

(১২) সা-প-প, ১৩২১, পৃঃ ২৭২

পাল-পর যুগ

পাল-যুগের অবসানের পূর্ব হইতেই বাঙ্গালা দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ক্ষীয়মাণ হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। এবং এই কথাটা সর্বাপেক্ষা উপলব্ধি করা যায় মূর্তি-তত্ত্বের অনুশীলন দ্বারা। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই বৌদ্ধ মূর্তির সংখ্যা হ্রস্বয়মান দেখা যায়। ঐ সময় হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত যে পরিমাণ ব্রহ্মণ্য দেব-দেবীর, বিশেষতঃ বিষ্ণুর, মূর্তি বাঙ্গালা দেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই তুলনায় পশ্চিম-ও উত্তর-বঙ্গে বৌদ্ধ দেব-দেবীর সংখ্যা নগণ্য, পূর্ব-বঙ্গের সংখ্যাও যথেষ্ট কম। এই অবনতির কারণ, নয়পালের পর এক রামপাল ব্যতীত কোনও পরাক্রান্ত বা উৎসাহী নরপতিরও আবির্ভাব হয় নাই, অভয়াকরগুপ্ত প্রভৃতি দুই-তিন জন ব্যতীত মহাসত্ত্ব কোনও ধর্মাচার্যের বা উত্তরসাধকেরও সন্ধান মিলেনা, এবং সর্বোপরি হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে যে সম্প্রীতির বন্ধন ছিল তাহাও শিথিল হইয়া গিয়াছে। চন্দ্র-বংশের পর এবং সেনবংশের অধিকারের পূর্বে পূর্ব-বঙ্গে যে বৈষ্ণব বর্ম-বংশ রাজত্ব করিতেছিল, সেই বংশীয় মহা-রাজাধিরাজ ভোজবর্মার বেলাব-লিপিতে পঞ্চম শ্লোকের "পুংসামা-বরণং ত্রয়ী ন চ তয়া হীনা ন নগ্না ইতি" ইত্যাদি বাক্যে ত্রয়ী বা বেদবিদ্যাই পুরুষের প্রকৃত পরিধেয় বা আবরণ এবং তাহার

অভাবে 'নগ্ন' [১] বলিয়া বেদ-বাহ্য বৌদ্ধদের প্রতি যে শ্লেষাত্মক কটাক্ষ রহিয়াছে, তাহা এই প্রসঙ্গে উপেক্ষনীয় নয়। পরবর্তী রাজা হরিবর্মার প্রখ্যাত সচিব ভবদেব-ভট্টকে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ প্রশস্তিতে (২০ শ্লোক) "বৌদ্ধাম্ভোনিধি-কুম্ভ-সম্ভব-মুনিঃ" বা বৌদ্ধ-সমুদ্রের অগস্ত্য বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ঐ একই শ্লোকে আবার তাঁহাকে "পাষণ্ডি-বৈতণ্ডিক-প্রজ্ঞা-খণ্ডন-পণ্ডিতঃ"ও বলা হইয়াছে। অবশ্য এই সকল উল্লেখ দ্বারা ভট্ট-ভবদেব বৌদ্ধ-মত খণ্ডনে পণ্ডিত বা সুদক্ষ ছিলেন ইহাই উপপন্ন হয়, বৌদ্ধদের প্রতি কোনও অত্যাচার সূচিত হয়না, কিন্তু তত্রাচ জনমতের উপর এবম্বিধ উক্তি যে পর্যাপ্ত প্রভাব বিস্তার করিত তাহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। বৌদ্ধদের 'পাষণ্ড' নামে সম্বোধনের রীতটি যখনই উদ্ভব হোক্ না কেন, এই সময় হইতে বাঙ্গালা দেশে এই সংজ্ঞাটি উত্তরোত্তর জনপ্রিয় হইতে লাগিল। কিন্তু ভবদেব-ভট্ট বৌদ্ধ-বিরোধী হইলেও হরিবর্মার রাজত্বকালেই লিখিত অন্ততঃ দুইখানি বৌদ্ধ পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে[২]।

দাক্ষিণাত্যে তেলেগুদেশে কলচুর্য-বংশীয় বিজ্জলের প্রধান মন্ত্রিত্ব লাভ করিয়া শৈব-গুরু বাসব জৈনদের প্রতি যেরূপ অত্যাচার

---

(১) এই প্রসঙ্গে *Elements of Hindu Iconography,* Gopinath Rao, Vol. I, Part I, p. 217 দ্রষ্টব্য।

(২) বাঙ্গালার ইতিহাস, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম সং, পৃঃ ২৭৫

করিয়াছিলেন,[৩] অথবা কোনও কোনও চোল এবং পাণ্ড্য নরপতি, বিশেষতঃ পাণ্ড্যরাজ সুন্দর, জৈনদের যেরূপ নিপীড়ণ করিয়াছিলেন, বাঙ্গালাদেশে বৌদ্ধদের উপর শৈব, শক্তি অথবা বৈষ্ণব কোনও রাজারই সেইরূপ, অথবা কোনও রূপ, অত্যাচার বা নিগ্রহের কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। কিন্তু অন্তরে-অন্তরে বৌদ্ধ-বিদ্বেষ বাঙ্গালার সেন-ভূপতিগণের মধ্যে যে অন্ততঃ বল্লালসেনের যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল তাহার অকাট্য প্রমাণ রহিয়াছে। তাঁহার, বা তাঁহার নামে প্রচারিত, 'দানসাগরে'র শেষে নিবদ্ধ একটি শ্লোকে দেখিতে পাই যে, কলিযুগে বল্লালসেন-নামা প্রত্যক্ষ-নারায়ণের আবির্ভাবই হইয়াছিল ধর্মের অভ্যুদয়ের জন্য, তথা নাস্তিক (বৌদ্ধ)-দিগের পদোচ্ছেদের কারণে,—

"ধর্মস্যাভ্যুদয়ায় নাস্তিকপদোচ্ছেদায় জাতঃ কলৌ।
শ্রীকান্তোঽপি সরস্বতীপরিবৃতঃ প্রত্যক্ষনারায়ণঃ ॥"

বৌদ্ধদের প্রতি বল্লালের এতই জাতক্রোধ ছিল যে, 'দানসাগরে'র উপক্রমণিকায় তিনি বলিতেছেন যে, 'পাষণ্ড' কর্তৃক প্রক্ষিপ্ত-দোষে দুষ্ট হইয়াছে বলিয়া 'বিষ্ণু'-ও 'শিব'-পুরাণ 'দানসাগরে' উপেক্ষিত হইয়াছে। অন্য একটি শ্লোকে (২৯) তিনি পুনশ্চ বলিতেছেন, "পাষণ্ড-শাস্ত্রানুমতং নিরূপ্য দেবীপুরাণং ন নিবদ্ধমত্র", অর্থাৎ 'দেবী-পুরাণ'ও ঐ একই কারণে 'দানসাগরে' নিবদ্ধ হয় নাই। সমগ্র রাজ্যের রাজ-চক্রবর্তী হইয়াও বল্লালসেন তাঁহার একাতপত্রের

(৩) *Journal of the Andhra Historical Research Society*, VI, p. 29.

ছায়ায় সমস্ত প্রজালোকের ধর্মমতের গোপ্তা-রূপে নিজের পরিচয় দিতে পারেন নাই, পরধর্মের প্রতি বিদ্বেষে ও অসহিষ্ণুতায় তিনি শুধু নিজের রাজ-সিংহাসনকেই অপমান করেন নাই, বাঙ্গালার অন্তরাত্মাকেও যেন বহুধা বিভক্ত করিয়াছিলেন।

বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেনের তর্পণদীঘি-তাম্রশাসন দ্বারা প্রদত্ত ভূমির পূর্ব-দিকের সীমা ছিল "বুদ্ধবিহারী-দেবতা-নিকর-দেয়াম্মণ ভূম্যাটাবাপ পূর্বালী"। কিন্তু প্রদত্ত ভূমির পূর্ব-সীমায় একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল বলিয়াই লক্ষ্মণসেনের বৌদ্ধবিদ্বেষ, অথবা ভূমিগ্রহীতা কর্তৃক ক্রমশঃ ক্রমশঃ ঐ বিহারের ভূমি আত্মসাতের আশঙ্কা, কোনও বিকল্পই সিদ্ধ হয়না। ধর্মপাল যখন খালিমপুর-তাম্রশাসন দ্বারা এক 'কাদম্বরী দেবকুলিকা'র বা সরস্বতী মন্দিরের দক্ষিণে ক্রৌঞ্চশ্বভ্র গ্রাম দান করিয়াছিলেন, তখন তিনি হিন্দু বিদ্বেষবশতঃ, বা ঐ কাদম্বরী-মন্দিরের ভূমি ক্রমশঃ অধিকারচ্যুত হইয়া যাক্, ইহা মনে করিয়া ভূমিদান করেন নাই। বস্তুতঃ, লক্ষ্মণসেনের মত পুরুষের ধর্মবিষয়ে সঙ্কীর্ণতা ছিল বলিয়া মনে হয় না। তাঁহারই আদেশে নাকি বৌদ্ধ পুরুষোত্তমদেব 'পাণিনি-ব্যাকরণে'র প্রয়োগাংশ বাদ দিয়া 'লঘুবৃত্তি' রচনা করেন। তাঁহারই সভাকবি জয়দেব 'গীতগোবিন্দে'র দশাবতার-স্তোত্রে,

"নিন্দসি যজ্ঞ বিধেরহহ শ্রুতিজাতম্
সদয়-হৃদয়-দর্শিত পশুঘাতম্
কেশবধৃত বুদ্ধশরীর
জয় জগদীশ হরে"

বলিয়া বুদ্ধকে স্মরণ করিলেন। অঞ্জনার পুত্র বুদ্ধ কীকট দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া অসুরগণকে ছলনা-পূর্বক বা মোহাবিষ্ট করিয়া বেদমার্গ হইতে ভ্রষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে প্রকটিত হইয়াছিলেন, — অগ্নি, মৎস্য, বিষ্ণু, ভাগবত প্রভৃতি পুরাণগুলি প্রোক্ত এই মতবাদের দিন বহুকাল অতীত হইয়া গিয়াছে। জয়দেবের আগে কি পরে রচিত জানিনা, 'পদ্মপুরাণা'ন্তর্গত 'ক্রিয়াযোগসারে' দশাবতার-স্তুতিতে বুদ্ধাবতারের প্রসঙ্গে পাই,—

"বেদাবিনিন্দিতা যেন বিলোক্য পশুঘাতনম্।
সকৃপেণ ত্বয়া যেন তস্মৈ বুদ্ধায়তে নমঃ ॥"[৪]

—তুমি পশুহত্যা অবলোকন করিয়া সদয় হইয়া বুদ্ধ-শরীর পরিগ্রহ পূর্বক বেদসকলকে বিনিন্দিত করিয়াছ, তোমাকে নমস্কার।

'ক্রিয়াযোগসারে'রই অন্যত্র দশাবতারের উল্লেখে বুদ্ধের কথা আছে,—

"নমোঽস্তুতে চাধ্বর নিন্দকায়"[৫]

—(তুমি বুদ্ধরূপে) যজ্ঞনিন্দা করিয়াছ, তোমাকে নমস্কার। জয়দেবের ও 'ক্রিয়াযোগসারে'র দশাবতার-স্তোত্রের ভাব ও ভাষার বিস্ময়কর সাদৃশ্য সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত। বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার কল্পনা করায় বৌদ্ধদের দিক হইতে বুদ্ধের মর্যাদার প্রভূত হানি হইলেও, ইহার মূলে ছিল উদারমতাবলম্বী ব্রাহ্মণ

(৪) বহরমপুর সং, ৫, ৪১৬, পৃঃ ১৯০
(৫) ঐ ৪,৬৩, পৃঃ ৭৮

এবং অন্যান্য উচ্চ-বর্ণ হিন্দুর একটা মহৎ উদ্দেশ্য,—শ্রমণ ও ব্রাহ্মণের মধ্যে দ্বন্দের সঙ্কোচ-সাধন। কিন্তু যে দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া পুরাণকারগণ বুদ্ধকে তাঁহাদের ধর্মে স্থান দিলেন, তাহা শুধু প্রতিফলিত করিল নিষ্ঠাবান বা গোঁড়া ব্রাহ্মণ-সমাজের সঙ্কীর্ণ চিত্তকে। কিন্তু কালক্রমে সেই দৃষ্টিভঙ্গীরও যে কত পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল, তাহার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি রহিয়াছে বলিয়াই 'গীতগোবিন্দে'র ও 'ক্রিয়াযোগসারে'র উদ্ধৃত শ্লোকগুলি মূল্যবান। জয়দেবের চোখে যেমন বুদ্ধের করুণাই তাঁহার অনুত্তম গুণ বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল, একাদশ শতকে কাশ্মীরীয় ক্ষেমেন্দ্রের দৃষ্টিতে বুদ্ধের কামসুখকে তৃণের ন্যায় তুচ্ছজ্ঞান করার বিশেষত্বই সমধিক মর্যাদা লাভ করিয়াছিল। তাঁহার 'অবদান-কল্পলতা'র 'মহাকাশ্যপাবদান' নামক ত্রিষষ্টি-সংখ্যক পল্লবের প্রারম্ভে ক্ষেমেন্দ্র বলিয়াছেন,—

"শক্র বায়ুবরুণাদয়ঃ সুরাঃ
বিক্রিয়াং মুনিবরাশ্চ যৎকৃতে।
যান্তি তৎ স্মরসুখং তৃণায়তে
যস্য কস্য ন স বিস্ময়াস্পদম্॥"

—ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবগণ ও মুনিসত্তমগণ যে কামসুখের নিমিত্ত বিকৃতচিত্ত হইয়া পড়েন, সেই কামসুখকে (মারধর্ষণের দ্বারা) যিনি তৃণের ন্যায় তুচ্ছ করিতে পারেন, তিনি কাহার বিস্ময়ের পাত্র নহেন?

ইহার অনেক পূর্বেই, অষ্টম শতাব্দীতে, ব্রাহ্মণ-কবি মাঘ তাঁহার 'শিশুপালবধ' কাব্যে মারের সকল প্রলোভন সত্ত্বেও বোধিসত্ত্বের অবিকৃত-চিত্ততার কথা দ্বারা, এবং হরির সহিত বোধিসত্ত্বের তুলনা করিয়া (অথবা হরিতে বুদ্ধত্বের আরোপ করিয়া), বুদ্ধের প্রতি অকপট শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন,—

"ইতি তত্তদা বিকৃতরূপমভজত্তদভিন্ন চেতসম্ ।
মারবলমিব ভয়ঙ্করতাং হরিবোধিসত্ত্বমাভিরাজমণ্ডলম্ ॥"

—মার-সৈন্যগণ যেরূপ অবিকৃতচিত্ত বোধিসত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়া ভীষণাকার ধারণ করিয়াছিল, সেইরূপ এই রাজন্যবর্গও অবিকৃতচিত্ত হরি-রূপ বোধিসত্ত্বকে দেখিয়া ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়াছিল।

দ্বাদশ শতাব্দীতে 'নৈষধ-চরিত'-রচয়িতা (গৌড়কবি) শ্রীহর্ষও জিতেন্দ্রিয় বুদ্ধ,—যিনি মারকে জয় করিয়াছিলেন ("সুগত এব বিজিত্য জিতেন্দ্রিয়", ৪,৮০)—তাঁহার কথা, তাঁহার ক্ষমাশীলত্বের কথা (৩, ১৬), এবং তাঁহার সৌন্দর্যের কথার (১২,৮৭) উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীহর্ষ বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতাররূপে স্বীকার করিয়াছেন কিনা তাহা সহসা বলা কঠিন। নলের নারায়ণ-পূজা-প্রসঙ্গে 'নৈষধ-চরিতে'র একবিংশ সর্গে কোনও কোনও সংস্করণে এবং হস্তলিখিত পুঁথিতে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, (দাশরথী) রাম, কৃষ্ণ ও বলরাম এই নয় অবতারের বর্ণনার পর বুদ্ধ, কল্কি ও দত্তাত্রেয়ের বর্ণনা আছে, কোনও কোনও সংস্করণে ও পুঁথিতে আবার এই শেষ তিন অবতারের উল্লেখ

নাই। তাহা হইলে, বিষ্ণুর হয় নয় অবতার না হয় দ্বাদশ অবতারের কথা শ্রীহর্ষ জানিতেন। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীর এক কবির পক্ষে যে কোনও অনুকল্প জানাই অস্বাভাবিক। তবে দ্বাদশাবতার অপেক্ষা নয়-অবতার যেন বেশী অস্বাভাবিক মনে হয়। গয়া জেলার কোঁচ নামক গ্রামের এক মন্দিরে কানিংহাম একটি দশাবতার-প্রস্তর দেখিয়াছিলেন,[৬] তাহাতে বুদ্ধাবতারকে বর্জন করার চেষ্টা হইয়াছে, বুদ্ধের স্থান অপর কেহ অধিকার করিয়া আছেন। ব্লক্ সাহেব বলেন, দশাবতারের মধ্যে বুদ্ধ-পরিত্যক্ত কতকগুলি মূর্তিই উত্তর-ভারতে তিনি দেখিয়াছেন[৭]। বাঙ্গালাদেশে যদিচ এরূপ কোনও মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া জানিনা, তথাপি স্পষ্টই বুঝা যায়, বৌদ্ধদের প্রতি চরম প্রতিশোধ লইতে গিয়া কোনও কোনও স্থানের হিন্দুরা বুদ্ধের প্রতিও বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

কিন্তু হিন্দুরাই কেবল বৌদ্ধদের প্রতি বিদ্বিষ্ট ছিলেন এরূপ কথা নয়, বৌদ্ধরাও এইদিক দিয়া সমান অপরাধী। বজ্রযানী বৌদ্ধদের কল্পনার কেগিতে দশভুজসিত-মারীচী, উভয়বরাহাননা-মারীচী, বজ্রজ্বালানলার্ক প্রভৃতি বিষ্ণুকে পদদলিত করিতেছেন। বিষ্ণুকে আবার হরি-হরি-হরি-বাহন নামক অবলোকিতেশ্বরের এক রূপের বাহনও কল্পনা করা হইয়াছে। পীতবর্ণা-পর্ণশবরী কর্তৃক গণেশ পদদলিত

(৬) *Arch. Surv. Ind. Rep.*, XVI, p. 57.

(৭) Bloch, *op. cit.*, p. 83, footnote 1.

অথবা গণেশ, শীতলা ও হয়গ্রীব পর্যুদস্ত। ইন্দ্র, ব্রহ্মা, শিব, মহামায়া প্রভৃতি দেব-দেবীগণও এইরূপ লাঞ্ছনার হাত হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। তাঁহারাও দশভুজসিত-মারীচী, উভয়বরাহাননা-মারীচী, প্রসন্নতারা প্রভৃতির পদতলে পিষ্ট হইতেছেন[৮]। শুধু লিখিত সাধনে নয়, শিল্পেও এই বিদ্বেষ প্রকাশ পাইয়াছে। এমন কি, প্রাচীন লেখে-ও। বিপুলশ্রীমিত্রের নালন্দা-প্রশস্তির একাদশ শ্লোকে আছে, তাঁহার যে কীর্তির দ্বারা বসুমতী অলঙ্কৃতা হইয়াছিলেন সেই কীর্তি সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল, (যেন) হরির (উচ্চ) পদ হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিবার জন্যই,—

> "হর্তুং হরেঃ পদমিবাজনি তত্র তত্র
> কীর্তি র্যয়া বসুমতী কৃতভূষণা ভূঃ ॥"

১২২০ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ পূর্ব-বঙ্গের রণবঙ্কমল্ল-হরিকালদেবের ময়নামতী-তাম্রশাসনে পাই, তাঁহার শুভ্র যশের দ্বারা ত্রিজগৎ ইতস্ততঃ আক্রান্ত হওয়ায় সহস্রলোচন ইন্দ্র নিজের প্রাসাদ হইতে (?) অবনীতে নামিত (নিক্ষিপ্ত) হইয়াছিলেন,—

> "আক্রামদ্ভিরিতস্তত স্ত্রিজগতীম্
> যত্তদ্যশোভিঃ সিতৈঃ প্রাসাদেঽপি
> নিজে সহস্রনয়নো জাতোঽবনীনামিতঃ ॥"

এইরূপ উদাহরণ খুঁজিলে আরও মিলিতে পারে।

---

(৮) *Buddhist Iconography,* Benoytosh Bhattacharyya, pp. 44, 98, 99, 146 প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

প্রথম অভ্যুদয়ের যুগে পাল-নরপতিগণ কল্যাণ-শঙ্খে ফুঁ দিয়া যে নদীটিকে বাঙ্গালায় অবতরণ করাইয়াছিলেন, তাহার স্রোতে স্রোতে ধর্মান্ধতা কত না দূরেই ভাসিয়া গিয়াছিল, কিন্তু পাল-শক্তির ঔপসন্ধ্যকালে সেই স্রোত এমনই নিরুদ্ধ হইয়া গেল যে, বাঙ্গালাদেশেই আবার হিন্দু ও বৌদ্ধ এই দুইয়ের মধ্যে মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইল বিচ্ছেদ। যাহা ঘটিল তাহাকে মোটেই ঝগড়া-ঝগড়া খেলা বলা যায় না,—তাহা অতীতের সৌভ্রাত্রের শোচনীয় সমাধি। কিন্তু তবু এই যে কলহ, এই যে অপরাগ ও দ্বন্দ,—ইহা শুধু মুখে-মুখেই, বা কলমে-কলমেই, অথবা বড় জোর শিলাখণ্ডের গায়ে শিল্পীর হাতের দাগে,—তদতিরিক্ত আর কিছু নয়। এক বিন্দু রক্তপাত কোথাও ঘটে নাই। একটি লোকও ধর্মের নামে হিংস্র পশু হইয়া উঠে নাই।—কিন্তু এই মৌখিক দ্বন্দের বিলাসটুকুও ভাগ্যের বিড়ম্বনায় দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারিল না। কেন পারিলনা, সেই বিষাক্ত কাহিনীর আর পুনরুক্তি করিতে চাইনা। কেমন করিয়া মগধের প্রাকার- ও পরিখা-বেষ্টিত, দুর্গোপম, ওদন্তপুরী-বিহার দেখিতে দেখিতে জয়োন্মত্ত বিদেশী মুসলমানের হাতে ধ্বংস হইয়া গেল, কেমন করিয়া অভ্যন্তরস্থ নিরীহ মুণ্ডিতশির শ্রমণগণ একবার প্রতিরোধের ক্ষীণ চেষ্টা করিয়া অবশেষে দলে দলে অসিমুখে প্রাণত্যাগ করিলেন, কেমন করিয়া বিহারে সংরক্ষিত, শ্রমণগণের ফোঁটায় ফোঁটায় শরীরের রক্ত জল করিয়া লেখা পুঁথিগুলি পদদলিত, ছিন্ন ও

পরিশেষে রাক্ষসী অগ্নিশিখার উন্মত্ত নৃত্যে ভস্মকূটে পরিণত হইল, এ সকল কথা অতি জ্ঞাত। ওদন্তপুরী-'বিহারে'র নাম হইতেই পরে সারা প্রদেশের নামই যে 'বিহার' হইয়া গেল, একথাও বোধ করি অনেকের অজানা নয়। ওদন্তপুরীর পর বিক্রমশীলও ঐ একই ভাগ্যলিপির ফলে, ঐ একই দশা প্রাপ্ত হইল। মগধের বিহারগুলির এই বার্তা শুনিয়া বাঙ্গালার সোমপুরী, জগদ্দল প্রভৃতি বিহারের শ্রমণগণ কি করিলেন? পৃষ্ঠঝুলিতে খানকয়েক অত্যাবশ্যক পুঁথি লঘুহস্তে ভরিয়া আত্মরক্ষার্থ যে যে-দিকে পারিলেন পলাইয়া গেলেন,—ইহা ভিন্ন কোনও গত্যন্তর ছিলনা। কোনও কোনও ভিক্ষু উত্তরে নেপালে, তথা তিব্বতে, চলিয়া গেলেন, কেহ কেহ বা দক্ষিণে আরাকাণ, তথা ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশে আশ্রয় লাভ করিলেন, কতক কতক বা উড়িষ্যায় আত্মগোপন করিলেন,—বাঙ্গালার শ্রমণ-হীন শূন্য বিহারগুলি ভূমিসাৎ হইবার পূর্বে ভূতের বাড়ীর মত খাঁ খাঁ করিতে লাগিল। বাঙ্গালায় ও উড়িষ্যায় এখনও একাধিক স্থানের নাম 'জগদ্দল'; যদি জগদ্দল-বিহারের কিছু সংখ্যক শ্রমণ ঐ সকল স্থানে কিছু দিন ধরিয়া লুকায়িত ছিলেন ইহাই ঐ নামের হেতু হইয়া থাকে, তবে বিস্ময়ের কোনও কারণ নাই। বাঙ্গালার সম্রাট তখন অশীতিপর বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেন। তাঁহাকেও অবশেষে নদীয়ার প্রাসাদ হইতে খিড়কির দুয়ার দিয়া পলাইয়া পূর্ব-বঙ্গে চলিয়া যাইতে হইল। সেখানে অন্ততঃ ১২০৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি অকারণ বাঁচিয়া ছিলেন।

তারপরেও দেখি, পূর্ব-বঙ্গের পট্টিকের বা পট্টিকেরা নগরে মহারাজ রণবঙ্কমল্ল-হরিকালদেবের রাজত্বের সপ্তদশ বর্ষে, ১২২০ খৃষ্টাব্দে, তিনি তাঁহার প্রধান মন্ত্রী সহজ-ধর্মী শ্রীধবি-এব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দেবী-দুর্গোত্তারার নামে উৎসর্গীকৃত এক বৌদ্ধ সঙ্ঘারামের জন্য বেজখণ্ড গ্রামে ভূমি দান করিতেছেন। মাধবকরের 'নিদানে'র ত্রয়োদশ শতকের দ্বিতীয় পাদে রচিত 'মধুকোষ' নামক টীকার বাঙ্গালী রচয়িতা বিজয়-রক্ষিতের উপাধি ছিল 'আরোগ্যশালীয়'; কোনও একজন চিকিৎসকের সাধারণভাবে 'আরোগ্যশালীয়' উপাধি থাকা বিচিত্র নয়, আবার পক্ষান্তরে 'আরোগ্যশালী' শাক্যমুনি-বুদ্ধের এবং অবলোকিতেশ্বরের অন্যতম বিরুদ,—এই হিসাবে বিজয়-রক্ষিত ধর্মে বৌদ্ধও হইতে পারেন[৯]। গৌড়ের বীরবতী গ্রামের রামচন্দ্র কবিভারতী অল্প বয়সেই তর্ক, ব্যাকরণ, শ্রুতি, স্মৃতি, আগম, জ্যোতিষ প্রভৃতি নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন, এবং এজন্য আত্মীয়-স্বজনের নিগ্রহে তাঁহাকে দেশত্যাগ করিয়া ১২৪৫ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্বে সিংহলে প্রবাসিত হইতে হইয়াছিল। সিংহলে গিয়া অবশ্য এই বাঙ্গালী পণ্ডিতের সম্মানের সীমা ছিলনা, তথাকার অধীশ্বর 'পরাক্রমভুজ-বীরপরাক্রমবাহু' প্রথম পরাক্রমবাহু[১০] তাঁহাকে

(৯) *Ind. Cult.*, III, p. 160; এই সম্পর্কে *Japanese Buddhism*, Sir Charles Eliot, 1935, p. 110, এবং *Chinese Buddhism*, J. Edkins, 1893, p. 235 দ্রষ্টব্য।

(১০) *Ceylon Lectures*, B. M. Barua, 1945, p. 26.

নিজের গুরুপদে বরণ করিয়াছিলেন, এবং 'বৌদ্ধাগমচক্রবর্তী' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। ১২৪৫ খৃষ্টাব্দে তিনি সিংহলে বসিয়া 'বৃত্তরত্নাকরে'র টীকা 'বৃত্তরত্নাকর-পঞ্জিকা' রচনা করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত, 'বৃত্তমালা' ও 'ভক্তিশতক' নামেও তাঁহার অপর দুইখানি গ্রন্থ আছে। নেপালের দরবার-লাইব্রেরীতে ১১৮৯ শকাব্দে, বা ১২৬৭ খৃষ্টাব্দে, বঙ্গাক্ষরে লিখিত 'সিদ্ধৈকবীর মহাতন্ত্রে'র একখানি পুঁথি আছে [১১]; বঙ্গাক্ষরে লিখিত যখন, তখন অবশ্যই কোনও বাঙ্গালী বৌদ্ধ ঐ সময়ে পুঁথিখানি নকল করিয়াছিলেন। এই শতাব্দীর শেষে, ১২৮৯ খৃষ্টাব্দে, লিখিত 'পঞ্চরক্ষা'র একখানি পুঁথির পুষ্পিকায় এক "গৌড়েশ্বর পরমরাজাধিরাজ মধুসেনে"র উল্লেখ পাওয়া যায় [১২]। লক্ষ্মণসেনের পুত্রদ্বয়, বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেন, 'গৌড়েশ্বর' হইয়াও যেমন পূর্ব-বঙ্গেই রাজত্ব করিতেন, 'গৌড়েশ্বর' মধুসেনও সম্ভবতঃ পূর্ব-বঙ্গেই রাজত্ব করিতেন, এবং হয়ত বা সেন-বংশীয়ই ছিলেন। কিন্তু যেখানেই রাজত্ব করুন এবং যে বংশোদ্ভবই হোন্, মধুসেন ছিলেন 'পরমসৌগত' বা বৌদ্ধ। তাহার পর, ১৩০৫ খৃষ্টাব্দে বা ঐ কাছাকাছি সময়ে, পূর্ব-বঙ্গেরও

(১১) *Cat. of Palm-leaf and Selected Paper MSS. belonging to the Durbar Library, Nepal*, H. P. Śāstrī, II, p. 51.

(১২) *Descriptive Catalogue of Sanskrit MSS. in the Government Collection under the care of the Asiatic Society of Bengal*, H. P. Śāstrī, Vol. I, p. 117; ১৩২৭ সালের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় [পৃঃ ৯] ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, পুঁথিখানি পূর্ববঙ্গে নকল করা হইয়াছিল।

স্বাধীনতা অস্তসাগরে ডুবিয়া গেল। আর সেইদিন হইতেই বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাসের উপর যবনিকা পতন হইল।

রমাই পণ্ডিতের অর্বাচীন 'শূন্য-পুরাণে'র শেষে নিবদ্ধ 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' দেখিয়া কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, বৌদ্ধেরাই বাঙ্গালাদেশে মুসলমান আক্রমণকারীগণকে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের কথা মোটেই ইহা নয়। বরঞ্চ, ইতিহাস অনুসারে, বৌদ্ধদের উপরেই মুসলমানগণের ক্রোধ ছিল বেশী, এবং মুসলমানী আক্রমণে তাঁহাদেরই সর্বনাশ হইয়াছিল অপেক্ষাকৃত অধিক। এই 'শূন্য-পুরাণ' ও বাঙ্গালা 'ধর্মমঙ্গল'-সাহিত্যে 'শূন্য' 'নির্বাণ', 'ধর্ম', 'নিরঞ্জন' এবং এই জাতীয় কতিপয় শব্দের ব্যবহার দেখিয়া ধর্ম-ঠাকুর নামে বাঙ্গালার, বিশেষতঃ পশ্চিম-বাঙ্গালার, এবং উড়িষ্যার কোনও কোনও স্থানের দেবতার পূজা যে বৌদ্ধধর্মের বিকৃত রূপান্তর মাত্র, এইরূপ একটি মতবাদও প্রচারিত হইয়াছে, এবং বার বার প্রচারের ফলে সত্যের মুখোস পরিয়া জনপ্রিয়তাও লাভ করিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে যখন যাবতীয় প্রত্যেক জিনিষের মধ্যেই বৌদ্ধধর্মের ছায়া আবিষ্কার করার একটা প্রতিযোগিতা চলিতেছিল, সেই সময়েই এই প্রৌঢ়িবাদটি জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তখন এই সহজ কথাটিও কেহ স্মরণ করিতে চাহেন নাই যে, এই শব্দগুলি তাহাদের আদি সাম্প্রদায়িক মাহাত্ম্য ষোড়শ শতাব্দীর বহু পূর্বেই হারাইয়া কতকগুলি ভেজাল-দুষ্ট সার্বত্রিক শব্দের পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এবং ষোড়শ শতাব্দী হইতে ধর্মপূজার পাণ্ডাগণ যদি না

জানিয়া, অথবা জানিয়াই, এই শব্দগুলি সাহিত্যে ও পূজায় ব্যবহার করিয়া থাকেন, তবে তাহার উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়,—কতিপয় রহস্য-ঘন বাক্যের প্রয়োগে অতি সাধারণ শ্রেণীর ব্যক্তির চোখে এই লৌকিক দেবতাটির মহিমা বর্ধন করা। 'শূন্য-পুরাণ' ও 'ধর্মমঙ্গল'-শাস্ত্র নিরপেক্ষভাবে পাঠ করিলে বুঝা যাইবে, একদা কয়েকজন পরমোৎসাহী ইউরোপীয় পণ্ডিত কার্ষ্ণ বা বৈষ্ণব-ধর্মের উপর খৃষ্ট-ধর্মের যে ভূরি ভূরি প্রভাব আবিষ্কার করিয়াছিলেন[১৩], ধর্ম-পূজার উপর বৌদ্ধ-ধর্মের প্রভাব তাহার অতিরিক্ত কিছুই নয়। 'ধর্মমঙ্গল' সাহিত্যের ধর্ম-ঠাকুরটি যে কি, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। কখনও তিনি যমরাজ, কখনও মহাদেব, কখনও যেন বিষ্ণু, কখনও আবার উপনিষদের নিরাকার ও অব্যয় ব্রহ্ম, কখনও সূর্যের এক অনুচর, কখনও বা অন্য কিছু। এই 'অন্য কিছু'র মধ্যে যদি তাঁহার গায়ে শেষ তান্ত্রিক যুগের খানিকটা বৌদ্ধ-বৌদ্ধ গন্ধ পাওয়া যায়, তবে তাহা নিতান্তই স্বাভাবিক, কিন্তু সে জন্য তাঁহাকে 'বৌদ্ধ দেবতা' বলিয়া প্রচার করা অসমসাহসের কাজ। আসলে তিনি দেবাদিদেব, আদিপ্রভু, সমস্ত বিশ্ব-চরাচরের নিয়ন্তা,—কল্পনাকে যতদূর ঠেলিয়া লওয়া যায়, তাহার শেষ-প্রান্তে তিনি বিরাজ করিতেছেন। এই হিসাবে, তিনি যে 'শূন্য'কে আশ্রয় করিয়া থাকেন, সেই 'শূন্য' বা আকাশ সহজ বস্তু, উহা মোটেই মহাযানের বা অপর কোনও শাস্ত্রের সাংঘাতিক কঠোর 'শূন্য' নয়।

(১৩) *Materials for the Study of the Early History of the Vaiṣṇava Sect*, H. C. Raychaudhuri, 1st ed., p. 76 *f*.

কূর্মাকৃতি যে কতকগুলি পাথরের মূর্তি বা শিলাখণ্ডকে ধর্মের প্রতীক বলিয়া বাঙ্গালায় ও উড়িষ্যায় পূজা করা হয়, সেগুলির সহিত নেপালী বৌদ্ধদের পঞ্চ-বোধিসত্ত্বাঙ্কিত (কূর্মরূপী) স্তূপের সাদৃশ্য এমন থাকেই যদি, তবে সে সাদৃশ্য যে আকস্মিক নয় তাহা প্রমাণ করা দুষ্কর। প্রমাণিত হইলেও ধর্মকে বৌদ্ধ সাজান যায় না, কারণ কূর্ম-মাহাত্ম্য বড়ই জটিল। কূর্মদেব শুধু ব্রহ্মণ্য উপনিষদে ও পুরাণগুলিতে নয়, প্রাচীন অনেক জাতিরই ধর্মতত্ত্বের আদিম কল্পনার সহিত তিনি জড়িত হইয়া আছেন,—তাঁহার আকৃতি আদি কারণার্ণবকে সূচিত করিয়া 'ধর্ম'-তত্ত্বকে শুধু একটা প্রাচীনত্বের ছাপ দিতে চায়, তাঁহার আকৃতিগত সাদৃশ্যের তুলনা টানিয়া আনিয়া ধর্ম-ঠাকুরকে বৌদ্ধ করিতে চায় না[১৪]। ধর্ম-ঠাকুরের উৎপত্তি বৌদ্ধধর্ম হইতে না দেখিয়া একেবারে উপনিষদ্ হইতে দেখিনা কেন?

কিন্তু ধর্ম-ঠাকুরকে বৌদ্ধ দেবতা বলিয়া মানিবার সুসঙ্গত কারণ নাই বলিয়া, নাথ-গুরুগণ যে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণের মতানুবর্তী হইয়াই তাঁহাদের মত ও উপদেশ প্রচার করিয়াছিলেন, একথা অস্বীকার করা যায় না। নাথগণ পরে নিজেদের শৈব বলিয়া পরিচয় দিয়া হিন্দু সমাজ-দেহের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন,—এখন

---

(১৪) ধর্মঠাকুর বৌদ্ধ কি অবৌদ্ধ এতদ্সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য S. B. Das Gupta, *op. cit.*, p. 297 *f*., এবং K. P. Chattopadhyay, *J. R. A. S. B.*, VIII, 1942, p. 99 *f*.

আর তাঁহাদের সে দিন নাই, সেই যোগবলে অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি প্রভৃতি অষ্টৈশ্বর্য দ্বারা বায়ু মধ্যে সঞ্চরণ, জলের উপর গমনাগমন, অগ্নিধারা আনয়ন প্রভৃতি বিস্ময়সৃষ্টির ক্ষমতা নাই, সে প্রভাবও নাই,—কিন্তু একদা পূর্ব-ও উত্তর-বঙ্গে এবং বাঙ্গালার বাহিরেও কামরূপ. নেপাল, পাঞ্জাব, গুজরাট, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি স্থানে নাথগণ একটী শক্তিশালী সম্প্রদায় ছিলেন। বাঙ্গালার সহজিয়া ও বাউলগণও জীবনযাত্রা-প্রণালীতে অনেকটা বৌদ্ধ সহজ-পন্থিগণের আদর্শ ও পরম্পরা বহন করিতেছেন এবং গুহ্য মতবাদের দিক দিয়াও উঁহারা তাঁহাদের নিকট ন্যূনাধিক ঋণী, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু বাঙ্গালার নাথ-পন্থী, সহজিয়া, আউল, বাউল প্রভৃতির সংখ্যা ও প্রতিপত্তি এত বেশী নয় যে, বাঙ্গালী হিন্দুসমাজ বৌদ্ধধর্মকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে মনে করিয়া বৃথা সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা করিতে হইবে।

উপসংহার

বন্যার জল সরিয়া গেলেও যেমন অনেক দিন ধরিয়া এখানে-সেখানে, গর্তে-ফাটলে, ঝোপে-ঝাঁপে নানাস্থানে খানিকটা খানিকটা ঘোলাটে জল আটকাইয়া থাকে, কিন্তু সে জল মানুষের পেয় নয়, সে জল পল্লীবালা গাগরী ভরিয়া লইয়া যায় না, তাহার পঙ্কে উৎপলা জন্মেনা, সেখানে শুধু দাদুরী বসিয়া বসিয়া মায়া-কান্না কাঁদে,—তেমনই বাঙ্গালাদেশ হইতে বৌদ্ধধর্মের অপক্রমণের অনেক পরেও ইতিহাসের পাতার গায়ে এখানে-সেখানে উহার কতিপয় বিচ্ছিন্ন উল্লেখ রহিয়া গিয়াছে, কিন্তু সে উল্লেখ দেখিয়া বৌদ্ধধর্মের বিগত মহিমার কোনও ধারণাই করা যায় না, বরঞ্চ সেগুলি তাহার কৃৎস্ন অতীতকে যেন মুখ ভেঙ্গাইয়া উপহাসই করে। বেশী নয় উল্লেখ, মাত্র কতিপয়।

প্রাচ্য ভারতের কোথাও, সম্ভবতঃ বাঙ্গালাদেশেই, 'সন্নগর' (অথবা 'বর(ড়)নগরী') বলিয়া একটী স্থান বা বিহার ছিল, সেখানকার অধিবাসী ছিলেন মহাপণ্ডিত সিদ্ধেশ্বর বনরত্ন (১৩৮৪-১৪৬৮ খৃঃ)[১]। বনরত্ন সন্নগরের (বা বড়নগরীর) অধিবাসী হইলেও তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময়ই অতিবাহিত হইয়াছিল

(১) Cordier, III, p. 99; also *Répertoire du Tanjur D'Apres Le Catalogue de P. Cordier,* Paris, 1933, par Mlle Marcelle Lalou, under *Vanaratna.*

নেপালের ললিতপত্তনের গোবিন্দচন্দ্র-মহাবিহারে, যেখানে অবস্থান করিয়া তিনি অনেকগুলি বৌদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্রীয় গ্রন্থ, স্তোত্র ও টীকা রচনা করিয়াছিলেন, এবং অনেকগুলি গ্রন্থ ও টীকার তিব্বতীয় অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই কর্মে তাঁহার সহকর্মিগণের মধ্যে দুইজনের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, তিব্বতীয় কুমারশ্রী (১৩৯২-১৪৮১ খৃঃ), ও ভারতীয়, সম্ভবতঃ নেপালী, সর্ব-দিগ্বিজয়-মতিমৎ পুণ্যসাগরসেন। অজিতমিত্রের 'অরপচনসাধন' নামক পুস্তকের অনুবাদ করিয়াছিলেন বনরত্ন ও সাগরসেন শ্রীজন্তল-মহাবিহারে বসিয়া[২]। এই বিহারটি কোথায়, নেপালে কিনা, জানিনা, কিন্তু গোবিন্দচন্দ্র-মহাবিহার ছাড়িয়া বনরত্ন কিছুকাল অন্য বিহারেও ছিলেন তাহা দেখিতেছি। সন্নগর বা বড়নগর বাঙ্গালায় হইলে বনরত্নও বাঙ্গালী, কিন্তু বাঙ্গালী বৌদ্ধের তখন বাঙ্গালায় স্থান হইবে কি করিয়া,—তাই বুঝি তাঁহাকে নেপালে গিয়া বাস করিতে হইয়াছিল। ১৪৩৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীঅমিতাভ নামক একজন সদ্বৌদ্ধকরণ-কায়স্থ (স্থ) ঠক্কুর বেণুগ্রামে বসিয়া বঙ্গাক্ষরে শান্তিদেবের 'বোধিচর্যাবতারে'র একখানি পুঁথি নকল করিয়াছিলেন। ৺রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে এই বেণুগ্রাম সম্ভবতঃ বর্ধমান জেলার বেণুগ্রাম বা বেড়ুগ্রাম[৩]। ইহা হইলেও হইতে পারে, না হইলেও

(২) Cordier, III, p. 177.

(৩) *Descriptive Cat. of Sans. MSS. in the Govt. Collection under the care of the As. Soc. of Bengal*, H. P. Sāstrī, Vol. I, p. 21; শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' প্রথম সং, ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুঁথির লিপিকাল সম্বন্ধে মন্তব্য, পৃঃ ৮।

না হইতে পারে। কিন্তু যে কায়স্থ বা লিপিকর ভিক্ষু জ্ঞানশ্রী কর্তৃক ১৪৪৬ খৃষ্টাব্দে লিখিত কালচক্র-তন্ত্রের একখানি পুঁথি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে, তাঁহাকে বাঙ্গালী মনে করা নিতান্ত ভুল, তিনি ছিলেন মগধের ঝের নামক গ্রামের অধিবাসী[৪]। তবে তিব্বতীয় লামা তারনাথের 'বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে' দেখা যায়, ১৪৪৮ খৃষ্টাব্দে পরলোকান্তরিত ছগল বা চঙ্গলরাজ নামে এক বাঙ্গালী রাজা তাহার রাণীর প্রভাবে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া বোধ্গয়ার জীর্ণ ও ভগ্ন মঠগুলির সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন[৫]। কিন্তু এই রাজাটির রাজ্য দিল্লী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, ইহাও আবার তারনাথেরই ইতিহাসের কথা। স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় চূড়ামণি দাস নামক জনৈক লেখকের একখানা 'চৈতন্যচরিত' গ্রন্থ দেখিয়াছিলেন বলিয়া বলিয়াছিলেন, তাহাতে নাকি চৈতন্যদেবের জন্ম হওয়ায় বৌদ্ধদেরও আনন্দিত হওয়ার উল্লেখ আছে[৬]। ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপে যে সকল বৌদ্ধ প্রকাশ্যে অবস্থান করিতেন, পরে তাঁহারাই আত্মগোপনের উদ্দেশ্যে ধর্ম-ঠাকুরের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন কিনা, কে জানে?

---

(৪) *Cat. of Buddhist Sans. MSS. in the Uni. Libr. of Cambridge*, Cecil Bendall, 1883, Intro., p. iv and pp. 69-70.

(৫) *Buddhism of Tibet*, L. A. Wadell, 2nd ed., 1934, p. 16, footnote 3; *Ind. Ant.*, 1875 IV, p. 367; *Mannual of Indian Buddhism*, H. Kern, 1896, p. 134; *Hinduism and Buddhism*, Charles Eliot, Vol. II, p. 113; etc.

(৬) *J. A. S. B.*, 1895, p. 57.

প্রচলিত চণ্ডীদাসের পদাবলীর একটি পদে পাই,—

"পুন তা ত্যজিয়া বৌদ্ধ অবতার হইল মূরতি তিন ।
জগন্নাথ আর ভগ্নী সহোদর সুভদ্রা তাহাতে চিন্ (চিহ্ন)"[৭] ॥

পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরের জগন্নাথ' সুভদ্রা ও বলরাম এই ত্রিতয় যে বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ এই বৌদ্ধ ত্রিরত্নেরই রূপান্তর, এবম্বিধ ধারণা দ্বিজ-চণ্ডীদাসের পূর্বেও ছিল, বাঙ্গালার বাহিরেও ছিল। এমন কি অনেকের বিশ্বাস, এক পুরাতন বৌদ্ধ-মন্দিরের ভিটায়ই পুরীর জগন্নাথ-মন্দির নির্মিত হইয়াছে[৮]। যাহা হউক, বিগ্রহত্রয় যে বৌদ্ধ ত্রিরত্ন ব্যতীত আর কিছুই নয়, এই ধারণার আরও দৃষ্টান্ত বাঙ্গালাদেশে বিরল নয়। কোনও কোনও স্থানে বিষ্ণুর দশাবতারের পরিকল্পনায় নবম অবতারের স্থান অধিকার করিয়া আছেন বুদ্ধের পরিবর্তে জগন্নাথ। মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ তাঁহার 'চণ্ডীমঙ্গলে' বুদ্ধাবতারের কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন, "ধরিয়া পাষণ্ড মত, নিন্দা করি বেদপথ, বৌদ্ধরূপী লেখে নারায়ণ"[৯]। কবি-কর্ণপূরও তাঁহার 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে' (৭ম অঙ্ক) দাক্ষিণাত্যে 'প্রচুরতমাঃ পাষণ্ডিণঃ' বলিয়াই বৌদ্ধদিগকে উদ্দেশ করিয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃতে'

(৭) রমণীমোহন মল্লিক, ২য় সং, পৃঃ ৬০ ; নীলরতন মুখোপাধ্যায় সং, পৃঃ ১৮।

(৮) *Orissa and Her Remains,* Manomohan Ganguly, pp. 400-406.

(৯) অক্ষয়চন্দ্র সরকার সং, পৃঃ ১৬০।

মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ প্রসঙ্গে মাদ্রাজের উত্তর-পশ্চিমে ত্রিপতির পর্বতে এবং বেঙ্কটগিরিতে তিনি যে সকল বৌদ্ধ দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে জড়াতুর কবিরাজ-গোস্বামীও যথারীতি 'পাষণ্ডী' 'পাষণ্ডীর-গণ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অন্যত্র তিনি বলেন, জীবের মধ্যে স্থাবর ও জঙ্গম দুই প্রকার ভেদ হয়, তন্মধ্যে জঙ্গম-জীবের তির্যক (পশ্বাদি), জলচর ও স্থলচর ভেদ হইয়া থাকে; ইহার মধ্যে মনুষ্যজাতি অতি অল্পতর; মনুষ্য মধ্যে আবার ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ ও শবরজাতির ভেদ আছে,—

"তার মধ্যে মনুষ্যজাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ পুলিন্দ বৌদ্ধ শবর"[১০] ॥

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে বৌদ্ধদের সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখের অসদ্ভাব নাই, কিন্তু ইহাও শেষের কথা নয়, শেষের জন্য আরও একটু রহিয়াছে। বৃন্দাবন-দাসের 'চৈতন্যভাগবতে' (আদি, ৬) অবধূত নিত্যানন্দের তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে প্রভু যে সকল বৌদ্ধ দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের মাথায় ক্রুদ্ধ হইয়া লাথি মারার কথা আছে,—

"ক্রুদ্ধ হই প্রভু লাথি মারিলেন শিরে"।

* * * *

(১০) মধ্য, ১৯, বহরমপুর সং, পৃঃ ১৭২

অনাদিকাল হইতে বসুধার বুকে কত ধর্ম-মত, কত সভ্যতা, জন্মিয়াছে, আবার মহাকালের ভীমাবর্ত রথচক্রের নিষ্পেষণে মরিয়াও গিয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে সেকথা নয়,—তাহার মৃত্যুর কোনও প্রশ্নই ওঠেনা। বৌদ্ধধর্ম শুধু মাতৃভূমির স্নেহ-নীড় হইতে নির্বাসিত হইয়া পরবাসী হইল। নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল বটে, কিন্তু যাওয়ার সময় কাহারও বিরুদ্ধে সে এতটুকু অভিযোগ করিয়া যায় নাই, একটিবার প্রশ্নও করে নাই তাহার কি অপরাধ,—শুধু অপযাত্রীর মতই চুপে চুপে বাহির হইয়া গেল। যাওয়ার আগে সে কি জানিত না,—রন্ধ্রে রন্ধ্রে, শিরায় উপশিরায়, সে কি টের পায় নাই,—ভারতের সমাজ-নিকেতনে তাহার স্থান কোন্ নিরালা উপকণ্ঠে,—সেই নিভৃত কোণে সে কত একা, কত নিঃসঙ্গ? পাল-শক্তির দশম-দশার সঙ্গে-সঙ্গেই সে বুঝিয়াছিল,—তাহাকে বুঝিতে হইয়াছিল,—আচম্বিতে দুর্দিনের তুফান যে-দিনই যে দিক দিয়াই উঠিবে, তাহার রক্ষার্থে কেহ অগ্রসর হইবে না, তাহার সাহায্যের জন্য কোনও বন্ধুই ছুটিয়া আসিবেনা। আসেও নাই। কোনও রাজ-শক্তি অথবা জন-শক্তি তাহার সাহায্যে পাদমেকং যায় নাই। সে নিজেই যতটুকু পারিল প্রতিরোধের ক্ষীণ চেষ্টা করিল, অথবা করিল না,—তারপর দুর্যোগময়ী রজনীর ঘন তমিস্রার আবরণে

নিজের জন্মভূমি হইতে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। ভারতের পূর্ব-গগনে একদিন এক মঙ্গল ঊষায় যাহার উদয় হইয়াছিল, সারা-ভারত প্রখর দীপ্তিতে দীর্ঘ দিন প্রদক্ষিণ করিয়া আবার সেই পূর্ব-গগন হইতেই সে বিদায় লইয়া গেল। যেখানে যেখানে গেল, সে সকল স্থানে বহু পূর্ব হইতেই তাহার নিরাপদ প্রচ্ছায় রচিত ছিল, তথায় অভ্যর্থনারও কোনও ত্রুটি হয় নাই,—কিন্তু ভারত তাহাকে চিরদিনের মত হারাইল। যাওয়ার সময় সে সঙ্গে পাথেয়ও এমন কিছু লইয়া যায় নাই,—কেবল খানকয়েক পুঁথি। কিন্তু সেই তুলনায় আঠার শতাব্দী ধরিয়া ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির, সাহিত্য ও শিল্পের মঞ্জুষায় সে যাহা দান করিয়া গিয়াছে, তাহার ভূমার, রভসের ও উর্জস্বলতার পরিমাপ করিতে গেলে বিভ্রান্তই হইতে হয়,—তৌলদণ্ডের রজ্জু যত শক্তই হোক্, সেই অবদানের অতি-ভারে ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া যায়। কিন্তু বিদায়ের ক্ষণে এসব কথা কেহ একবার স্মরণও করিলনা, কেহ পিছু ডাকিয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টাও করিল না, এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলিল না। সেদিন শুধু বুঝা গেল, দিগন্তহীন অতীতের মহাসিন্ধুর গর্জিত আলোড়নের মধ্যে গৌতমবুদ্ধ-অশোক-নাগার্জুন হইতে আরম্ভ করিয়া ধর্মপাল-অতীশ-অভয়াকর পর্যন্ত বুদ্বুদ-সকল যেমন নিঃশব্দে

ফাটিয়া গিয়াছে, সারনাথ-শ্রাবস্তী ও সাঞ্চী-ভরহুত হইতে আরম্ভ করিয়া নালন্দা-বিক্রমশীল ও সোমপুরী-জগদ্দল পর্যন্ত তরঙ্গগুলিও তেমনই নিশ্চিহ্নরূপে লীন হইয়া গিয়াছে। এবং সে-দিনের সে-কথা বস্তুতঃ আজিকারও যেন অনেকখানি কথা। যেন কোনও স্মৃতি নাই, কোনও সম্বিৎ নাই, যেন কোনও চেতনা নাই, কোনও অনুভূতি নাই,—বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে এমনই নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ, এমনই নিস্পৃহ ও অনাসক্ত হইয়া—আজিকার ভারতবর্ষের ইতিহাস বাঙ্গালার ইতিহাসকে কোলে লইয়া অকাতরে ঘুমাইতেছে,—যেন কোনও দিন কোথাও কিছু ঘটে নাই।

নির্ঘণ্ট

[সংখ্যাগুলি পৃষ্ঠার সংখ্যা]

সাধারণ

ব্যক্তিগত নাম

ধ্যানীবুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, দেব, দেবী, অবতার প্রভৃতি

ধর্মমত, সম্প্রদায়, শাখা, যান ইত্যাদি

বিহার, সঙ্ঘারাম, স্তূপ ইত্যাদি

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	৬	অনুপ্রেয়ণায়	অনুপ্রেরণায়
১১	৮	পর্য্যবসতি	পর্যবসিত
৩২	পাদটীকা ২	Richard L. Morris	Richard Morris
৩৪	১২	স্তপ	স্তূপ
৪০	পাদটীকা ১৭......		(১৭) Ed.
৫৯	৬, শেষ শব্দ......		এই
৬৫	১১	অন্থতম সমতটে।	অন্থতম। সমতটে
৬৫	পাদটীকা ১০	উদ্বত	উদ্ধৃত
৭৯	২০	বাঙ্গালীর	বাঙ্গালার
৮৮	৯	রাজ্যঙ্কে	রাজ্যাঙ্কে
৯৫	৯	ব্রাহ্মণ্য	ব্রহ্মণ্য
৯৫	১৩	হন্দুর	হিন্দুর
১৫৭	১৮	নাগাজুন	নাগার্জুন
১৬৩	১২	বাঙ্গালা	বাঙ্গালী
১৮৮	১৪	যমারি	যমারি
১৮৯	১২	মহাষান	মহাযান
১৯৪	১০	-নিবসিন্	নিবাসিন্
১৯৬	৬	দেশীর	বঙ্গদেশীয়
২২০	৩	শক্তি	শাক্ত
২২৬	৪	শু	শুধু

